একুশে পা

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশক ❑
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশকাল ❑
২ ডিসেম্বর, ১৯৬৫

❑ অক্ষরবিন্যাস ❑
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রণ ❑
পূর্ণিমা প্রিন্টার্স
টি/২এ/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা-৬৭

একুশে পা

'এতটা সর্দারি প্রথম দিনেই ? ইস্‌স্‌....

ইমনকে হঠাৎ দেখলে সে ছেলে কি মেয়ে বোঝবার উপায় নেই। চুল ছেলেদের মতো, সামনে বড় বড়, পেছনে ছোট ছোট করে কাটা। মাথার পেছনটা পরিষ্কার তিনকোণা। মাজা গায়ের রং। মুখখানা বালকসুলভ। চোখে একটা মৃদু হাসি। যেন যা-যা দেখছে মোটের ওপর সমর্থনই করছে সে। লম্বায় বোধ হয় পাঁচ পাঁচ। মেয়ে হিসেবে বেশ লম্বাই তো ! ছেলে হিসেবে কি একটু বেঁটের দিকে ! খাপ ছাড়া তাপ্পি-দেওয়া রঙ-জ্বলা জীনস আর ঝলঝলে টি-শার্ট পরে আছে। ভীষণ স্টাইলিশ দেখাচ্ছে। আলগা আলগা ভাবে অথচ বেশ স্বচ্ছন্দে, যেন কুশলী সাঁতারুর মতো সে যে কোনও পরিপার্শ্বর মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে, নিজেকে বুঝি তার মনে নেই। এই পরিবেশও বুঝি আদৌ তার অচেনা নয়। অথচ, হোস্টেলে উঠেছে যখন তখন ধরেই নেওয়া যায় সে বহিরাগত। এই শহরের অন্তহীন শব্দবাদ্য, উৎসবপ্রিয়তা, মিছিল, জট, ধোঁয়ায় এখুনি এখুনি তার অভ্যস্ত হয়ে যাবার কথা নয়।

অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি এখন। প্রখর রোদ, ভ্যাপসানি গরম। রাস্তার পিচ তলতল করছে। আকাশের রঙটা এই সময়ে ক্ষয়াটে নীল হয়। কাকগুলো উড়ছে না, ডাকছে না। গাছপালার ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে আছে বোধহয়। কলেজ-গেটের বাঁ দিকে একটা কৃষ্ণচূড়া। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, নিম, তেঁতুল এই সব দেখলে ইমনের মনটা কিরকম হালকা হয়ে যায়। গাছগুলো চেনা বলে কি ? না বোধহয়। বট অশত্থও তো চেনা, তাদের দেখলে তো কিছু হয় না ! এই গাছগুলোরই ঝিরিঝিরি পাতায় কোনও বিশেষ গুণ আছে। মনের মধ্যে গিয়ে ঝিলমিল করতে থাকে, গুমোট কেটে যায়।

এই মাত্র যে 'টু বি' বাসটা চলে গেল সেটা থেকে নিজেদের টেনে হিঁচড়ে নামাল কয়েকটি মেয়ে। একজন নিজের কচি-কলাপাতা চুন্নিটা টেনে নিতে নিতে বাসের সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল 'ডিসগাসটিং ! স্পেস-স্যুট পরে যাতায়াত করতে হবে দেখছি এ রুটে !' এই মেয়েটি মেমসাহেবের মতো লালচে ফর্সা। একটু বাদামি রঙের চুলে দুটো মোটা বিনুনি করা। চওড়া মুখ। লম্বা দোহারা চেহারা। বেশ গোটা গোটা স্পষ্ট নাক-চোখ-মুখ-দাঁতের মেয়ে। এ উজ্জয়িনী। একে দেখলে মনে হয় ভীষণ অহঙ্কারী, কাউকে গ্রাহ্য করে না। এর পাশেপাশে যে হাঁটছিল সে মিঠু। উজ্জয়িনীর মাথায় মাথায়। রোগা বলে আরও লম্বা দেখায়। রঙ চাপা। চুলে স্টেপকাট। মিঠুর চিবুকের কাছটা সরু হয়ে এসেছে। বুদ্ধিমান চোখ। হাসলে গোটা মুখটাই ঝিকিয়ে ওঠে। মিঠু তার লম্বা স্কার্ট দুলিয়ে বলে উঠল 'কষে থাপ্পড় দিলি না

কেন ?'

উজ্জয়িনী বলল 'কম চালাক নাকি ? লাস্ট মোমেন্টে....'

'পেছনে আসছে অণুকা, মোটাসোটা, চুলে ববকাট। সে গালে টোল ফেলে বলল 'এই লোকগুলোকে এলিমিনেট করে দেওয়া উচিত। একদম শটাশট।'

ওরা তিনজনে রাস্তা পার হল। কলেজ গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে ইমনকে ওরা লক্ষ্য করেছিল। মিঠু হতাশ গলায় বলল 'দূর এ তো গরুর গোয়াল ! কত দিন ধরে আশা করে আছি প্রেসিডেন্সিতে পড়ব। ঠি-ক সেই হল না ! অথচ কী ভাল পরীক্ষা দিয়েছিলাম !'

উজ্জয়িনী মাথা ঝাঁকিয়ে বলল 'তুই নাকে-কান্না ছাড় তো মিঠু। হল না তো হল না ! কী আমার প্রেসিডেন্সি রে ! যার যাতে ন্যাক নেই তাই পড়তে হবে না কি তাই বলে। ইংলিশ নিয়ে পড়বার চান্স পেয়েছিস, এর জন্যেই ভাগ্যকে ধন্যবাদ দে। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের সুষ্মা ভার্গব ! অত ভাল মেয়ে তো ! জয়েন্টে পেলো ? আই. আই. টি পেলো ? এখন শেষ পর্যন্ত ম্যাথস্ নিয়ে বিদ্যাসাগরে পড়ছে। আমার এক মামাত কাজিনের কথা জানিস ? কেমিস্ট্রিতে ব্যাক পেল ! অবাক কাণ্ড ! পরের বছর গ্র্যাজুয়েশন করে স্টেটসে চলে গেল। ওখানে ওর প্রোফেসররা কী বলে জানিস 'ঘোষ, য়ু আর একসেপশন্যাল্লি ব্রিলিয়ান্ট।' অতদূর কেন, বাঙ্গালোরে যা না, স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটিতে চান্স্ পেয়ে যাবি, যে সাবজেক্টে ইচ্ছে, খরচটা একটু বেশি হবে খালি। এখানেই খালি সব পেটারন্যাল প্রপার্টি। পরীক্ষাটা মেরিটের হয় না, হয় ভাগ্যের।'

মিঠু চুপ করে গেল এই তোড়ে বক্তৃতার সামনে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তার মনের কষ্ট যায়নি। চোখ চকচক করছে।

কলেজ-হলের মুখোমুখি তাদের অভ্যর্থনা জানাল সন্তোষ আগরওয়াল। 'আরে ! তুমলোগ ভী ইঁহা !' হাসিতে চশমার পেছনের চোখ দুটো প্রায় বুজিয়ে বলল সন্তোষ 'তব্ তো বড়া মজা আ জায়েগা।' সন্তোষ ওদের সাঁতার ক্লাবের বন্ধু।

মিঠু বলল 'ঋতুকে চিনিস তো ? ঋতু, রাজেশ্বরী ওরাও এখানেই ভর্তি হয়েছে। পল সায়েন্স। আমাদের পুরো গ্রুপটাই বলতে গেলে এখানে।'

পেছন থেকে একদল ছেলে চটির শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছিল। খুব উত্তেজিত। 'কী হওয়া উচিত জানিস তো ? ছাত্র-রাজ। এখন গভার্নিং বডিতে রিপ্রেজেনটেটিভ দিতে বাধ্য হচ্ছে। এরপর বিধানসভায়, পার্লামেন্টে সব জায়গায় দিক। নইলে দুর্নীতি, ছাত্র এক্সপ্লয়টেশন কোনদিন বন্ধ হবে না....'

ওরা কথা বলতে বলতে অনেক দূর চলে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছে খুব সম্ভব 'গভমেন্ট অফ দা স্টুডেন্টস, বাই দা স্টুডেন্টস...ফর দা স্টুডেন্টস্' ভেসে এলো হাওয়ায়।

মিঠু ফিক করে হেসে বলল 'ছাত্র এম. এল. এ ? এ ছাত্র এম. পি ? পড়বে কখন রে ছাত্ররা, এই অণু ! এই উজ্জয়িনী ! গভমেন্ট যখন, তখন মিনিস্টারও হবে...।'

'বিনা পরীক্ষায় পাশ করাটা ছাত্র এম. এল. এ, এম. পি-দের পার্কসের মধ্যে পড়বে। বুঝলি না ?' উজ্জয়িনী বলল।

সন্তোষ আগরওয়াল বলল 'তবে তো আমি জরুর এম. এল. এ, এম. পি-ই হচ্ছি।'

'আচ্ছা আচ্ছা আগে চল তো এখন ক্লাসরুম-টুম গুলো খুঁজে বার করা যাক। কী বিশাল কলেজ ! বাব্বা !'

'ইমন মুখার্জি ! রোল নাম্বার সিক্সটীন !' বি. ডি. জি অর্থাৎ বেলা দাশগুপ্ত রোল কল

করছেন। প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস। ভাঙা-ভাঙা গলায় জবাব এলো 'ইয়েস ম্যা'য়াম।' বি. ডি. জি কয়েক সেকেন্ড গাবদা পেনখানা রেজিস্টারের দিকে তাক করে রেখে চশমার ঘন কাচের মধ্যে দিয়ে ভালো করে চেয়ে দেখলেন, তারপরে চোখ নামিয়ে পরের রোল নম্বরে চলে গেলেন। 'তন্ময় হালদার—সেভেনটীন !'

ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড বেঞ্চে ছড়িয়ে বসতে হয়েছে ওদের। কথা বলতে হলে থার্ড বেঞ্চের মেয়েদের সামনে ঝুঁকে পড়তে হচ্ছিল, সেকেন্ড বেঞ্চের মেয়েরা আড় হয়ে বসেছিল, ফার্স্ট বেঞ্চের মেয়েরা ক্রমাগত পেছন ফিরে যাচ্ছিল। ছোটখাট একটা সভা-ঘরের মতো উপছো-উপছি ভর্তি ক্লাস। স্কুলের শৃঙ্খলা. বকুনি শোনা, এ-সবের অভ্যেস একদিনেই অনেকটা পেছনে পড়ে গেছে। এখন তো যা-খুশির দিন। কলেজ ! বেলা একটা পঁয়তাল্লিশের ক্লাস। এর আগে পর্যন্ত একটা ক্লাসও আর হয়নি। টাইম-টেব্‌ল দেখে-দেখে এক একটা ঘরে গিয়ে বসছে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসছে ওরা। এর ঠিক আগের ক্লাসটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঝাঁকড়া-চুলো একটা হিলহিলে ছেলে সামনে এগিয়ে এসে খাতা ঝাঁকিয়ে বলল 'বন্ধুগণ, ওয়েট করে লাভ নেই। অনেকগুলো ডিপার্ট এখনও নাকি রুটিন পায়নি, আজকের স্কুপ। এখনও কদিন এমনি চলবে।'

এর চেয়ে ভারী গলার একজন বলে উঠল 'নেক্সট উইকে ফ্রেশার্স, তারপরই স্বাধীনতা দিবস, তদ্দিনই এমনি চলবে।'

ওরা বেরিয়ে এসেছিল করিডরে। হলে। চশমা-পবা, পড়ুয়া-চেহারার একটি বেণী দোলান মেয়ে সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, যেরকম সীবিয়াস, মনে হয় থার্ড ইয়ার। মোটা গলাব ছেলেটি তাকে গিয়ে পাকড়াও করল 'এই যে দিদি, ভেতরের খবরটা ছাড়ুন তো, এ-কলেজে ক্লাস-টস হয় ? না শ্রেফ অ্যাডমিশন দিয়ে সব যে-যার চরে খেতে ছেড়ে দেয় !'

মেয়েটি ভাল করে ওর দিকে তাকিয়ে বলল 'এসো, দেখছি।' শাঁ করে ঢুকে গেল, হল পেরিয়ে পাশের ডানদিকের ঘরে। দু সেকেন্ড পরেই ঝোলা গোঁফ, মোটা ফ্রেমের চশমা-পরা একজন প্রোফেসর বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে আগের মেয়েটি। মেয়েটি ইশারায় ওকে দেখিয়ে দিল।

'এই যে শোনো, শোনো হে, কী নাম তোমার ?'

'আজ্ঞে ভেঙ্কট।'

'কী বললে ? ভেঙ্কট ? সাউথ ইন্ডিয়া ?'

'না স্যার, ঈস্ট। ভেঙ্কটেশ পাল, তিরুপতির দোর ধরা...তাই... গ্র্যান্ডমাদার...'

'তা বেশ বেশ। নন্দিতাদিকে কী যেন বলছিলে ?'

ভেঙ্কটেশ ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করতে আরম্ভ করল।

'না মানে ক্লাস কখন...ক্লাসের টাইম...'

'উঁহু তুমি চরে-খাওয়া টাওয়ার কথা কি সব জিজ্ঞেস করেছিলে না ?' চোখের চশমা এবার স্যারের ডান হাতে নেমে এসেছে। চশমা সুদ্ধ ডান হাতটা নেড়ে-নেড়ে ভেঙ্কটেশকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। নন্দিতাদি নামের ম্যাডাম সারের হাতে ভেঙ্কটেশ পালকে তুলে দিয়ে পর্দা সরিয়ে সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে গেছেন।

'ক্লাস যথা সময়ে হবে..কিন্তু বাকি কথাগুলোয় তুমি ঠিক কী মীন করেছ, আমাদের জান্না দরকার।'

'না স্যার, ম্যাডামকে ম্যাডাম বলে ঠিক বুঝতে পারিনি স্যার... ।'
'ম্যাডামকে ম্যাডাম বলে...তুমি কি ওঁকে জেন্টলম্যান বলে ভেবেছিলে ?'
'না স্যার, না স্যার...' ভেঙ্কটেশ তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে।
'ঠিক আছে। এবারের মতো তোমায় ছেড়ে দেওয়া গেল। কি বলো নন্দিতা ?' পর্দাটা একটু সরিয়ে উনি ভেতর দিকে স্বর পাঠালেন।
ক্ষীণ স্বরে জবাব এল 'হ্যাঁ হ্যাঁ আবার কী ?'
'ভেঙ্কটেশ, নন্দিতাদি তোমায় ক্ষমা করেছেন। বেলাদি-ই-ই।' আবার উনি পর্দা তুলে ভেতরে স্থিত কোনও মহিলাকে লক্ষ্য করে হাঁক পাড়লেন, কী সব কথাবার্তা বললেন, তারপর ফিরে বললেন, 'একটা পঁয়তাল্লিশে তোমাদের সোনার পাথরবাটির ক্লাসটা হবে আট নম্বর রুমে। বেলাদি নেবেন। বেলা দাশগুপ্ত। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?'
ভেঙ্কটেশ তার সঙ্গীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একেবারে সামনে। পেছনে, বেশ পেছনে মিঠু-উজ্জয়িনী এরা। এদের আর কী ? মিটিমিটি হাসছিল। ভেঙ্কটেশ যেন কাছাকোঁচা খুলে যাচ্ছে এমনি ভাব করতে করতে দৌড় মারল 'চরে গৌতম, একেবারে গুলবাঘার খপ্পরে।' উজ্জয়িনীরা শুনতে পাচ্ছিল স্টাফরুমে ভীষণ হাসির হুল্লা উঠেছে। গুলবাঘার জোরালো বাঘা গলা সর্বোচ্চ হাঃ হাঃ হাঃ। সেই সঙ্গে কিছু সরু মোটা তারের হাসি। উজ্জয়িনী বলল 'শীগগির চ। আট নম্বর রুম দোতলায়। সামনে জায়গা পাবো না। সোনার পাথরবাটি ক্লাস আবার।'
'সোনার পাথরবাটি ক্লাস ব্যাপারটা কী রে ?' অণু জিজ্ঞেস করল।
মিঠু বলল 'কমপাল্‌সারি অ্যাডিশন্যাল, বুঝলি না ?'
উজ্জয়িনী বলল 'ওটা ক্লাস নয় ওটা আসলে ট্‌লাস।'
সেই সোনার পাথরবাটি ট্‌লাসেই ওরা বসে সবাই এখন। সায়েন্সের ঘর কি না কে জানে। গ্যালারি। দেয়াল-জোড়া ব্ল্যাকবোর্ড। তাতে লাল রঙ দিয়ে গ্রাফ আঁকা। কী সব গ্রাফ কষাও রয়েছে চক দিয়ে। ক্লাসটা মস্ত বড় বলেই বোধ হয় এ ঘরে ব্যবস্থা। একবারটি পেছন দিকে চেয়ে নিয়ে মিঠু বলল 'সমুদ্র'।
'দিঘি-টিঘি বল্', উজ্জয়িনী ফুট কাটল। রাজেশ্বরী ঢুকছে। ছাপা শাড়ি পরেছে। 'দ্যাখ, দ্যাখ, মিঠু, রাজেশ্বরী শাড়ি পরেছে, রাজেশ্বরী-ই, আমরা এখানে...।'
মিঠু বলল 'ওই তো ঋতু, ঋতু কী সেজেছে দ্যাখ, কী মড লাগছে !'
বাইরের দিকের জানলাগুলো দিয়ে গাছের শ্যাওলা-ভরা গুঁড়ি, ঘন সবুজ পাতাভরা ডাল। একগুচ্ছ দোলনচাঁপা না গুলঞ্চসুদ্দু একটা ডাল মাঝের জানলার ঠিক বাইরে। ওখানটা খুব ছায়া। কী একটা পাখি ডাকছে কু কি কি ! কু কি কি !
ইমন মুখার্জি বসেছিল একেবারে শেষ বেঞ্চে। গ্যালারির উঁচুর দিকে, যেখান থেকে ক্লাসের সব ছেলেমেয়ের মাথা গুনতি করা যায়। আশেপাশে তার ছেলেই বেশি। অণুকা বলল 'এই মিঠু, ও ছেলে না মেয়ে রে ?'
মিঠু ঠোঁট উল্টোল। অর্থাৎ জানে না। সন্তোষ আড় হয়ে বসে বলল 'শী ইজ এ গার্ল। ডোন্ট য়ু সী !' সে একটু অর্থপূর্ণ হাসল। কিন্তু গলার আওয়াজটা শোনবার জন্য ওরা ব্যস্ত হয়ে ছিল। 'ইয়েস ম্যা'আম' শোনার পর সন্তোষ বলল 'দেখলে ?'
উজ্জয়িনী বলল 'কী জানি ! ছেলেদের গলা ভাঙে না ! সেইরকম ভাঙা-ভাঙা গলা বাবা ! যাই বলো, আমি এখনও শিওর হতে পারিনি। আমরা কি জীন্‌স্ পরি না ? আমাদের কারও কি বয়-কাট চুল নেই ? তখন কি আমাদের নিয়ে ধাঁধায় পড়তে হয় ?'

'নামটাও কিরকম উভলিঙ্গ দেখলি ? ইমন !' মিঠু গলা বাড়িয়ে বলল।

'নামের কথা যদি বলিস তো আমাদের সন্তোষের সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারবে না...উজ্জয়িনী বলল, 'আমার পিসেমশাইয়ের আর ওর এক নাম, বুঝে দ্যাখ! পিসেমশাইকে যদি দেখিস না ! যেমনি মোটা, তেমনি গাল ফোলা, এতখানি গোঁফ দাড়ি তার ওপরে, ট্রিম করে না। আমাকে দেখলেই বলবে "আহো উজ্জয়িনী নাম্নী নগরী, তোমার কালিদাস কোথায় ? বিক্রমাদিত্যই বা কই ?"

ওদের হাসি দেখে সন্তোষ বলল 'আমার নাম শুনেই ঘাবড়াচ্ছো ? আমার মাম্মির নাম জানো— কৈলাশ, আমার দিদির নাম—ভিজয়, আন্টির নাম অজিত, অজিত কাউর।'

'অজিত ? অ-জিত ? অনেক শুনেছি তোদের অদ্ভুত নাম, অজিত কখনও শুনিনি', ঋতু বেঞ্চের ওপর তবলা বাজিয়ে দিল 'আমার বাপীর নাম তো অজিত। এবার থেকে মিস অজিত কাউর বলে খেপাব।'

অণুকা বলল 'তুই বাবাকে খেপাস ? বাবা কি তোর ছোট ভাই ? না ইয়ার ?'

ঋতু বলল 'বাপীকে যদি খেপাতে না পারবো তো জীবনে মজা কোথায় ?'

মিঠু বলল 'জানিস না ঋতুটা কী আহ্লাদি ! বাবা মা সব ওর ইয়ার। আমার বাবাও বন্ধুর মতো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভীষণ স্ট্রিক্ট্। একটু এদিক-ওদিক হয়েছে তো "মিঠু, এটা তোমার থেকে আশা করিনি"।'

বেলাদির রোলকল শেষ হয়ে গেছে বোধহয়। উনি মেয়েদের জটলাটার দিকে তাকিয়ে যারপরনাই বিরক্তি প্রকাশ করলেন। অণুকাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন উনি এতক্ষণ ক্লাসে কী বলছিলেন। অণুটা সবসময়েই ছটফট করে, যেন ওকে ছারপোকায় কামড়াচ্ছে। সেইরকম নড়তে নড়তেই জবাব দিল 'ইউ হ্যাড বীন কলিং দ্য রোল, ম্যা'য়াম।'

ক্লাসের পেছন দিক থেকে একটা হাসির রোল উঠল। মেয়েদের গলা ছাপিয়ে আছে ছেলেদের শ্রীকণ্ঠ। 'এই অণু' পেছন দিক থেকে উজ্জয়িনী ওর কুর্তার তলাটা ধরে টানছে, 'সিলেবাস বলছিলেন রে ! অণুকা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওর পেটেন্ট তোয়ালে-রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে লাগল।

হাসি অগ্রাহ্য করে বেলাদি বললেন 'মর্নিং শোজ দ্য ডে। ইউ ক্যান সিট ডাউন। ডোন্ট টক।'

বসে পড়ে ফিসফিস করে বলল অণুকা 'আমাদের কথা বলছিলেন নাকি রে ? মর্নিং শোজ দ্য ডে ?'

উজ্জয়িনী হাসতে হাসতে ফিসফিসোলো 'দূর অ্যাম্প্লিফিকেশনের জন্যে কতকগুলে আইডিয়া দিচ্ছেন !'

'চাইল্ড ইজ ফাদার অফ দ্য ম্যান' থেমে থেমে বললেন বেলাদি। সবাই লিখে নিচ্ছে। অণুটাও এতক্ষণে পেন বার করল।'

'এ বার্ড ইন হ্যান্ড ইজ ওয়ার্থ টু ইন দ্য বুশ', বেলাদি শেষেরটা বলে থামলেন। 'দীজ য়ু মাস্ট লার্ন, দীজ ফাইভ। লার্ন অ্যাট হোম, অ্যান্ড রাইট ইন দ্য ক্লাস। দিস ইজ মাই পলিসি। নাউ ইউ মে গো।' রেজিস্টার এক হাতে, হাঁটুতে আরেক হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বেলাদি। এক পা এক পা করে নামলেন প্ল্যাটফর্ম থেকে। তারপর টলমল টলমল করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। পেছন থেকে কে মন্তব্য করল 'জাহাজ'। আবার হাসির হুল্লোড়।

মিঠু বলল 'এসব তো আমরা স্কুলে থাকতেই করেছি রে !'

উজ্জয়িনী বলল 'সরকারি স্কুলে তো সিক্স থেকে ইংলিশ আরম্ভ হয়। ভালোই তো আমাদের এই এলেবেলে ব্যাপারগুলো করতে হবে না।'

ক্লাসের তিনটে পেল্লাই দরজা দিয়ে সবাই হুড়মুড় করে বেরোচ্ছিল। ভেঙ্কটেশ আর গৌতম এসে ধরল উজ্জয়িনীদের।

'দ্যাখো ! শাসানোর ভঙ্গিতে তর্জনী তুলল ভেঙ্কটেশ 'যা দেখছি, এইট্টি পার্সেন্টই মেয়ে, মাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই আমরা, হতভাগ্যরা, নিজেদের মধ্যে গ্রুপ করে থাকবে তো দেখাব মজা ! স্কুল থেকে এসেছো, না ?'

মিঠু হাসি-হাসি মুখে বলল 'হ্যাঁ।'

'দেখেই বুঝেছি। স্কুলের বালিকা সব। দুগ্ধপোষ্য এখনও।'

'কী করে বুঝলে ?' উজ্জয়িনী পাশ থেকে বলে উঠল, জাস্ট চেহারা দেখেই বোঝা যায় বুঝি ?'

'শুধু চেহারা নয়, ওই হিহি হিহি আর খুঁক খুঁক খুঁক, স্কুলবালিকাদের আইডেনটিফিকেশন মার্ক। একমাত্র স্কুলবালিকারাই এভাবে হাসিয়া থাকে !'

'তুমি বুঝি কলেজ থেকে দু' বছর ডিগ্রির ক্লাস করে ফেরৎ এসেছ ?' উজ্জয়িনী ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলল।

'ওরে গৌতম, চাট মারে রে : স্কুলবালিকা বলাতে অপমান হয়েছে ! নো অফেন্স মেন্ট ফ্রেন্ডস', ভেঙ্কটেশ হাত বাড়িয়ে দিল 'হাত মিলাও কমবেড লোগ, দোস্তি কে পহলে দিন আজ, সেলিব্রেট তো করো কম সে কম কুছ্ খিলাকে !'

কেউই ওর হাতে হাত মেলাল না। উজ্জয়িনী বলল 'হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে এসো আগে। নো অফেন্স মেন্ট।'

'ঠিক আছে ভাই, শোধবোধ, তবে আমি কিন্তু হেলথ-সোপ লাইফ-বোয় দিয়ে চান করি। লাইফ-বোয়' বলে বিজ্ঞাপনেব গানের কলি তাব ভাবী গলায় গেয়ে উঠল ভেঙ্কটেশ 'আমাকে অচ্ছুৎ ভাবার কোনও কারণ নেই।'

গৌতম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল 'ছেলেরা সায়েন্স না পড়লেই আজকাল আনটাচেব্‌ল্ হয়ে যাচ্ছে রে। এক গেলাস জল দিয়ে দ্যাখ খাবে না।'

রাজেশ্বরী পেছনে ছিল, সবার ওপরে মাথা তুলে মিটিমিটি হেসে বলল 'আইসক্রিম দিলে খাবো।'

'ঠিক হ্যায়, আইসক্রিমই খিলাবো, কী নাম কমবেড তোমার ?' ভেঙ্কট জিজ্ঞেস করল।

'রাজরাজেশ্বরী।'

'ক্কী ? ক্কী ? রাজ-রাজেশ্বরী ? আই বাপ এরকম ঘ্যাম নাম তো কখনও শুনিনি !'

শর্ট ফর্মে শুধু রাজেশ্বরী বলেও ডাকতে পারো।'

'পারি ? অনুমতি দিলে ? আরও শর্ট করে নিয়ে যদি রানী বলি ?'

'সেক্ষেত্রে অনুমতি ফিরিয়ে নেবো।'

'কেন ? রাজরাজেশ্বরী মানে তো রানী !'

'ভেঙ্কট তো বিষ্ণুর নাম, তোমাকে বিষ্টু, কি নারাণ, কি হরি বলে ডাকি তা হলে ?'

'ও হো হো, সরি ভাই, ভেঙ্কটটাই যথেষ্ট গোলমেলে, তার ওপর বিষ্টু, হরি, নারাণ ? দয়া করো এই আমার তরবারি সারেন্ডার করে দিলুম।' সে দু হাতে তরোয়াল ধরে রাজেশ্বরীর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখার ভঙ্গি করল।

উজ্জয়িনী বলল, 'চল চল, আইসক্রিম খাওয়া যাক, গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে।'

ভেঙ্কটের ঘাড় ভেঙে আইসক্রিম খাবার সময়ে ইমনকে ওরা মেয়েদের কমন রুমের দিকে যেতে দেখল। গৌতম বলল 'একে চেনো?'

'না কে ও?'

ভেঙ্কট অবাক হয়ে বলল, 'চেনো না? দু বছর পর পর টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বেঙ্গলে! জুনিয়র। আরে তোমাদের মেয়েদেরই তো গৌরব। আমাদের কী! এবার ওকে দিয়েই আমাদের কলেজ খেলাধুলোয় খাতা খুলবে। স্পোর্টস ম্যাগে নাম উঠবে অনেক দিন পর আই মুখার্জির দৌলতে।'

'ওই আই মুখার্জি! তা মুখটা চেনা চেনা লাগছিল।' মিঠু বলল।

'অমনি তোর চেনা-চেনা লেগে গেল!' উজ্জয়িনী আইসক্রিম এক চামচ মুখে তুলে বলল।

'বিশ্বাস করছিস না? বছর দুই আগে ওর ছবি বেরিয়েছিল কাগজে। বাবা দেখতে দেখতে বলেছিল মফঃস্বলের মেয়ে, কম কথা না! এ মেয়েটার পোটেনশ্যালিটি আছে।'

গৌতম বলল 'হ্যাঁ হ্যাঁ ও ঠিকই বলেছে। দু বছর আগে ও প্রথম আবিষ্কৃত হয়। রানাঘাটের মেয়ে। দুর্দান্ত ফুট-ওয়ার্ক। আর ফোর হ্যান্ড। বেঙ্গল টি টি অ্যাসোসিয়েশন থেকে বোধ হয় ওকে কোনও...'

ভেঙ্কট ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'বৃত্তি দেয়। রাইট! এখানে কারুর বাড়ি থাকে, না হোস্টেলে থাকে বল তো!

গৌতম বলল, 'জানি না। তবে জানতে কতক্ষণ। এই উজ্জয়িনী, ও তো লেডিজ কমন রুমে গেল। যাও না। ভাবসাব করো। উঠতি স্টার বলে কথা!'

ইচ্ছে ছিল, কিন্তু উজ্জয়িনী তক্ষুনি গেল না। এই ছেলে দুটো মহা সর্দারি আরম্ভ করেছে। এই দলটার মুকুটহীন রানী সে। কারও কারও সঙ্গে খুব নিচু ক্লাস থেকে এক সঙ্গে পড়েছে, যেমন মিঠু, অণুকা, আবার কেউ-কেউ এইচ-এস-এ এসে যোগ দিয়েছে ভিন্ন স্কুল থেকে। যেমন রাজেশ্বরী। এদের সবইকার সঙ্গেই যে স্কুলে থাকতে খুব ভাব ছিল তা-ও না। যেমন ঋতু। অনেক ছোট থেকে এক সঙ্গে পড়ছে। মোটের ওপর কাছাকাছিই থাকে। তবু খুব একটা মাখামাখি ছিল না। ছোটবেলার বন্ধুরা অনেকেই ভিন্ন স্ট্রীমে চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত এই কজন। যাই হোক। কলেজ একটা বিরাট ব্যাপার। সেখানে এসে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সে তার স্কুলের বাকি মেয়েদের রাখাল। কিন্তু ভেঙ্কট এমন ভাব করছে যেন ও-ই লীডার। ও যা বলবে এই সব বালখিল্য স্কুল বালিকারা তাই-ই করবে। এতটা সর্দারি প্রথম দিনেই! ইস্‌স্! সে বলল, 'না, না, আমরা এখন কমন রুমে যাচ্ছি না, আমরা লিন্ডসে যাবো। এই সন্তোষ, অণু আমরা যাচ্ছি তো! মিঠু, রাজেশ্বরী।'

রাজেশ্বরী বলল, 'আমার গানের ক্লাস আছে তিনটেয়। আমি চলি। আইসক্রিমের জন্য ধন্যবাদ ভেঙ্কট' সে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ব্যাগটা সামলে হন হন করে এগিয়ে গেল।

ঋতু বলল, 'আমারও একটা জরুরি কাজ আছে। সী ইউ'—হাসি হাসি মুখে সবাইকার মুখের ওপর দিয়ে চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিয়ে সে চলে গেল।

বাকিরা লিন্ডসে যাবে বলে ব্যাগের পয়সা গুনতে লাগল। এই সময়ে মিঠু চেঁচিয়ে উঠল, 'বিষ্ণুপ্রিয়া না!' মাথায় খাটো, কিন্তু খুব সুশ্রী একটি শাড়ি পরা মেয়ে মিঠুর দিকে

তাকিয়ে এগিয়ে এলো, 'মিঠু ! মিঠু চৌধুরী ! আরে উজ্জয়িনী না ! এমা ! কত বড় হয়ে গেছিস !'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আর তুই কত ছোট হয়ে গেছিস !' উজ্জয়িনী বলল। 'আমরা লিন্ডসে যাচ্ছি, যাবি ?'

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, 'কদ্দিন পর তোদের সঙ্গে দেখা, যাবো না ? ইস্‌স এক যুগ।'

বিষ্ণুপ্রিয়া ওদের স্কুলেই পড়ত। মাঝে ওর বাবা বদলি হয়ে যাওয়ায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এখন দেখা যাচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া একই কলেজে ঢুকেছে।

উজ্জয়িনী বলল 'ভেঙ্কট, যাবে আমাদের সঙ্গে ? গৌতম ?'

'মার্কেটিং করতে যাচ্ছ নাকি ?'

—'লিন্ডসে যাচ্ছি। তারপর মার্কেটিং করব কি কী করব সে-সব এতো আগে থেকে জানা নেই।'

—'ওরে ওরে কী দিচ্ছে ?' ভেঙ্কট বলল 'কিন্তু মেয়েদের মার্কেটিং-এর মতো ক্যাডাভেরাস হায়ারোগ্লিফিক মেগালোম্যানিয়া আর নেই, কী বল গৌতম ?'

'ওহ্ একেবাঁরে ল্যাকাডেইজিক্যাল গোনাডোট্রাপিক হাইড্রোপনিক্‌স্।' বলতে বলতে গৌতম ক্যানটিনের পথে পা বাড়াল। পেছনে ভেঙ্কট।

রাস্তায় বেরিয়ে উজ্জয়িনী বলল, 'উঃ ছিনে জোঁকের মতো লেগেছিল এতক্ষণে দুটোতে। এখন শান্তি। লিন্ডসেতেই যাবি তো !'

অণুকা বলল, 'এই প্লীজ আজ লিন্ডসেতে যাস না। আমার স্ট্রেংথ কম।'

'তাতে কী ! আমরা কি নিউ মার্কেটটা উঠিয়ে নিয়ে আসব নাকি ? স্রেফ উইনডো শপিং করব। পুড়ে যাবার পর নতুন উইংটা কি রকম করল আমার দেখাই হয় নি।'

'দেখিস নি এখনও?' বিষ্ণুপ্রিয়া বলল 'দারুণ করেছে। ট্রেজার আইল্যান্ডের মতো অনেকটা। তবে আরও বড়। চল তোদের দেখাই।'

উজ্জয়িনী বলল, 'ধুর তোর দেখা ! তবে তো মজাই মাটি। সারাক্ষণ গুরুগিরি করবি। চল তার চেয়ে এ.সি. মার্কেটে যাই। অনেক এক্সক্লুসিভ জিনিস পাওয়া যায়।'

উজ্জয়িনী যখন মনে করেছে নিউ মার্কেট যাবে না, এ.সি. মার্কেট যাবে, তখন সে তা-ইই যাবে। তার ইচ্ছাশক্তির জোর অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং ওরা এ.সি. মার্কেটেই চলল। গুমোট বেশ। আকাশময় এখন ভাঙা ভাঙা মেঘ। তাইতে ভ্যাপসা ভাবটা আরও বেশি। মিঠু বলল, 'বাকি দুপুরটা এ.সি. মার্কেটে উইনডো শপিং করে কাটিয়ে দেব, বুঝলি ? বাববা ! যা গরম ! ব্যাগে যা আছে তাতে হয়ত একটু ঠাণ্ডা খাওয়া হয়ে যাবে, কী বল উজ্জয়িনী !'

উজ্জয়িনী ভুরু কুঁচকে বলল, 'কত ঠাণ্ডা খাবি ? এই তো আইসক্রিম খেলি ? জানিস তো ঠাণ্ডা খেতে হয় শীতকালে। আইসল্যান্ডের লোকেরা আইসক্রিম খায় শরীর গরম রাখতে।'

উজ্জয়িনীর এখন আর এ.সি. মার্কেটে যেতে ইচ্ছে করছে না। বাড়িতে ফিরতেও ভালো লাগছে না। কিন্তু এখন মত বদল করলে বন্ধুরা ক্ষ্যাপা ভাববে। শুধু নিজের কথা ও কাজের সামঞ্জস্য রাখতে তাকে যেতে হচ্ছে। কিন্তু তার ভুরু কুঁচকে আছে। মিঠু আর বিষ্ণুপ্রিয়া নিজেদের মধ্যে কলকল করতে করতে বাসে উঠল। পেছন পেছন অণু আর সন্তোষ। বাসটা ছেড়ে দিল। অণু, সন্তোষ ব্যস্ত হয়ে কনডাকটরকে কিছু বলছে। উজ্জয়িনী খানিকটা চেঁচিয়ে, খানিকটা হাত পা নেড়ে বলল, 'তোরা যা, আমি পরেরটাতে

আসছি।' কিন্তু কিছুদূরে গিয়ে বাসটা ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। কনডাক্টর মুখ বাড়িয়ে তাকে হাত নেড়ে ডাকতে লাগল। 'ও দিদি শীগগির করুন।' অগত্যা জোর পা চালিয়ে তাকে বাসে উঠে পড়তেই হল। অণুর পেছনে বসে সে বলল, 'এইটুকু রাস্তা আমাকে ছেড়ে যেতে পারিস না ? আমি তো পরের বাসেই এসে যেতাম ! থিয়েটার রোডের মোড়ে একটু দাঁড়াতিস !' এখনও বিরক্তিতে তার কপাল কুঁচকে আছে। মা খেল কি না কে জানে ?

২

তাকে খুব মন দিয়ে পথ চলতে হবে....এবং ....এবং

ইমন হাসছিল। খুব যে খুশির হাসি তা নয়। আবার নিছক সামাজিকতার হাসিও না। দুটো মিলিয়ে। হাসলে ইমনের মুখের মধ্যে একটা চাপা আভা বিদ্যুতের মতো যাওয়া-আসা করে। ত্বকের নিচে একটা মৃদু হলুদ বাল্‌ব জ্বলে ওঠে। এরা তাকে চিনে ফেলেছে। সেকেন্ড ইয়ারের উশ্রীদি, মণিদীপাদি প্রথম চিনল। তারপর সেকেন্ড ইয়ারের অনেকেই এক এক করে তার আশে-পাশে দাঁড়িয়ে গেল। আসলে উশ্রীদি আর মণিদীপাদি দুজনেই খেলে। শখের খেলা হলেও, মোটামুটি নিয়ম করে যায় ওয়াই. ডবলু. সি. এ. তে. ওয়াই. এম. সি. এ তেও। ইমনকে খেলতে দেখেছে। নইলে কে আর কাকে চিনছে ?

'তুই আই. মুখার্জি না ? এই দ্যাখ মণিদীপা কাকে ধরেছি।'

ইমন নিঃশব্দ হাসি হাসছে। সে এই ধরনের উত্তেজনা ছড়াতে মোটামুটি অভ্যস্ত।

'নাম কিরে তোর ? কাগজে খালি আই. মুখার্জি, আই মুখার্জি লেখে।'

'ইমন।'

'ইমন ! ফ্যানটাসটিক ! এবারেও চ্যাম্পিয়ন হবি তো ?'

'হ্যাঁ। ইমন সাদাসিধে ভাবে বলল।

'হ্যাঁ? কী সঙ্ঘাতিক কনফিডেন্স রে ! এরকম ছেলে সেজে আছিস কেন?'

'সুবিধে হয়।'

'আয় এক হাত খেলি। ও বিল্ডিংএ যেতে হবে।'

ইমনের ইচ্ছে নেই। বলল, 'পরে হবে।'

উশ্রীদি বলল, 'সংযুক্তা পানিগ্রাহীর সঙ্গে আলাপ হলেই যদি বলিস, একটু নাচুন তো দেখি ! নাচবে !'

মণিদীপা বলল, 'তাই তো ! খুব ডাঁটিয়াল না কি রে তুই!'

'যা ভাবেন।'

ডাঁটিয়াল ভাবলেও কিছু আসে যায় না তোর ?'

ইমন ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল।

'আশ্চর্য মেয়ে তো তুই। দাঁড়া তোকে ছাড়ছি না। এই কঙ্কণা, গোপা, চল এ মেয়েটাকে ক্যানটিনে ধরে নিয়ে যাওয়া যাক

ইমন রাজি হল। কেননা সে ক্যানটিনে যাবার কথাই ভাবছিল। ভীষণ খিদে পেয়েছিল। ভীষণ খিদে পায়।

ক্যানটিন অন্য বিল্ডিং-এ। ফ্রেঞ্চ টোস্ট খেলো দুটো, বেশ বড় এক খণ্ড পুডিং। প্রথমে সে রাজি হয় নি তাকে খাওয়ানের প্রস্তাবে, বলেছিল, 'আপনারা আপনাদের য ইচ্ছে খান না। আমি দেখছি কী নেওয়া যায়।'

হাত থেকে মেনু-কার্ডটা টেনে নিয়ে উশ্রীদি ধমক দিয়ে উঠল, 'তোকে দেখতে হবে না। আমরা দেখছি। আর অত আপনি আপনি কিসের রে ? তুমি বলতে পারিস না ? ইমন অতএব স্মিত মুখে বসেছিল।

'কফি খাবি তো ?'

'না।'

'কারণ আছে না কি রে ? ট্রেনিং-এ আছিস তো ? কী কী খেতে বলেছে ?

'বারণ-টারণ কিছু না। টাইম ফিক্সড় আছে, চা, কফি আমি এমনিই খাই না। বেশি মশলা, ফ্যাটি জিনিসও চলে না।'

'ইস অনেকগুলো কথা বলে ফেললি যে রে ! এতক্ষণ হুঁ হাঁ করে সারছিলিস ! কে তোকে প্রথম আবিষ্কার করে রে ?'

'আবিষ্কার আবার কী।' ইমন হেসে বলল, 'ওখানে একটা ক্লাব ছিল, খেলাধুলো করতুম। ডানপিটে, গেছো ছিলুম। রমুদা, মানে রমেন বিশ্বাস বলে একজন টেবল টেনিস শেখাতেন। দেখে দেখে আমি একদিন বললুম খেলব। রমেনদার সঙ্গে অনেকক্ষণ র‍্যালি হল। উনি ইচ্ছে করেই খানিকটা খেলতে দিচ্ছিলেন আর কি ! তারপর খুশি হয়ে ট্রেনিং দিলেন।

'জাস্ট দেখে দেখে খেললি ? শুনে শুনে গান তোলার মতো !'

'বাড়িতে খেলতুম। মেঝেতে। মাঝখানে একটা নারকেল দড়ি টাঙিয়ে নেট হত।'

'দারুণ ! দারুণ। তার পর ?'

'ক্লাবে সবাই চলে গেলে, বোর্ড ফাঁকা পেলে বন্ধুদের কাউকে নিয়ে খেলতুম। মারগুলো প্র্যাকটিস করতুম।'

'ইস্ কী ট্যালেন্ট ! ভীষণ ভাল লাগল রে ! আমাদের সঙ্গে খেলবি তো?'

'খেলবো না কেন ?' ইমন তার ঝোলাটা নিয়ে উঠে পড়ল। 'আজ যাই। কাজ আছে। হ্যাঁ।'

'দিদিদের অনুমতি নিচ্ছিস ? হাউ সুইট !'

ইমন বেরিয়ে এল। সে কোনদিকে তাকাল না। যেন তার গন্তব্য সর্বদা ঠিক থাকে। লক্ষ্যবস্তু যেন অনেক আগে থেকে দেখে নিয়েছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে হোস্টেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল। ইমনের হাঁটার ভঙ্গিটা একেবারেই মেয়েলি নয়। এটা কি তার পোশাকের জন্য ? নাকি তার শরীর যথেষ্ট পুষ্ট নয় বলে ? ইমন খুব সম্ভব আলাদাভাবে মেয়ে হবার সময় পায় নি এখনও।

কলকাতা সে ভালো করে চেনে না। খেলার সূত্রেই মাঝে মাঝে আসতে হত। কিন্তু সে কতগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট লোকেদের সঙ্গে। এখন সে এখানে বসবাস করছে। ভর্তি হওয়ার পর, গত পরশু দিন সবে এলো। বাসে-ট্রামে বেশ ভিড়। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে লক্ষ্য করল রাস্তাতেও বেশ ভিড়। মাঝে মাঝে সামনে-ধেয়ে-আসা মানুষদের এড়িয়ে এঁকে বেঁকে চলতে হচ্ছে, যে ভাবে বাধা বিপত্তি এড়িয়ে নদী চলে। যতই খণ্ডিত হোক তার চলা, একটা নিরন্তরতা আছে, প্রবাহ আছে সবচেয়ে বেশি করে যা আছে তা হল ছন্দ। এই যে অত্বরিত ছন্দোময় চলা, যা বাং

বিপত্তি সত্ত্বেও অনায়াস্ এবং নদীসদৃশ, এই চলা ইমনকে যতটা উন্মোচিত করে আর কিছু বোধহয় ততটা করে না। সে এমন একজন, যে নিরুচ্ছ্বাস এবং অনভিব্যক্ত বলে বোঝা যায় না যে সে আসলে বীর। প্রথা না মানার ব্যাপারটা সে এমন নির্দ্রোহি ভঙ্গিতে করে যে বোঝা যায় না সে কিছু গড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ভাঙছেও।

হোস্টেলটা একদম চুপচাপ। ইমন নিজের ঘরে চলে গেল। দোতলার কোণের দিকের ঘর। এ ঘরে দুজন থাকে। দুদিকে দুটো লোহার খাট। মাথার কাছে একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার। টেবিলে তাক করা আছে। ইমনের এখনও বিশেষ বই-টই কেনা হয়নি। তাকটা প্রায় খালিই। খাটের তলায় তার ট্রাঙ্ক। টেবিলের তলায় এক দিকে ছোট্ট আলমারি মতো করা আছে, তাতে সে তার নিজস্ব কিছু খাদ্য রাখে। তার রুমমেট এখনও এসে পৌঁছয়নি। ফাঁকা ঘরে একলা খাটে শুতে তার দুটো রাত কেমন-কেমন যেন লেগেছে। ভেতরে-ভেতরে একা হলেও. বাইরে এতটা একা থাকা তার অভ্যেস নেই। ভয় ঠিক হয় না। কী রকম অদ্ভুত অনুভূতি হয়। এইবারে জীবন যেন তাকে সম্পূর্ণ একা করে দিল। তাকে একা করে দেওয়ার এই প্রকল্পটা যেন জীবন অনেক দিন আগে থেকেই শুরু করেছে। সে বুঝতে পারত, একটা কিছু চলছে ভেতরে ভেতরে। ঠিক কী সেটা, তা বুঝতে পারত না। এখন, এই দুদিন একলা থাকতে থাকতে স্পষ্ট হয়েছে ব্যাপারটা। প্রথমে ছিল সে, বাবা, মা, ভাই। বাবাকে কেড়ে নেওয়া হল। বাবার সঙ্গেই তার যা কিছু গল্প, স্বপ্ন দেখা, মতের আদান-প্রদান। বাবার চলে যাওয়া মানেই তার জুড়ি চলে যাওয়া এক রকম। মাকে কাজে বেরোতে হল। সারা দিন রাত কাজ। সে-ও তো এক রকম কেড়ে নেওয়াই। যে মা রাঁধতে-রাঁধতে, ঘরের কাজ সারতে-সারতে নিশ্চিন্ততার একটা গন্ধ ছড়িয়ে রাখত বাড়িতে, সকাল দশটা থেকে এগারটার মধ্যে ভাত পাওয়া যাবেই, ভাতের গন্ধ ভাসবে উঠোনে, নয়নতারা আর টগরের ঝোপের আশেপাশে, ভোরবেলায় চুল ঝাড়ার আওয়াজ, গামছা দিয়ে সপাটে লম্বা চুল ঝাড়া, বিকেলবেলা সুজির গন্ধ, সেলাই হাতে মা, রাত্রে মা সাবান মেখে গা ধুয়ে এসে শুয়েছে। এই সব শব্দ গন্ধ একটা চমৎকার নিশ্চিন্দিপুর তৈরি করে রাখে। মাকে কাজে বেরিয়ে যেতে হলে, ঠিক সেইভাবে সেই গন্ধ, সেই স্পর্শ, সেই শব্দ পাওয়া যায় না। বাবা চলে যাওয়ার পর মায়ের সঙ্গে একটা সখ্য হয়েছিল। তার ভিত প্রয়োজন। দুজনের একাকিত্ব। কিন্তু মা তার স্বপ্নের সঙ্গে নিজের স্বপ্ন মেলাতে পারেনি। অর্থাৎ তার ভেতরে অর্ধেকটা একা, একদম একা। ভাই, ভাইটা কত ছোট। তাকেই আঁকড়ায় যেন মা, যেন বাবা। তাকে, তার নিত্যদিনের উপস্থিতিটাকে ভাইয়ের একান্ত প্রয়োজন। এখনও ভাই তার জীবনের শরিক হতে পারেনি। প্রতিদিনকার খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে হয়ে উঠতে পারত হয়ত। কিন্তু সেই সম্ভাবনাটা মূলেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভেতরের নিঃসঙ্গতাটা তাই ক্রমেই বাইরে বেরিয়ে আসছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে এখনও কেউ নেই যার কাছে যাওয়া যায়। কিছুক্ষণ কথা বলা যায়। রানাঘাটে আর কেউ না থাক রমুদা ছিলেন। অন্য কিছু নয়, খেলাধুলো নিয়েই কথা বলতেন। টেবল টেনিসের কিংবদন্তীপুরুষ ভিক্টর বার্নার কাছে ট্রেনিং নিয়েছিলেন এক সময়ে। সেই সব সুন্দর, আশাব্যঞ্জক, টেকনিক্যাল খুঁটিনাটিতে ভরা গল্প। ইমনের এক চতুর্থাংশ একটা সঙ্গী পেত। এখানে তা-ও না। কলকাতায় তার আসার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু যা কিছু বলার মতো খেলা তো এখানেই। টুর্নামেন্ট খেলার জন্য এসে রমুদার মামাত ভাইয়ের বাড়ি আর উঠতে হবে না। প্র্যাকটিসের ভাল সুযোগ পাওয়া যাবে। সমকক্ষ প্রতিযোগী। সুতরাং বহু চেষ্টাচরিত্র করে বৃত্তি যোগাড়। কিন্তু

ওয়াই.এম.সি.এ তে আগে আগে যখনই খেলতে এসেছে ইমন, প্রতিযোগীদের কেমন অন্য গ্রহের মানুষ বলে মনে হয়েছে। মেলামেশা করতে ইচ্ছে হয়নি। এগুলো সে কাউকে বলেনি, নিজের ভেতরে রেখে দিয়েছে। এগুলো সে জয় করবার চেষ্টা করে যাচ্ছে তার নিজের মতো করে। তার অনেক লড়াইয়ের মধ্যে এটাও একটা।

অনেকক্ষণ সন্ধে হয়ে গেছে। ইমন খেয়াল করে নি। তার আলোর দরকার হয় নি। ঘরের আলোটা টুক করে জ্বলে উঠল।

'হ্যাললো, সিটিং ইন দ্য ডার্ক।' লাজুক লাজুক স্বরে নেপালি মেয়েটি বলল। এ বোধহয় উল্টো দিকের ঘরে থাকে।

'তুমি একলা থেকে বালোবাসছো ?'

'কই না ! এসো না !'

'তুমার রুমমেট আসেনি !'

'না।'

মেয়েটি নেপালি নয়। খাসিয়া। শিলং থেকে ও পড়তে এসেছে এখানে। কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ছে। জলি দেবী, এই ভাবে ও নিজের নাম বলে। থার্ড ইয়ার সবে আরম্ভ হয়েছে। এসে যোগ দিয়েছে। এখনও পরীক্ষার ফলাফল বেরোয়নি।

জলি দেবী এতো চুপচাপ যে ইমনকেই কথা বলতে হয়, 'বি.এসসির পর কী করবে?'

'টীচার্স ট্রেনিং নেবো।'

'এম.এসসি পড়বে না।?'

'না পড়তে বালো লাগে না। আই'ল বী অ টীচার ইন দ্য লোক্যাল স্কুল।

'বাস ?'

'নো। বাস নো। আই'ল ম্যারি,' গাল দুটো লাল করে খুব খুশির হাসি হেসে জলি দেবী বলল, 'অ্যান্ড য়ু ?'

'আমার অনেক কিছু করার আছে।' ইমন আস্তে আস্তে বলল।

'জানে। তুমি ক্যালো।'

ইমন হাসল। যদি খেলা দিয়েই তার 'অনেক কিছু'র ব্যাখ্যা হয়ে যায় তো ভালোই। সে নিজেই কি জানে এই অনেক কিছু ঠিক কী কী ? জানে না। কিন্তু জলির মতো অত সহজে তার পথ শেষ হবে না, এটুকু সে জানে। এবং পথে অনেক চড়াই-উৎরাই থাকবে। এবং তাকে খুব মন দিয়ে পথ চলতে হবে। এবং একা। সে একা।

জলি চলে গেলে সে একটা ইনল্যান্ড লেটার নিয়ে বসল। মাকে একটা চিঠি লেখা যাক। এক দিনেই অবশ্য সে চিঠিটা শেষ করতে চায় না। দু-তিন দিন ধরে লিখবে। বেশ হপ্তাখানেকের অভিজ্ঞতা থাকবে চিঠির পাতায়। মায়ের সঙ্গে কথা বলবে। মুখেও যেমন সে বেশি কথা বলতে পারে না, চিঠিতেও তেমনি। আজকের পুরো দিনটা সম্পর্কে তাই সে শুধু লিখতে পারল—'কলেজটাতে বিরাট বিরাট রাজবাড়ির মতো দরজা। ক্লাস একটা ঘরে হয় না। হোস্টেল ভালো। কারো কারো সঙ্গে আলাপ হয়েছে।'

এইটুকু লিখে সে তার ডট কলমটা খটাস করে বন্ধ করে দিল। তার কি এই প্রথম চিঠি লেখা ? বোধ হয়। বাইরের কথা কিছু লেখা হল। ভেতরের কথা নয় চারদিক-ছেয়ে-থাকা এই একাকিত্বর কথা লিখলে মা মুষড়ে পড়বে। অথচ চিঠিটা পড়ে মায়ের সহজাত বোধে বুঝতে পারবে যে ইমন সব কথা লেখেনি। মায়ের মাথায় ভেতরে অত কাজের মধ্যে একটা ছোট্ট দুশ্চিন্তা-চক্র পাক খাবে। কিন্তু তার মায়ের কিছু করার

নেই। জীবন নামক অজানা-মালিকের হাতে মেয়েকে এইভাবে সঁপে দিতে তো তিনি বাধ্যই হলেন। ইমনেরও কিছু করার নেই। তার হাতে শুধু কয়েকটা মার আছে। তার পা দুটো কোমর পর্যন্ত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জায়গা বদল করতে পারে। পা নয় যেন জাত সাপ। এ ছাড়া তার আছে একটা ব্লটিং পেপারের মতো মন। চারদিকে যা হচ্ছে, ঘটছে সব খুব নিপুণভাবে শুষে নেয়। সে খুব সতর্ক। তার খেলোয়াড়ি প্রশিক্ষণ থেকেই হয়ত এই সতর্কতাটা পেয়েছে, কিংবা বাড়িয়েছে সে। ব্যস। আর কিছু নেই আপাতত। এইটুকু নিয়ে সে ভেসে পড়েছে। একলা।

৩

'আই হ্যাভ গন ক্রেজি—হি.হি.হি...'

দাশ সাহেবের আজকে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেছে। কম্পুটার ওরিয়েন্টেশনের একটা প্রোগ্রাম নিয়েছে কোম্পানি। আয়োজনের সব দায়িত্ব তাঁর। উপস্থিতও থাকতে হবে। সপ্তাহে তিন দিন এই যন্ত্রণা। একসিকিউটিভদের তো ঘরসংসার নেই! তারা চব্বিশ ঘণ্টার বাঁধা চাকর! আজ দেরিটা বড্ডই বেশি হয়ে গেছে। নটা বেজে গেছে। দরজা খুলে দিল তাঁদের বহুদিনের কাজের লোক বাসন্তী।

'বউদি কোথায়?' সামনের ঘরগুলোর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিঃ দাশ। বাড়ি ফিরে বাড়ি অন্ধকার দেখলে, মীনাক্ষীকে না দেখলে চোখে সত্যি-সত্যি অন্ধকার দেখেন তিনি। স্বামী অত্যন্ত ব্যস্ত এই অভিযোগে যখন বিয়ের অনেকদিন পর মীনাক্ষী একটা মারোয়াড়ি স্কুলে কাজ নিলেন, এবং স্কুলের পাহাড়প্রমাণ খাতা দেখায় নিমজ্জিত হয়ে গেলেন, তখন প্রথম দিকটা খুশিই হয়েছিলেন দাশসাহেব। মীনাক্ষীর ব্যস্ত হয়ে থাকাটা তাঁর পক্ষে ভালো। কিন্তু কমার্শিয়াল ফার্মের চাকরিতে কোনদিন নিশ্চিন্ততা আসেনা। তাঁরও আসে নি। ইতিমধ্যে হোমফ্রন্টে তাঁকে ঘিরে যে একটা ব্যস্ততা, আশা, আনন্দের বলয় তৈরি হত, মীনাক্ষী কাজে নেমে পড়ায় সেটা আর হচ্ছে না। সে-ও ব্যস্ত থাকে, সে-ও ক্লান্ত থাকে, তারও বেশ কিছু 'শপ-টক' তৈরি হয়েছে, যেগুলো দাশসাহেবের শুনতে একেবারে ভালো লাগে না। সবচেয়ে বড় কথা মীনাক্ষী যেন আর পুরোটা তাঁর আয়ত্তে নেই। সব সময়েই তাঁর আজকাল হারাই-হারাই ভাব। এমন নয় যে মীনাক্ষী এই বয়সে, বড় মেয়ের বিয়ে দেবার পর, ছোট মেয়ে কলেজে ঢোকার পর হঠাৎ দুম করে পরাসক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু ও হয়ত স্কুলের পার্টির সঙ্গে পনেরো দিন এক্সকারশনে বেরিয়ে গেল। কিংবা রবিবার ওর কোনও সহকর্মিনীর বাড়ি নেমন্তন্ন। রবিবার। সপ্তাহের একমাত্র দিন, যে দিনটাতে অজিত দাশের মনে হয় তিনি একজন সংসারী মানুষ। স্ত্রী-কন্যা ইত্যাদি আছে। তাই রাত নটার পর ঘর অন্ধকার দেখলে ভয় করে, মীনাক্ষী আবার কোথাও গেল না তো! হয়ত ফোন করে জানাবে কিছুক্ষণ পর, আজ আর ফিরতে পারছে না। হ্যাঁ, সকালে বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল মিসেস ভিমানীর বাড়ি দাওয়াত, সেই ব্যারাকপুর। এত রাতে কি আর ফেরা সম্ভব, আনতির বাড়ি...ওই তো টাঙ্গুরে..ওইখানে থেকে যাচ্ছে।

বাসন্তী বলল, 'বউদির মাথা ধরেছে। এতক্ষণ ছটফট করছিলেন। এখন বোধ হয় ঘুমিয়েছেন।'

'ঋতু!'

ঘরে। ওরাও বোধ হয় মাথা ধরেছে।'

মা মেয়ে দুজনেরই মাথা ধরেছে ? ধরতে যে পারে না তা নয়। কিন্তু একই সঙ্গে দু'জনেরই ধরল ? এ তো ফুড পয়জনিং নয় যে বাড়িসুদ্ধ সবার একসঙ্গে হবে, কাজেই দাশসাহেবের অস্বস্তি লাগতে থাকে। মাথা ধরা একটা এমন রোগ, যেটা সত্যিই হতে পারে, আবার মিথ্যে হতেও কোনও বাধা নেই। রাগ-অভিমান-ক্ষোভ-অসন্তোষ এসব জানাবার জন্যে মাথা ধরা আখছার ব্যবহৃত হয়। সত্যিকারের মাথা ধরা হলে তার বিহিত আছে। চটজলদি ওষুধ। মাথা টেপা। এসবে উপকার হয়। কিন্তু মিথ্যেকারের মাথা ধরার প্রতিকার করা খুব শক্ত। মিঃ দাশ সেটা তাঁর দীর্ঘদিনের গার্হস্থ্য জীবনে হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন।

মেয়েকে তিনি বুঝতে পারেন না, তাই ভয়ও করেন বেশি। অতএব আগে ঢুকলেন স্ত্রীর ঘরে। সোজা বলগুলো তো আগে খেলে নেওয়া যাক। মীনাক্ষী মিডিয়াম-পেস, ভালো সুইং করতে পারে না। বেশি রাগ হলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বল দেবে। তিনি চট করে মাথা নিচু করে সেগুলোকে উইকেটের অনেক ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেবেন।

'মীনাক্ষী !' আলতো করে ডেকে, বিছানার ওপর ঝুঁকে তিনি দেখলেন মীনাক্ষী এত টান-টান হয়ে শুয়ে আছে, চোখ দুটো এমন শক্ত করে বন্ধ যে এটা আসল ঘুম হতেই পারে না। অর্থাৎ মীনাক্ষী ইচ্ছে না করলে সাড়া পাওয়া যাবে না।

'ওহ, আজ যা গরম ! অফিস থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত সেদ্ধ হচ্ছি। চানটা সেরে আসি। বুঝলে ? তারপর....' তারপর কী, দাশসাহেব জানেন না। কিছু না-কিছু একটা ঘটবেই। নিয়ত পরিবর্তনশীল এ জগতে কোনও কিছুই থেমে থাকতে পারে না। মাথা ধরা অবস্থাটাও কেটে যেতে বাধ্য। চানটা বড় আরামের। দুশ্চিন্তা যত বেশি থাকে চানের সময়টাও ততই বেশি হয়ে যায়। শীগগিরই হয়ত ফ্রান্সে যেতে হবে একটা টিম নিয়ে। ম্যানেজমেন্ট থেকে একজন, টেকনিক্যাল তিন জন। খুব কম করে হলেও দশ এগারো সপ্তাহের প্রোগ্রাম। মীনাক্ষীকে নিয়ে যাওয়া যায়। মীনাক্ষী যদি ছুটি ম্যানেজ করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে মেয়ে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার কলেজ আছে, নাচ আছে। দিদির বাড়ি সে অনায়াসেই থাকতে পারে, কিন্তু সে থাকবে কি না এবং তার দিদি তাকে আদৌ আগলাতে চাইবে কি না সে কথা এই মুহূর্তে জানা নেই তাঁর। এতগুলো এক্স-ফ্যাক্টর থাকলে লম্বা সময় ধরে চান না করে উপায় ?

সময়টা বোধ হয় একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। বেশির চেয়েও বেশি। বাথটবে জল ভরে, ভাসছেন তো ভাসছেনই। দরজায় করাঘাত।

'কে ?'

'আজ রাতটা কি ওখানেই থাকবে ?'

—'আসছি। এখখুনি !' মীনাক্ষীর মাথা ধরা তাহলে সেরে গেছে ! হৃষ্টমুখে দাশসাহেব চটপট গা-হাত-পা মুছে, তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে আরেকটা তোয়ালে দিয়ে মাথাটা জোরে জোরে মুছতে মুছতে বেরিয়ে পড়লেন।

মীনাক্ষী ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলে। —'এসকেপিজমের একটা সীমা আছে।' সঘৃণায় উচ্চারণ করল।

যাঃ, দাশসাহেবের কূটনৈতিক চালের এক নম্বর ধপাস। মন্দের ভালো শয্যাটি খালি। শয্যাশায়িনী উপবিষ্টা।

'কিছু তো বলবে ?'—মীনাক্ষী একটা আলগা মেরেছে। এখন ক্যাচ উঠবে, না মাথার

অনেক ওপর দিয়ে উড়ে ওভার বাউন্ডারি হয়ে যাবে দাশসাহেব ঠিক জানেন না। যা থাকে কুল-কপালে—'এবার ফ্রান্স, এগারো সপ্তাহ, যাচ্ছ তো?' মাথা মুছতে মুছতে যথাসম্ভব স্বর নিয়ন্ত্রণে রেখে বললেন তিনি।

'আমি মরছি মেয়ের জ্বালায়, তুমি আমায় ট্যুর দিয়ে ভোলাতে এসেছ?' ক্যাচ কট কট। দাশসাহেব হতাশ হয়ে পাঞ্জাবি গলালেন।

'কী ব্যাপার?'

'জানি না। রেগে এটা ছুঁড়ে ফেলছে।' ওটা ছুঁড়ে ফেলছে। খায়নি। প্রচণ্ড না কি মাথা ধরেছে, শুয়ে পড়েছে।'

'কিছু দিয়েছিলে? ট্যাবলেট টেট?'

'বলে কাছেই যেতে দিচ্ছে না। রাগের কোনও ওষুধ আছে? মাথায় এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া ছাড়া? সে কাজটা তুমিই করো।'

দাশসাহেব আউট। মিড্‌ল স্টাম্প ছিটকে গেছে। তিনি সোজা প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতের মুঠোয় চলে গেছেন। ব্যাট বগলে নিয়ে তিনি ফিরে চলেছেন। মাঝের দরজাটা দিয়ে টুক করে গলে পড়েছেন পাশের ঘরে। ভাবছেন মীনাক্ষীকেই খেলতে পারছেন না! মেয়েকে খেলবেন কী করে! সে তো দুর্ধর্ষ! কখন যে কোনটা মারে! মনে হচ্ছে সোজা আসছে বলটা, আসতে আসতে হঠাৎ আচম্‌কা বেঁকে গেল। আবার হয়ত মনে হচ্ছে মারছে একটা গুগলি, দেখা গেল একটা নেহাতই সাদাসিধে বল।

এক সময়ে ঘরটা ছিল দুই মেয়ের। সোমদত্তা আর ঋতুপর্ণা। এখন সোমার বিয়ে হয়ে গেছে। সুতরাং পুরো ঘরটাই ঋতুর দখলে। খুট করে একটা আলো জ্বাললেন দাশসাহেব।

'বাপী, তুমি ফ্রান্স যাচ্ছ? আমি যাব!' চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে আবদারের সুরে ঋতু বলল।

'আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে এখন। আপাতত তো খাবি চল। ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার।'

'যাচ্ছি, আগে প্রমিস করো।'

'ওহ্, প্রমিস করার আমার উপায় নেই ঋতু, খাবি আয়।'

ঋতু এক লাফে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। তার কাফতান মেঝেতে লুটোচ্ছে। দুহাতে সেটাকে একটু তুলে খালি পায়ে নাচতে নাচতে সে খাবার টেবিলে এসে বসল।

'ইস্‌স্—টোমাটো স্টাফ।' চট করে একটা তুলে নিয়ে সে ঠোঁট ফাঁক করে দাঁত দিয়ে কেটে কেটে খেতে লাগল পা নাচাতে নাচাতে।

'তাই বলো, বাবা ফেরেনি বলে রাগ!' মীনাক্ষী বললেন, 'মা কেউ নয়।'

'নয়ই তো কেউ!' ঋতু তেমনি পা নাচাতে নাচাতে বলল, 'মা কেউ নয়, সোমদত্তা অ্যান্ড কোং কেউ নয়, খালি অজিত কাউর ইজ সামবডি'

দাশসাহেব বললেন, 'অজিত কাউর? আমি আবার মহিলা হলাম কবে থেকে?' ঋতু ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। মেয়ের মেজাজ ঠিক হয়ে গেছে এতেই মীনাক্ষী খুশি। তার এতক্ষণের অসভ্যতা, রাগ সব মাফ করে দিয়েছেন।

'কি রে, আরেকটা টোমাটো দিই?'

'ইচ্ছে হলেই নেব। ইউ নীড্‌ন্ট বদার।'

মীনাক্ষী মুখ গম্ভীর করে হাত গুটিয়ে নিলেন। যখন তখন এইভাবে তাঁকে অপমান

করে ঋতু। ভেতরে ভেতরে কাঁদো কাঁদো হয়ে গেলেও মুখে সেটা প্রকাশ করেন না। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি মনে মনে বলছেন সব সময়ে।

বড় মেয়ে সোমা এর থেকে আট বছরের বড়। শান্ত, শিষ্ট, ধীর, স্থির। ইকনমিক্সে পি.এইচ.ডি করেছে। এখন জোকার আই.আই.এম.-এ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হয়েছে। জামাইটিও যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের লেকচারার। সোমা থাকতে ঋতু এতটা বাড়েনি। আসলে আট বছর পরে হওয়ায় ঋতু বোধ হয় মা-বাবার কাছ থেকে একটু অতিরিক্ত আদর-প্রশ্রয় পেয়ে থাকবে। অন্তত সোমার তো দৃঢ় মত তাই। তবে সোমা যে ঋতুকে নিয়ন্ত্রণে রাখত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সোমার বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক। এই সময়টার মধ্যে ঋতু যেন একশখানা মানুষ হয়ে গেছে। মাকে থোড়াই কেয়ার, বাবাকে ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়ে। কেন যে এমন এঁরা বোঝেন না। মীনাক্ষীর সন্দেহ যে ঋতু দিদির কাছে একটা হীনম্মন্যতায় ভোগে। দিদি লেখাপড়ায় চৌখস, স্বভাব চরিত্রও এমন সংযত দায়িত্বশীল যে সবাই সোমা বলতে অজ্ঞান। ঋতু দিদিকে ভেতরে ভেতরে হিংসে করে। দিদির শাসন কোনদিনই ভালো মনে নেয়নি সে। তখন ছোটও ছিল। এখন সুদ সুদ্ধ সব আদায় করে নিচ্ছে। মনে মনেই ভাবেন। ঘুণাক্ষরেও মুখে এসব কথা বলেন না মীনাক্ষী।

ঋতু তার খাওয়া প্রায় শেষ করে এনেছে। দু আঙুলে চাটনি চাটছে এখন। মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ফ্রান্স-ফ্রান্স করছিলে যেন?'

'টুর আছে। দু'মাসের একটু বেশি সময়।'

—'কবে?'

'এই তো মাস তিনেকের মধ্যে কী তারও আগে। পুজোর ঠিক পরটাতেই বোধ হয়।'

ঋতু বলে উঠল, 'আমি তো যাচ্ছি বাপীর সঙ্গে।'

'শোন ঋতু'—চোখ ভয়ে গোল গোল করে অজিত বললেন, 'তোকে যেতে অ্যালাও করবে না। তা ছাড়া তোর কলেজ-টলেজ আছে। এবার তো সিরিয়াস হতে হয়, যদি অ্যাট অল আই. এ. এস হতে চাস! নয়? তবে তোকে রেখে যেতে তোর মায়ের সমস্যা হবে।'

মীনাক্ষী বললেন, 'আমি যাচ্ছি না, কাজেই কোনও সমস্যাই নেই।'

অজিত দাশের মুখটা কাতর হয়ে গেল। দু মাসেরও বেশি বিদেশে থাকতে হবে মীনাক্ষী ছাড়া? সমুদ্রপারে তিনি বহুবার গেছেন। নিসর্গ-টিসর্গ কী মিউজিয়ম, আর্ট এসব কিছুতেই কোনও নতুনত্বের স্বাদ তিনি পান না। তবে হ্যাঁ, পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাস্তাঘাট সুশৃঙ্খল নগরজীবন, পরিকল্পিত সবুজ, ভালো হোটেল, ভিন্ন ভিন্ন দেশের খাবার, সাদা লোকজন—এসব বেশ ভালোই লাগে তাঁর। মীনাক্ষীর আবার যেখানে যাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব টুরিস্ট স্পট দেখার অভ্যাস আছে। মীনাক্ষী না গেলে এই স্বল্পমেয়াদী প্রবাসগুলো তাঁর দুঃসহ লাগে।

ঋতু বলল, 'অফ কোর্স তুমি যাবে। পুজোর ছুটির সঙ্গে আর কয়েক সপ্তাহ যোগ করে দিতে তোমাদের মিসেস ভিমানি যদি আপত্তি করে তো ছেড়ে দাও না শখের চাকরিটা। ওটা তো মড় হবার জন্যে, ফেমিনিস্ট বন্ধুদের খুশি করার জন্যে নিয়েছ!'

তাঁর চাকরি সম্পর্কে এইরকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা মীনাক্ষী একদম পছন্দ করেন না। যার বলার, অর্থাৎ স্বামী, কখনও বলেন না। কিন্তু ছোট মেয়ে সুযোগ পেলেই বলে।

মীনাক্ষী গম্ভীরভাবে মেয়ের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, 'আমি গেলে তুমি থাকবে কোথায় ?'

'বাসন্তী রয়েছে, আমার তো কোনও অসুবিধে হবে না ! অসুবিধেটা তো তোমাদের ! তো সোমাদের রেখে যাও নিশ্চিন্ত হবার জন্যে !'

মীনাক্ষী হতভম্ভ হয়ে বললেন, 'সোমারা ? সোমাদের রেখে যেতে পারি ? তুই সত্যি বলছিস ?'

'কেন ? সোমা এলে আমি অশান্তি করি ?'

অশান্তি করার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু সেটা বলা যাবে না। মীনাক্ষী বললেন, 'সুবিধে-অসুবিধেও তো আছে ! ওদেরও। তোমারও।'

'সোমা থাকবে সোমার মতো। আমি থাকব আমার মতো। আমার ওপর খবরদারি করতে বারণ করে দেবে। আমার এ বছরই কত্থকের ফিফ্‌থ্‌ ইয়ার, এখন কোথাওই যাওয়া সম্ভব নয়।'

মীনাক্ষী বললেন, 'সে তুমি যাইই বলো, আমি যাচ্ছি না।'

'সেটা তোমার ব্যাপার। আমি পার্মিশন দিয়ে দিলাম।' ঋতু উঠে পড়ে।

'আচ্ছা গুড নাইট বাপী, গুড নাইট মা।'

ঋতু চলে গেলে দাশসাহেব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার ?'

মীনাক্ষী ঠোঁট ওল্টালেন। তিনি জানেন না। বললেন, 'আনপ্রেডিক্টেব্‌ল্‌। যা মেজাজ। আমাকে তো তৃণাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করে।'

অজিত বললেন, 'এখন পার্মিশন পেয়েছ, যাবে কি না ঠিক করো। এ সুযোগ রোজ রোজ আসবে না। আমার তেমন জরুরি কিছু কাজ থাকবে না। আসল কাজ তো সিসটেম অ্যানালিস্টদের। চাই কী ইয়োরোপের আরও কিছু-কিছু ঘুরে আসতে পারি। জাপান হয়েছে। ইউ. এস. এ হয়েছে। ইয়োরোপটা হলে একটা....'

'ওকে আবার হওয়া বলে নাকি ? অত বড় আমেরিকা মহাদেশটা, কতটুকু দেখিয়েছ ?'

'ওকে হ্যা, ওই হলো, ওই হলো, খুঁটিয়ে দেখতে গেলে, তিন চার বছর বাস করতে হয়।'

'কিন্তু সোমা কি ওকে আগলাতে চাইবে ?'

'সেটা দেখো। তবে এটা গুড সাইন। আফটার অল ও-ও তো বড় হচ্ছে। নাচটা সিরিয়াসলি নিয়েছে। আসলে কোথাও একটা জেনুইন ইন্টারেস্ট চাই, বুঝলে ? শী ইজ আউটগ্রোয়িং আস।'

মীনাক্ষী নিচের ঠোঁটটা সামান্য একটু বিকৃত করলেন। বিপদ কেটে গেলেই দাশসাহেবের মাথায় নানা রকমের তত্ত্ব আসতে থাকে।

ঋতু নিজের ঘরে ঢুকে দুটো দরজাই বন্ধ করে দিল। মা-বাবার ঘরের দিকের দরজা। আর হলের দিকের দরজা। তার ঘরে ড্রেসিংটেবল নেই। একটা দেয়ালজোড়া আয়না আছে। বারান্দার দিক থেকে আসা আলোয় সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে লাগল, দেখতেই লাগল। ড্রয়ারের ভেতর থেকে ক্রিমের শিশি বার করে অনেকক্ষণ ধরে মাখল। মাখতেই লাগল। মাখতেই লাগল। নিজেকে এভাবে দেখতে, এইভাবে ক্রিম মাখতে অদ্ভুত ভালো লাগে আজকাল। আয়নার ভেতরের ওই মেয়েটাকে দারুণ ভালোবাসে সে। বাবার ইচ্ছে সে আই. এ. এস হয়। মুসৌরির রাস্তায় ঘোড়ায়-চড়া ট্রেনী আই. এ. এস—এই মূর্তিটা তাঁর খুব মনে ধরেছিল তাই বাবার উচ্চাশায়

সে বরাবর তাল দিয়ে এসেছে। এখন কিন্তু বুঝতে পেরে গেছে অশ্বারোহিণী রাজিয়ার রোম্যান্স আই. এ. এস-এর একেবারে গোড়ার দিকের নেহাত ভগ্নাংশ। রাজ্যের সরকারি ফাইল দেখবে বলে কি সে এতো ভালো কত্থক শিখল ? আরও শিখবে, ওড়িশি শিখবে। বেসিসটা আছে। সে খাজুরাহোয় নাচবে। ঠিক যে নাচের জন্যে, নাচ শিল্পটার প্রতি ভালোবাসাবশত তা নয়। সে নাচবে ঋতু নামক এই বিশিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোকে সৌন্দর্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যে, নাচবে এই চোখ দিয়ে কটাক্ষপাতের তীব্র আনন্দে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রীবাভঙ্গির অহঙ্কার অনুভব করবার জন্য।

কলেজের ফ্রেশার্স-এ সে বাধ্য হয়ে নেচেছে। দুপুর বেলা। হলের মধ্যে গুমোট গরম। চারদিক থেকে আলো ঢুকছে। এ গাইছে, ও আবৃত্তি করছে। এই ধরনের হট্টমেলায় মোটেই তার নামতে ইচ্ছে ছিল না। ড্রেস ছাড়া তো আর কত্থক হয় না। সে একটা রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে কম্পোজিশন করেছিল। অনেক হেলায় করলেও জিনিসটা ভালো উৎরেছিল। সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেমেয়েরা তো খুব বাহা বাহা করল। কিন্তু দেখাবার মতো লোক ওখানে কই ? কে আছে তেমন সমঝদার ?

ইতিমধ্যে ঋতু মা-বাবার আসন্ন ফ্রান্স-যাত্রা উপলক্ষে তার নিজের স্বাধীনতা দিবস কাছে এগিয়ে আসছে মনে করে আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না। এত বড় ফ্ল্যাটটায় সে ছাড়া কেউ থাকছে না, বাসন্তী তার আজ্ঞাবহ। কিন্তু মা কি তাকে একদম একা রেখে যেতে চাইবে ? ঠিক আছে সোমারা আসুক। তখনও কিন্তু ঋতুর পরিচালনাতেই সংসার এবং ঋতু নিজে চলবে। সেটা সোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ইতিমধ্যে সে মিঠুকে একটা ফোন করে ফেলল। সে রাশি রাশি ফোন করে বলে এবং তার প্রাইভেসি নষ্ট হবে বলে ফোনটা নিজের ঘরে করিয়ে নিয়েছে কবেই।

মিঠুই ধরেছে, 'হ্যাললো।'

'মিঠু, আমি ঋতু বলছি। হি হি।'

'ঋতু ? এত রাত্রে ?

জবাবে ঋতু শুধু বেশ খানিকটা হাসল—

'হাসছিস কেন ?'

'আই হ্যাভ গন ক্রেজি। হি হি হি।'

'মিঠুকে কী দরকার রে ? ঘুমিয়ে পড়েছে, ডাকব ?'

চৈতন্য ফিরে পেয়ে ঋতু বলল, 'ও মা। মাসি ! আমি একদম বুঝতে পারিনি। না না মিঠুকে ডাকতে হবে না।'

'কোনও মজার কথা আছে মনে হচ্ছে ?'

'সে কালকে হবে।' ঋতু অপ্রতিভ হয়ে ফোন রেখে দিল, তারপর সমস্ত ব্যাপারটার মজায় একলা একলাই হেসে গড়াতে লাগল।

৪

'গোধূলি ! গোধূলি' .....ওই ডাকটা....দুপুরটা..অ্যাসোসিয়েশনটা....

আকাশ কালো করে আসছে। গুম গুম মেঘের ডাক। এ বছর বৃষ্টি আর ফুরোতেই চায় না। গরমও তেমনি। কদিন অসহ্য গুমোট হচ্ছে। দু তিনদিন চলতে থাকছে একই

রকম। তার পরেই গুম গুম গুড় গুড়, ঝমাঝ্‌ঝম। রাস্তার অবস্থা যা তাতে সর্বত্রই চোরা পুকুর! তাতে ভেসে রয়েছে ময়লা, গাড়ির তেলকালি। উজ্জয়িনী পেছন ফিরে বলল, এই মিঠু, তুই কি বি. কে. সি-র ক্লাসটা করবি না কি? আমি বাবা বাড়ি চললাম। বৃষ্টি নাবলে আর ফিরতে হচ্ছে না।' আজকে অনেকেই আসেনি। ছেলেগুলো তো মনে হয় মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে। রোজ বইখাতা নিয়ে কলেজে বেরয়। অর্ধেক দিনই কলেজে ঢোকে না, কোথাও না কোথাও গিয়ে আড্ডা জমায়। কলেজে ঢুকলেও দেখো কমনরুমে, কী লাইব্রেরিতেও। ক্লাসে মুখ দেখায় কম। আজকাল পলিটিকসের ধার মরে গেছে। সে রকম জোর পলিটিকসের আলোচনাও শোনা যায় না। ইউনিয়ন যা করতে বলে সব্বাই মুখ বুজে মোটামুটি তাই করে যায়। কী যে এত আড্ডা মারে ছেলেগুলো। উজ্জয়িনীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। আড্ডার বিষয়বস্তু কি? মিঠু একটু পিছিয়ে ছিল, বলল, 'বি কে সি কিন্তু আজ নতুন চ্যাপ্টার শুরু করবেন।'

'কাকে নিয়ে শুরু করবেন? অর্ধেক তো আসেইনি! আমরা কিছু যদি কেটে যাই তো পরের দিন। চল এই বেলা পালাই। আজ গাড়ি আছে। আয় না।' উজ্জয়িনী মিঠুর কনুই ধরে টান দিল।

ভিক্টোরিয়ার কাছাকাছি আসতে ওরা একটা অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য দেখল। জলভরা নীল রঙের মেঘের প্রেক্ষাপটে আরও সাদা হয়ে ভিক্টোরিয়ার গম্বুজটা ফুটে আছে। দু'পাশে একটু একটু আকাশ, আবার মেঘ। উজ্জয়িনী বলল, 'মোহনদা, একটু থামাও তো! মিঠু ভিক্টোরিয়ায় যাবি?

'যেতে তো খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু বৃষ্টি এলে?'

'এলে ভিজব। চট করে বাড়ি পৌঁছে যাব তো! এ তো আর কলেজ স্ট্রিট নয় যে জ্যামে পড়ব, কি গাড়িতে জল ঢুকে যাবে!'

'চল'— দুজনে নেমে দৌড়ল। গেটের কাছ থেকে ঝালমুড়ি কিনে নিয়ে ঢুকল।

মিঠু বলল, 'ঝালমুড়িতে আজকাল নাকি ব্রাউন শুগার মিশিয়ে দিচ্ছে, জানিস?'

'তাহলে আর এক টাকাতে ঠোঙা দিতে হত না!'

'কি জানি! বাড়িতে তো বাইরের এসব খেতে একদম বারণ করে, কাগজে নাকি বরিয়েছিল।'

'তো তুই খাস নি!' এক ঝটকা দিল উজ্জয়িনী, '—ফ্যাল, ফ্যাল ঠোঙাটা', মিঠুর হাত থকে ঠোঙাটা কেড়ে নিয়ে সে অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, একটা চিল সেটাতে ছোঁ মারল, যতই ওপরে যাচ্ছে ছড়িয়ে পড়ছে মুড়ি, ছোলা, বাদাম, পেঁয়াজ, ঝুরিভাজা, কাঁচালংকা।'

মিঠুর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। উজ্জয়িনী আস্তে বলল, 'সরি, এই মিঠু এক্সট্রীমলি সরি রে!'

মিঠু কেঁদে ফেলল। তার শামলা রঙের চিকণ গালের ওপর দিয়ে জলের ধারা নামছে। চোখদুটো ঈষৎ লাল। একগুচ্ছ চুল হাওয়ার বেগে খালি কপালের ওপর এসে লুটোপুটি খাচ্ছে। খয়েরি রং-এর স্কার্ট দুলছে সে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

উজ্জয়িনী বলল, 'যাঃ, তুই কেঁদে ফেললি! আমি না আসলে মাথাটা না কি রকম গরম হয়ে গেল....আচ্ছা আমরা তো একটা ঠোঙা থেকেই খেতে পারি, পারি না?'

মিঠু ধরা-ধরা গলায় বলল, তুই খা। আমার লাগবে না। ব্যাপারটা যে ঠিক খাওয়া

না খাওয়ার নয়, সেটুকুও তুই বুঝতে পারিস নি।'

উজ্জয়িনী বলল, 'এখানে বাঁদর থাকলে বেশ হত। এই ঠোঙাটাও সে ব্যাটাকে দিয়ে দিতাম। আয়, এই বেঞ্চটাতে বসি।'

মিঠু বলল, 'না, জলের ধারে বসব, অবশ্য তুই যদি আমায় ঠেলে ফেলে না দিস।'

'তার মানে ?' উজ্জয়িনী চোখ বড় বড় করে বলল, 'তোর মনে হয় আমি তোকে ঠেলে ফেলে দিতে পারি ?'

'হ্যাঁ, তোর ধর হঠাৎ ইচ্ছে হল, তুই বোধ হয় নিজেই জানিস না কী পারিস আর কী না পারিস !' জলের ধারের একটা বেঞ্চ দেখে মিঠু বসে পড়ল।

'ওখানে বসলি যে ? যদি তোকে ঠেলে ফেলে দিই ?'

'এখানে ঠেলা মারলে, মাটিতে পড়ব, জলে পড়ব না, পড়লেও সাঁতারটা তো জানি' বলে মিঠু হেসে ফেলল।

উজ্জয়িনী পাশে বসে বলল, 'না রে মিঠু, সত্যিই। হাসি নয়। তুই বোধ হয় না জেনেই আমার সম্পর্কে একটা সত্যি কথা বলেছিস। আমি নিজেই জানি না কী পারি আর কী না পারি। আমার ভেতরে একটা ভীষণ ক্রুয়েলটি আছে, আমি টের পাই....'

'কী বাজে কথা বলছিস ?'

'বাজে কথা নয়। কারণ আছে, শুধু শুধু বলছি না বাবা। আসলে বাবার থেকে বোধ হয় এটা পেয়েছি আমি।'

'মিঠু ভয়ের চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'য্যাঃ, বাবার সম্পর্কে ওভাবে ভাবতে আছে না কি ?'

'তুই আর কতদিন খুকী থাকবি মিঠু !' উজ্জয়িনী বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাবা মা বলে কি সব সমালোচনার উর্ধ্বে ? না স্বর্গের দেব-দেবী ? আমি দেখছি, প্রতিদিন দেখছি 'মাই ফাদার ইজ আ ক্রুয়েল ম্যান, আর্ধেক দিন আমার মা রাতে ঘুমোয় না, খায় না ভালো করে, বাবার অপমানকর ব্যবহারের জন্যে, আর বলতে পাব না সেটা.. !'

'আরে ? তোমরা এখানে ?' ওরা পেছন ফিরে দেখল বিষ্ণুপ্রিয়া আর তন্ময়।

'তোরা ?' বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে চোখ রেখে বলল উজ্জয়িনী।

তন্ময় পাতলা চেহারার, গম্ভীর, একটু ভাবুক ধরনের একটি ছেলে। খুব নিয়মিত ক্লাস করে। তন্ময় বিষ্ণুপ্রিয়া দুজনেই পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স। শোনা যাচ্ছে তন্ময় সায়েন্স স্ট্রিম থেকে এসেছে। ও নাকি খুবই ভালো ছেলে। ইকো, স্ট্যাট্‌স্ নিয়েছে পল সায়েন্সের সঙ্গে।

বিষ্ণুপ্রিয়া একটু বেঁটে। খুব কাটা কাটা চোখ মুখ। উজ্জ্বল রঙ। প্রচুর চুলে একটা বেণী বাঁধা। সে বলল, 'আজ তো আমাদের ডিপার্টমেন্টে প্রায় সব প্রোফেসরই অ্যাবসেন্ট। কী নাকি সেমিনার আছে, সব ঝেঁটিয়ে গেছে। অনেকেই আগে জানত, আসেনি। আমি আর তন্ময় একা পড়ে গেলুম। তাই চলে এলুম। ও কী দারুণ নোটস রাখে ! ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড। এই তন্ময়, খাতাটা দেখা না রে ওদের !'

তন্ময় বলল, 'ডোন্ট বি সিলি। এই তোমরা ঘাসের ওপর এসে বসো না ! বেঞ্চে চারজন কমফর্টেবলি বসতে পারবে না।'

'যদি হয় সজ্জন !' বলে উজ্জয়িনী সরে বসে। মিঠুকেও টেনে আনল। ওরা বসতে উজ্জয়িনী বলল, 'তোমরা তো বেড়াচ্ছিলে ! আমরা আবার তোমাদের ডিসটার্ব করলাম না তো !'

বিষ্ণুপ্রিয়ার গাল লাল হয়ে গেল। সে বলল, 'দেখ, ইচ্ছে করলে অনায়াসে তোদের এড়িয়ে চলে যেতে পারতুম। দেখতেও পেতিস না। তন্ময়টা তলে তলে...জানিস ইকোতে সেভেনটি এইট পার্সেন্ট পেয়েছিল। ম্যাথসে লেটার।'

তন্ময় বলল, 'কী হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া! বাজে বকলে আমি কিন্তু উঠে যাচ্ছি।'

'আহা!' বিষ্ণুপ্রিয়া দমবার পাত্রী নয় 'জানিস, তন্ময় টি ভি-তে প্রোগ্রাম করে, ইয়ুথ টাইমে কুইজ কনডাক্ট করেছিল।'

'দেখি দেখি', মিঠু মুখ বাড়িয়ে বলল, 'তাই ওর মুখটা আমার কেমন চেনা চেনা লাগছিল। তুই বোধ হয় প্রায়ই করিস, না রে তন্ময়!'

তন্ময় বলল, 'মাঝে মাঝে। আসলে রেডিওতে অনেক দিন আগে থেকেই করছি। "বিদ্যার্থীর জন্য"তে বিদ্যার্থী সেজে যে কতবার বসেছি! তোরা কেউ আবৃত্তিতে ইন্টরেস্টেড?'

মিঠু গীতিকবিতা খুব ভালো আবৃত্তি করে, ওর গলাটা মাইকে আসে মিষ্টি, রিনরিনে, অথচ স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ নয়। সে বলল, 'কেন রে?'

'আমাদের একটা খুব ভালো আবৃত্তির ক্লাস হয়। ভয়েস থ্রো কনট্রোল, মডুলেশন, উচ্চারণ খুব ভালো শেখানো হচ্ছে। আমি তো জাস্ট তিন চারটে ক্লাস করার পরেই অনেকটা ইমপ্রুভ করে গেছি।'

'কোথায়?' মিঠু জিজ্ঞেস করল।

'সল্ট লেক। করুণাময়ী।'

'ও ব্বাবা!'

'কেন? তুই থাকিস কোথায়?'

'বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে।'

'বাস রয়েছে। অসুবিধে কী?'

'না বাবা। কলেজ করতেই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর গানের ক্লাস।'

'ওঃ হো, বলতে ভুলে গেছি, ফ্রেশার্স-এ বিউটিফুল গেয়েছিলি তুমি যে সুরের আগুন....'

'থ্যাংকস—' মিঠু বলল, 'তা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বল না তোদের ক্লাসে ভর্তি হতে, ও তো মানিকতলায় থাকে।'

'বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনও আগ্রহই নেই।'

উজ্জয়িনী বলল, 'মিঠু দেখ, মেঘ কেটে গেছে। বৃষ্টিটা তার মানে হল না। ইস্ শুধু শুধু বি কে সি-র ক্লাসটা করা হল না।'

বিষ্ণুপ্রিয়া হেসে উঠল, 'আরে বি কে সি তো সেমিনারে। ক্লাস হতই না, বললুম না!'

মিঠুর হাতে একটা চোরা টান দিয়ে উজ্জয়িনী উঠে পড়ল, বলল, 'আমরা চলি রে। এই মিঠু দেরি হয়ে যাবে কিন্তু, মোহনদাকে আবার ছাড়তে হবে।' বলেই সে হনহন করে প্রায় ছুটতে লাগল। মিঠু অন্য দুজনের দিকে তাকিয়ে বিদায় জানিয়ে কয়েক পা দৌড়ে উজ্জয়িনীকে ধরে ফেলল। উজ্জয়িনী বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বলল, 'টু ইজ কম্প্যানি, থ্রি ইজ...!' মিঠু হাসতে হাসতে বলল, 'ধ্যাঃ, আমরা এতদিন পর্যন্ত গার্লস স্কুলে পড়েছি বলেই আমাদের ওরকম মনে হয়। জাস্ট ফ্রেন্ডস ওরা।'

'ওই আনন্দেই থাক। প্রিয়াটা কী রকম কনজারভেটিভ বাড়ির মেয়ে জানিস? এখনকার দিনেও ওদের মা-কাকিমারা ঘোমটা দিয়ে থাকে। আর কী বিরাট জয়েন্ট

ফ্যামিলি। বাপরে। তোর দম বন্ধ হয়ে আসবে ওদের বাড়ি গেলে! এ ঘর থেকে একজন কাকা বেরোল তো ও ঘর থেকে একজন জেঠী! ঠাকুর্দা, ঠাকুমা! একেবারে সেভেনটিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরি। প্রথম চান্স পেয়েই প্রিয়াটা...' বলে উজ্জয়িনী হাসিতে ফাটতে ফাটতে ছুটতে লাগল। ওদের গাড়ি লোয়ার সার্কুলার রোডে ঢোকবার পর হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। উজ্জয়িনী বলল, 'দুটোতে খুব ভিজবে এবার।'

'এমা সত্যিই তো!' মিঠু বলে উঠল, 'বৃষ্টিটা কী অসভ্য।'

উজ্জয়িনী বলল, 'ভিজুক না। না ভিজলে প্রেম হয়? জলে ভিজবে, রোদে পুড়বে, মাইলের পর মাইল হাঁটবে। ঝড়ো কাকের মতো চেহারা হবে, তবে না? 'বলে সে ভীষণ হাসতে লাগল। মিঠু ড্রাইভারের দিকে ইশারা করে দেখাতে উজ্জয়িনী বলল, 'এবারে নিজেকেই ড্রাইভ করতে হবে দেখছি। নইলে সব মজাই মাটি। কী বলো মোহনদা?'

মোহনলাল পাঁড়ে স্টীয়ারিং-এর দিকে চোখ রেখে বলল, 'জী?' আরেক দফা হাসি শুরু হল উজ্জয়িনীর।

দূর থেকেই কিন্তু বৃষ্টিটাকে আসতে দেখেছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। উজ্জয়িনীরা বাঁ দিকের প্রধান গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া তন্ময়কে বলল, 'শিগগির চল, ভিক্টোরিয়ায় উঠতে হবে। বৃষ্টি আসছে।' দৌড়চ্ছে দুজনেই। বৃষ্টিটা ওদের একটুর জন্যে ধরে ফেলল। চুন্নি দিয়ে মাথাটা আলতো করে মুছতে মুছতে বিষ্ণুপ্রিয়া খিলখিল করে হাসছিল। তন্ময়ও তার রুমাল দিয়ে মাথাটা মুছছে। চশমাটা খুলে নিয়ে মুছে নিল কাচগুলো। তারপর বলল, 'আচ্ছা তোমরা মেয়েরা অকারণে এত হাসো কেন বলো তো?'

'অকারণে? এতটা দৌড়লুম। বৃষ্টির সঙ্গে কমপিটিশনে নামলুম। একটুর জন্যে সেকন্ড এলুম। হাসব না? হোয়াট ফান!'

তন্ময় বলল, 'কি জানি! আমার তো কই হাসি পাচ্ছে না! যাই বলো, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কতকগুলো ফান্ডামেন্টাল ডিফরেন্স আছে।'

'সবাই, আই মিন, সব মেয়েই কি হাসে আমার মতন?'

'মোর অর লেস সব্বাই। মিঠু হাসে, উজ্জয়িনী হাসে...'

'ইমন? ইমনকে আমি এভাবে হাসতে দেখিনি। অবশ্য এরকম পরিস্থিতিতেও পড়িনি কখনও ইমনের সঙ্গে।' বিষ্ণুপ্রিয়া বলল।

'ইমন স্পোর্টসওম্যান তো! একটু আলাদা, অত মেয়েলি নয়,' তন্ময় মন্তব্য করল।

'ঠিক আছে বাবা, আর হাসব না, গ্রাম্পি-ফেস হয়ে থাকব, মেয়েলি-টেয়েলি কত গালাগালি!'

'গালাগালি? মেয়েকে মেয়েলি বললে গালাগালি হয়? আচ্ছা তো!' তন্ময় বলল. 'এবার বোধ হয় কাঁদবে।'

ঝাঁঝাল গলায় বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, 'ভারি বয়ে গেছে কাঁদতে, অত সস্তা না।'

তন্ময় বলল, 'কিন্তু সত্যি, খেয়াল করে দেখবে মেয়েরা অল্পে হাসে, অল্পে কাঁদে। ফলে ওরা কিন্তু ভেতরে কোন কিছুই জমিয়ে রাখতে পারে না। মেয়েদের হার্ট অ্যাটাক কম হয় ওই জন্যে। হাউ স্ট্রেঞ্জ আর নেচার্স ওয়েজ!'

বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রমশই রাগ বেড়ে যাচ্ছে। বলল, 'মেয়েদের গভীরতা নেই, এই বলতে চাইছ তো? মেয়েরাই কিন্তু জগতে বেশি ফেইথফুল, দায়িত্বশীল, নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।'

'আমি কিন্তু বলতে কিছু চাইনি', ভাবুক মুখ করে তন্ময় বলল, 'আই ওয়াজ জাস্ট কিউরিয়াস ! বুঝতে চাইছিলাম। আর তুমি যে গুণগুলোর উল্লেখ করলে সেগুলোর জন্যেও বোধ হয় হাসিকান্নার সেফটি-ভালভের দরবার হয়। নার্ভ জিনিসটা মেয়েদের খুব স্ট্রং। দায়িত্বশীল, নির্ভরযোগ্য...এসব হতে গেলে নার্ভাস সিসটেমে একটা ব্যালান্স দরকার হয় !'

'সব কিছুরই একটা করে ফিজিওলজিক্যাল এক্সপ্ল্যানেশন আছে বুঝি ! মনটা কিছু না !'

'ফিজিওলজিক্যাল এক্সপ্ল্যানেশন তো থাকবেই ! তা নয়ত মেয়েরা অ্যাজ এ ক্লাস আলাদা কেন ? ছেলে অ্যাজ এ ক্লাস আলাদা কেন ? ব্যক্তির কথা হচ্ছে না। ক্লাসের কথা হচ্ছে। আর মন ? মনটার তো আংশিকভাবে শরীরেরই সৃষ্টি। মেডিক্যাল সায়েন্স তো এদিকেই এগোচ্ছে !'

'ওঃ, পারও তুমি !'

'না, আমার খুব আশ্চর্য লাগে, শরীর আগে না মন আগে ! বস্তুবাদ ক্রমেই শরীরকে পয়লা নম্বরে রাখছে। আরেকটা জিনিস দেখো। মেয়েরা এখন ক্লেম করছে তারা পুরুষের সব কাজ করতে পারে। করছেও। বাট আই হ্যাভ মাই ডাউটস !'

'কী রকম ? তুমি কি মেয়েদের রান্নাঘরে ফিরে যেতে বলছ ?'

'আরে দূর ! তা নয় ! কিন্তু কোথাও একটা সীমারেখা আছে। বেসিক্যালি দে আর ডিফরেন্ট। মেন্ট ফর ডিফরেন্ট কাইন্ডস অফ জবস্। ভেবে দেখো, আজকের দিনে অনেক ফ্যামিলিতেই ছেলে আর মেয়েকে বাবা-মা একইভাবে মানুষ করে। আমার বাড়িতেই ধরো না। ছোট থেকে আমি আর আমার বোন এক ধরনের খেলনা পেয়েছি। একসঙ্গে বাড়ির কাজ শিখেছি। ইন ফ্যাক্ট আমাদের পাঁচ জনের ফ্যামিলি। আমরা চার জন আর দিদা। মানে বাবার পিসিমা। তিনিও সব সময়ে থাকেন না। তুমি বোর হচ্ছ না তো !' তন্ময় বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকাল।

'উঁহু, বলো না, ইনট্রেস্টিং, লাগছে।'

'কী যেন বলছিলাম !'

'তোমাদের বাড়ির কথা !'

'ও হ্যাঁ, তো ছোট থেকেই আমি আর বোন ভাগাভাগি করে কাজ করি। আমাদের খুব ছোট্ট ফ্ল্যাট। কোনও কাজের লোক নেই। বাবা বাজার, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস এইসব বাইরের কাজ করে, দিদা রান্না করেন, জাস্ট রান্নাটুকু। মা দিদাকে সাহায্য করে। ঘর-টর পরিষ্কার করে। আমি বাসন মাজি। যে যার কাপড় কেচে নিই। আমার বোন ঘর মোছে। এই রকম ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে কাজের ভাগ তো ! কিন্তু আমার বোন বাইরের কাজের চেয়ে রান্নাটাই প্রেফার করে। বাবার হয়ত অসুবিধে আছে ব্যাংকে যেতে পারবে না। বোন বলবে—তুই যা আমি তোর বাসন মেজে রাখছি। আমাকে রান্নার কাজ দিলে, ও বলবে, আমি রান্নাটা করি না মা, দাদা বাজার করবে।'

'তুমি রান্না করো ! তুমি ?'

'খাবে না কি এক দিন ! ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, সুকতো, মাংস, ফ্রায়েড রাইস, চচ্চড়ি—সব পারি। আনাজপাতি ছুরি দিয়ে, মাছ খুব ভালো ড্রেস করতে পারি।'

'মা !'

'মা ? ওরে বাব্বা, মা একটা ভীষণ গোলমেলে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। দশটা থেকে চারটে তো সেখানে এনগেজড় বটেই, বাড়িতে এত ফাইল নিয়ে আসবে। অনবরত ফোন

আসবে, এখান সেখান, রাইটার্স, সি এস সি দৌড়াদৌড়ি। এর ওপর বাড়ির কাজের চাপ পড়লে...সম্ভব নয়। বাবা বরং অনেক ফ্রি। অফিসের কাজ অফিসে সেরে বাড়ি চলে এলো। ব্যাস, নো মোর ঝঞ্ঝাট!'

বিষ্ণুপ্রিয়া চুন্নির প্রান্ত পাকাতে পাকাতে বলল, 'আমাদের বাড়িতে এসব ভাবতেই পারবে না। আমার ছোটকাকিমাও তো ব্যাঙ্কে কাজ করে! সকালবেলায় ব্রেকফাস্ট তৈরি করবার ভার কাকিমার। সেসব করে তবে অফিস যায়। সন্ধেবেলায় কাকা-কাকিমা প্রায় একই সঙ্গে ফেরে কিন্তু চা-জলখাবার এসব দেয় কাকিমা। এ রকমই সিসটেম আমাদের। আমি আমার দাদার জুতো পালিশ করি, শার্ট-টার্ট ইস্ত্রি করে দিই। একবার বাড়িতে অনেকদিন কাজের লোক ছিল না, তো মা বলেছিল—খেয়ে দেয়ে যে যার বাসন তুলে দেবে। দাদা যেই তুলতে গেছে ঠাম্মা এসে বলল, 'ব্যাটাছেলেকে দিয়ে আর এঁটে বাসনটা নাই তোলালে বউমা।'

বিষ্ণুপ্রিয়া এখন একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। তন্ময় বলল, 'চলো, দরকার হলে ঢোক যাক।'

এখনও বৃষ্টি ভালোই পড়ছে। সমান ধারে। কারো কাছেই ছাতা নেই। তন্ময় ছাত ব্যবহারই করে না। বিষ্ণুপ্রিয়ার ছাতা বাড়িতে পড়ে আছে। ছবি দেখতে দেখতে বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, 'তন্ময় তোমার কোন পেপারটা সবচেয়ে ভালো লাগে?'

'থিয়োরি, অফ কোর্স। ফোর্থ পেপারও ভালো লাগে।'

'দূর, আমি থিয়োরি ভালো বুঝতে পারি না।'

'বল, আর ল্যাসকিটা ভালো করে পড়, আর বি কে সি-র ক্লাসগুলো মন দিয়ে করো। ওতেই হবে।'

'আচ্ছা তন্ময়, তোমার যা রেজাল্ট তাতে তো তুমি আরও নাম-করা কলেজে যেতে পারতে। আর্টসে। পেতে না?'

'পেতাম। কিন্তু আমি চেষ্টা করিনি। আমার বাবা মা সব এই কলেজের। তা ছাড়াও সত্যিকার কারণটা শুনবে?'

'এ ছাড়াও একটা সত্যিকার কারণ আছে? আলাদা? বলো বলো', বিষ্ণুপ্রিয়া উৎসুক হয়ে বলল।

তখন দুপুরবেলা। এপ্রিল। এখানে সীট পড়েছিল। ফার্স্ট হাফটা দিয়ে উঠেছি সেকেন্ড হাফে আমার কিছু নেই। বাইরে এসে, কৃষ্ণচূড়াটা দেখেছ তো? দেখি মাথাটা একেবারে হোরিখেলা হয়ে আছে। গেট দিয়ে বেরিয়ে হাঁটছি। ভীষণ চুপচাপ চারিদিক। হঠাৎ খুব দূর থেকে কে যেন ডাকল —গোধূলি! গোধূলি! ছেলে গলার ডাক। আমি ফিরে চাইলুম, কাউকে দেখতে পেলুম না। তারপর আরও দূর থেকে আরও ক্ষীণ হয়ে ডাকটা ভেসে এল —গোধূলি! গোধূলি! তখনই মনে মনে ঠিক করলুম আমি এখানে পড়ব।'

বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্চর্য হয়ে বলল, 'গোধূলির জন্যে গোধূলি নামের কোনও মেয়ের জন্যে স্ট্রেঞ্জ! তুমি একদম খ্যাপা তন্ময়! তা পেলে খুঁজে তোমার গোধূলিকে?'

তন্ময় বলল, 'খুঁজিনি তো!'

'সে কি? খোঁজনি? গোধূলির জন্যে এলে। তাকেই খুঁজলে না!'

'ঠিক গোধূলি নামের কোনও মেয়ের জন্যে এসেছি ভেবেছ নাকি? পা-গল! জাস্ট ওই ডাকটা, ওই দুপুরটা, অ্যাসোসিয়েশনটা, সব মিলিয়ে আমাকে চুম্বকের মতো টানল

মি বুঝে গেলুম এটাই আমার জায়গা।'

'স্ট্রেঞ্জ!' বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, 'তুমি কি কবি টবি নাকি?'

'হতে পারি। তবে এখনও লিখিনি এক লাইনও। আবৃত্তি করি। বললুম না তোমায়, রূপামায়ীতে আমাদের একটা ক্লাস হয়। একটা শুনবে?' তন্ময় একটু চুপ করে থেকে ্যাৎ ভিন্ন স্বরগ্রামে ভিন্ন গলায় বলে উঠল—

> "শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার
> জন্য কিছু খেলা, শুধু কবিতার জন্য একা হিম সন্ধেবেলা
> ভুবন পেরিয়ে আসা, শুধু কবিতার জন্য
> অপলক মুখশ্রীর শান্তি একঝলক
> শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী, শুধু
> কবিতার জন্য এত রক্তপাত, মেঘে গাঙ্গেয় প্রপাত
> শুধু কবিতার জন্য, আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে লোভ হয়।
> মানুষের মতো ক্ষোভময় বেঁচে থাকা, শুধু কবিতার
> জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি ॥"

'বাঃ খুব সুন্দর আবৃত্তি করো তো! গলাটাকে যেন গড়িয়ে দিলে, বেশ অল্প অল্প থেমে ক নিতে নিতে এগিয়ে গেল!'

'ভালো লাগল? ধন্যবাদ! ওই যে গলাটাকে গড়িয়ে দেওয়া বললে, একটা নটিনিউয়িটির ব্যাপার, এটা এই কবিতাটার বৈশিষ্ট্য, যখন এটা পড়তে গিয়ে কেউ অযথা তি চিহ্ন খরচ করে আমার খুব অস্বোয়াস্তি হয়। তুমি এটা বুঝতে পারো কিনা দেখবার ন্যে এই কবিতাটাই বললাম, খুব দমও লাগে।'

'ও মা! তুমি খুব ডেঞ্জারাস তো! আরও অনেক পরীক্ষা করছ না কি আমাকে লুকিয়ে কিয়ে?'

'তুমিও করো না। কে বারণ করেছে? নইলে কে কার বন্ধু হতে পারে কী করে বোঝা বে! তোমার নামটা কিন্তু বড্ড বড় আর ভারী।' তন্ময়ের মুখে হাসির আভাস।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, 'আমার বন্ধুরা তো সবাই ছোট করে ডাকে।'

চাপা হাসিতে মুখ ভাসিয়ে তন্ময় বলল, 'আমার পক্ষে ওই শর্ট ফর্মে ডাকাটা খুব কওয়ার্ড হবে না?'

এক মুহূর্ত থেমে দু জনেই দরবার ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল। আরও যারা ঘুরে ঘুরে ই দেখছিল তারা আশপাশ থেকে, পেছন ফিরে, মুখ বাড়িয়ে ওদের দেখতে থাকল কৌতূহলে।

৫

ারতবর্ষে আছে শুধু ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টট্যান্ট আর কাটি কোটি ফালতু....'

বিবেকানন্দ রোডের একটা দোতলা বাড়ির একতলার বড় ঘর। খুব সম্ভব দুটো ঘর ল। মাঝখানের দেয়ালটা ভেঙে একটা বড় ঘর করে নেওয়া হয়েছে। ঠিক কলেজ বা লের মতোই সারি সারি চেয়ার ও বেঞ্চ। বি. কে. সি.-র কোচিং এ অঞ্চলে এক ডাকে াই চেনে। 'দোতলায় বোধ হয় সার থাকেন'—বলছিল গৌতম, 'একতলায় গোয়াল'

ভেঙ্কট বলল, 'কদাচ আত্মগ্লানি করিবে না।' গৌতম বলল, '—নাঃ আসলে ভাবছিলুম পূর্বপুরুষরা এইভাবে প্ল্যান করে বাড়ি করে গেলে, কত সুবিধে বল।' ভেঙ্কট বলল, 'শুধু আমরাই নেই, ওদিকে রান্নামহল আছে। একেকদিন ছ্যাঁচড়ার গন্ধ আসে।' 'ছ্যাঁচড়া?' গৌতম নাক কুঁচকোলো। 'কিছু মনে করিসনি ভেঙ্কট বি. কে. সি.-র এখন আমাদের দৌলতে যা মালকড়ি তাতে করে এবেলা ওবেলা মাংস খাওয়া উচিত। ইল্লিশ মৎস্য, রোগন জুস, মুর্গ মুসল্লম, কাশ্মীরি কাবাব, তা না খেয়ে ছ্যাঁচড়া খাচ্ছেন? ছিঃ। এইজন্যই কবি বলেছিলেন, "রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি"।'

বি. কে. সি. আজ বেশ মেজাজে আছেন মনে হচ্ছে। বেশ টুসটুসে চেহারাটি ভদ্রলোকের। গাল-টালগুলো বেশ লালচে। কিন্তু চোখগুলো খুব সিরিয়াস। বি. কে. সি. উদাস মুখে বললেন, 'বুঝলে বাবারা, পড়তে এসেছ, পড়ো, পরীক্ষা পাস করো। সবাই করো। কিন্তু চোখ-কান খোলা রেখে দিও। এমন একটা যুগ এসেছে যে তোমাদের নিজেদের জোরেই চলতে হবে। তাই বলে কি আর আমাদের কাছ থেকে গাইড্যান্স পাবে না? সে কথা বলছি না। কিন্তু মনে রেখো তোমরাই এভরিথিং। আমাদের নানা দিকে বাঁধন। বহু ওবলিগেশনস। অত কর্মশক্তি নেই। তোমাদের বয়সে আমরা প্রায় পুরোটাই অভিভাবকদের দ্বারা পরিচালিত হতাম। এই সমাজ, সংস্কার, এই রাজনীতি, এর ভেতরে ছোট ছোট নাট বল্টু ছিলাম। যে যার নিজের জায়গায় পুরে সিসটেমটার সঙ্গে সঙ্গে পাক খেতাম। ভাবতাম খুব করছি। ফলে কখনও কখনও খুব আত্মপ্রসাদ হত, আবার কখনও কখনও খুব হতাশ হয়ে পড়তাম। এখনও ঘুরছি। চাকাটার সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছি। কিন্তু এটাকে ভিশাস সাইকল বলে এখন চিনতে পারি, বুঝতে পারি। পুরো ঘোরাটা দেখতে পাই। তোমরা আমাদের থেকে ভালো পোজিশনে আছ এই জন্যে যে অনেক ছোট থেকেই তোমরা বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছ। এখন এ যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে কিছুই আর গোপন নেই। আমরা পরিণত বয়সে এসে তবে এই চক্র দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমরা দেখতে পেয়েছ এখন থেকেই। হয়ত শনাক্তও করেছ এটাকে অনেকেই। সমাজের নানা স্তরে—শিক্ষায়, রাজনীতিতে সামাজিক নানা ব্যাপারে, সর্বত্র যে চাকাটা একইভাবে গড়িয়ে চলেছে তাকে থামানো দরকার। থামিয়ে আবার নতুন করে ঘুরিয়ে দিতে হবে। এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কাজটা একদিনে হবার নয়। কারণ এ চাকার এই অভিমুখে ঘূর্ণন তো একদিনে হয়নি। বহু শতাব্দী ধরে হয়েছে।' বি. কে. সি. থামলেন।

বি. কে. সি.-র কোচিং ক্লাসে দু ব্যাচ ছাত্র আসে। ফার্স্ট ব্যাচ, সেকেন্ড পার্ট। দশ জনের জায়গা আছে। সেকেন্ড ব্যাচ, ফার্স্ট পার্ট। দশ জন। দক্ষিণা আড়াইশ। বি. কে. সি. নাকি দুর্দান্ত সব নোটস দেন। সম্ভাব্য প্রশ্নের তালিকাও প্রত্যেকবার শতকরা আশি ভাগ মিলে যায়। গৌতম, ভেঙ্কট, রাজেশ্বরী, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং আরও কেউ-কেউ ভর্তি হয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও নোটস পায়নি। সম্ভাব্য প্রশ্নতালিকা তো নয়ই। অবশ্য দেরি আছে অনেক। ইতিমধ্যে সার বেশ কিছু প্রশ্ন লিখতে দিয়েছেন। শক্ত শক্ত ইংরিজি টেক্সট বুক থেকে সংক্ষিপ্ত করতে দিয়েছেন। সংক্ষিপ্তকরণে গৌতম আর রাজেশ্বরী সারকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। উত্তর প্রায় কারোই মনোমত হয়নি। সার আজকে খাতাগুলো ফেরত দিয়ে কিছুটা আলোচনা করে আবার লিখে আনতে বললেন। তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলেন।

একটি ছেলে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় বলল, 'সার, প্লিজ এক্সকিউজ মি, ও:

ভশাস সাইকলের ব্যাপারটা কি আমাদের সিলেবাসে আছে ? এবার কোয়েশ্চেন আসার কানও চান্স আছে ?'

বাকিরা শিউরে উঠল। কেউ কেউ মজা পেল। বি. কে. সি. কিন্তু রাগলেন না। লেলেন, 'য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষায় ঠিক এই ফর্মে আসার চান্স নেই। তবে এখনও ওই চক্রের ধ্যে আছ। ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই এখন থেকে সচেতন করে দিচ্ছি।'

'আপাতত য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষার সিলেবাস মাফিক নোটস-টোটসগুলো পেলেই মামাদের চলবে সার। মাস-মাস আড়াইশ টাকা করে গচ্চা যাচ্ছে। প্লিজ ডেলিভার দ্য গুডস সার! গার্জেনদের কাছে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হয়।'

এতটা খোলাখুলি আক্রমণে বি. কে. সি. একটু থতিয়ে গেলেন। তারপরে বললেন, গুডস সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কী শুনি! কী পেলে তুমি মনে করবে তোমার আড়াইশ টাকা উশুল হল ?'

'নোটস ন্যাচারালি। সাজেশনস! যাতে পরীক্ষাটা ভালোভাবে উতরোতে পারি।'

'তারপর ?'

'তারপর আমার ভাগ্য। চাকরিবাকরি জোটা সবই তো কপাল! লাইন মারতে হবে। ঠিকঠাক লাইন করতে পারলে চাকরি পেয়ে যাব।'

'অর্থাৎ চক্রটার মধ্যে ঢুকে পড়বে ?'

'চক্র-ফক্র জানি না সার। স্রেফ লাইন, লাইন মেরে একটা কলেজে ঢুকে যাব। তারপর দেখি আমাকে কে ঠেকায়।'

'কী পড়াবে ?'

'এই তো নোটস যোগাড় করছি। এই সবই স্রেফ ঝেড়ে দেব ক্লাসে। কোচিং খুলব। পাঁচশ নেব, এই নোটসগুলোই দেব।'

'তাহলে হরে-দরে চাকা ঘুরে ঠিক এই জায়গাতেই পৌঁছবে—ভিশাস সাইকল ?'

ছেলেটি এবার সত্যি-সত্যি ভিশাস চেহারা ধারণ করল। চেঁচিয়ে বলল, 'তো আপনি ী করছেন ? আপনি নেই এই ভিশাস সাইকলে ? কলেজে ফাঁকি দিয়ে বাড়িতে কোচিং রছেন না ? দু হাতে কামাচ্ছেন না ? একগাদা নোটস তৈরি করে রেখে বছরের পর বছর নগুলোকে ভাড়া খাটাচ্ছেন না ?'

'নো।' বি. কে. সি. উত্তেজিত গলায় বললেন, 'প্রথমত আমি কলেজ আওয়ার্সের াইরে কোচিং করি, এবং নোটস প্রত্যেক বছর রিভাইজিং করি, দ্বিতীয়ত,' দু হাত মুঠো রে টেবিলের ওপর আঘাত করে তিনি বললেন, 'আই অ্যাম ট্রাইং টু ব্রেক দিস সাইকল ন মাই ওন, স্মল, লিমিটেড ওয়ে। আমি তোমাদের নোটস দোব না, দরকার মনে না রলে। আমি তোমাদের শেখাতে চাইছি। নিজেরা যাতে বিষয়টা ধরতে পার, দখল াসে তার ওপর, এবং লিখতে পার সেই চেষ্টাই আন্তরিকভাবে করব বলে, গোড়ার থেকে াট দেওয়া বন্ধ করেছি। তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি খাটছি তোমাদের জন্যে। র চেয়ে বেশি চার্জ কবলেও অন্যায় হত না। রাতে যখন শুই, আই ফিল কমপ্লিটলি ড্রইনড। একেবারে ছিবড়ে হয়ে যাই, বুঝলে ?'

আরেকটি ছেলে এই সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না সার, আমরা াপনর নোটের খ্যাতি শুনেই এসেছি। গত দু বছরের ছাত্রদের তো আপনি নোটস িয়েছেন, আমাদের বেলায় দেবেন না কেন ?'

'শুনবে তাহলে কেন ?' বি. কে. সি. গম্ভীর গলায় বললেন, 'সাইক্লোস্টাইল করে সেই

নোটস ছাত্ররা বিক্রি করেছে। কিছু কিছু মাস্টারমশাইও সেগুলো কিনেছেন এবং তাঁদে ক্লাসে ও কোচিঙে ব্যবহার করছেন।' চেয়ারের ওপর বসে পড়েছেন বি. কে. সি.। অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বললেন, 'এই পাইরেটেড নোটস তোমরা কিনতে পাবে। সেগুলো নিয়ে আমাকে নিষ্কৃতি দাও।'

রাজেশ্বরী এই সময়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। সে যেমনি লম্বা, তেমনি চওড়া। টকটকে ফর্সা তার ওপর। সে ক্লাসে এলে সবাই তার দিকে তাকাবেই এমনি তা ব্যক্তিত্ব। সে বলল, 'সার, আমি পুলকের অভদ্র আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা এখানে শিখতেই এসেছি। আপনার ক্লাস-লেকচার শুনেই আমরা এসেছি। নো কিংবা সাজেশ্চনের জন্যে নয়। আপনি যেমন বুঝবেন, দেবেন। আপনি আমাদে গাইড করলেই আমরা খুশি।' বলেও রাজেশ্বরী দাঁড়িয়েই রইল। সার তখনও দু হাতে মাথার চুল আঁকড়ে বসে আছেন।

ভেঙ্কট বলল, 'এই পুলক, মাফ চা সারের কাছ থেকে।'

পুলক নামের ছেলেটি কিছু বলবার আগেই বি. কে. সি. বললেন, 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম—বলে একটা কথা আছে। আমি তো পুলক এবং তার মতে মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোনও ছাত্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দিতে পারব না। কাজেই মাফ চেয়ে কোন লাভ নেই। পুলক, আমি তোমাকে তোমার গত মাসের টাকাটা ফেরত দিচ্ছি?' তিনি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের একটা ড্রয়ার চাবি দিয়ে খুললেন, টাকাটা বার করলেন।

পুলক পেছন থেকে ভারী ভারী পা ফেলে এগিয়ে এল, টাকাটা নিল, তারপর হঠা সেগুলোকে খুব নাটকীয়ভাবে কুচিয়ে কুচিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে দুমদুম করে বেরিয়ে গেল। একা একা।

বি. কে. সি. বললেন, 'আই অ্যাম সরি স্টুডেন্টস, আজ আর ক্লাস নেবার মুড নেই আমি তোমাদের একটা এক্সট্রা দিন নিয়ে নেব। ডোন্ট ওয়রি।'

ওরা ন'জন খাতাকলম গুছিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। সেই বিমান বলল, 'কী বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল বলো তো!'

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, 'তুমিও তো যোগ দিলে, তাইতে তো ও আরও জোর পেয়ে গেল।'

'তা তোমরাও অনেস্টলি বলো, নোটস দিচ্ছেন না বলে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ছিলু না! সকলেই?'

রাজেশ্বরী বলল, 'কিন্তু আমরা ওভাবে সারের ওপর বিশ্বাস, ধৈর্য, এসব হারাইনি। ত ছাড়া উনি তো যথেষ্টই খাটছিলেন, ধরো ওই যে সামারিটা করতে দিয়েছিলে প্রত্যেকেরটা আলাদা করে দেখে দিয়েছেন, যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিলেন প্রত্যেক পয়েন্ট দিয়েছেন। মাস্টারমশাই কিভাবে পড়াবেন যদি আমরাই বলে দিতে পারি তো তাঁদের কাছে যাওয়ার দরকার কী? আর বি. কে. সি.-র মতো সিনসিয়ার টিচার রাজেশ্বরীর গলায় ক্ষোভ ফেটে পড়ছিল।

'সে দেখো', বিমান বলল, 'তোমরা কলেজে ওঁর কাছে পড়ছ, ওঁর ক্যালি জানো আমরা অন্য কলেজের। আর পুলকের তো সত্যি কথা বলতে পড়বার সময়ই নেই বাড়িতে বাবা পেনশন নিয়েছেন। বড় ভাই কেটে পড়েছে। বাড়ির যেখানে যা কাজ স একধার থেকে পুলক। কলেজেও ও এস এফ-এর চাঁই। কম কাজ না কি ওর?'

রাজেশ্বরী মুখটা বিমানের দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'প্রিয়া, যাবি নাকি' মেয়েদের দলটা চলে গেল। ভেঙ্কট বলল, 'কী কেলো! এর পর সারকে মুখ দেখাে

লজ্জা করবে, যাই বল গৌতম ! কোত্থেকে সব আসে বল তো এরা ! সামান্য ভদ্রতাটুকুও শিখে আসেনি !'

বিমান ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'মুখ সামলে কথা বলবে ।' একজনের দোষে সব্বাইয়ের হাতে মাথা কাটছ !'

গৌতম উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'এই ঘেঁটু চলে আয়, চলে আয় । কী হচ্ছেটা কী ?'

ভেঙ্কট চলতে চলতে আস্তিন গুটোতে লাগল । বলল, 'যা বলেছি, ঠিক বলেছি। ভেঙ্কটেশ পাল কাউকে ভয় পায় না ।'

বিমান রাস্তা পার হতে হতে চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, পুলককে বলব কথাটা !' চট করে একটা ট্রামে চড়ে উল্টো দিকে চলে গেল সে ।

গৌতম ভেঙ্কটের সঙ্গে নিজেদের বাড়ির অভিমুখে চলতে চলতে হঠাৎ বলল, 'এই ঘেঁটু, আমাদের ভবিষ্যৎ কী রে ?'

ভেঙ্কট বলল, 'এই যাই, জিজ্ঞেস করে আসি ।'

'কাকে জিজ্ঞেস করবি ?'

'দেখি, আল্লা, কালী, গড যাকে পাই, আর কাউকে না পাই রাজরাজেশ্বরীকে । ও মেয়েটা মনে হয় সব রাশিফল টল জানে ।'

গৌতম বলল, 'যাঃ, সব সময়ে ইয়ার্কি ভালো লাগে না । স্কুল ফাইনালে স্টার পেলুম । এইচ এস-এ সেটা হয়ে গেল মাটির পিদিম । কোথাও কোনও কিছুর সার্টনটি নেই । স্টেবিলিটি নেই । ভাবলুম মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়ব, এখন পড়ছি পল সায়েন্স । ওই পুলককেই দেখ না, বাম পলিটিক্স করে, অত বড় একটা কলেজের ইউনিয়নের চাঁই, তা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয় । কী রকম ডেসপ্যারেট হয়ে গেছে দেখলি তো ? আমাদের তো লাইন-ফাইন কিস্যু নেই । ধর সারের কাছে পড়ছি, চেষ্টা চরিত্তির করে একটা হাই-সেকেন্ড ক্লাস পেলুম । ধর এম.এ-টাও করলুম । তারপর ? কী করব ?'

'চাকরি করব', নিশ্চিন্তমুখে ভেঙ্কট বলল ।

'চাকরি করবি কী রে শালা । চাকরি নিয়ে তোর জামাইবাবু বসে আছে ?'

'দেখ গৌতম, আমার মেজাজ ভালো নেই । জামাইবাবু তুলিসনি ।'

'তো তুই কক্ষনো সিরিয়াস হবি না ?'

'যাহা আসিবেক তাহা আসিবেক বৎস, ভাবিয়া-চিন্তিয়া কোনও কিনারা করিতে পারিবে না । যে মুহূর্তে ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স ইত্যাদিতে চান্স না পাইয়াছ, কিংবা কমার্সে না গিয়াছ, সে মুহূর্তেই তোমার ভাগ্য ফুটা হইয়া গিয়াছে । পৃথিবীতে, মানে ভারতবর্ষে আছে শুধু ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর কোটি কোটি ফালতু । পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনগুলি দেখো নাই ? তুমি আমি সেই ফালতু । ভাবিয়া লাভ নাই ।'

'দূর । তোর সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই, সত্যি কিছু ভাবিস না ?'

'কী তখন থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছিস বল তো ! আছি আমি হেসে খেলে, বেশ আছি । যখন প্রবলেম আসবে তখন সলভ করব । এখন বলে আমার মেজাজ খারাপ !'

'এই তো বলছিস হেসে-খেলে বেশ আছিস, আবার মেজাজ খারাপ কেন ?'

'রাজেশ্বরীর চেয়ে আমি দু আঙুল বেঁটে !' ভেঙ্কটেশ কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল ।

'তুই কি ওদিকে লাইন মারছিস নাকি ? সাবধান ভেঙ্কট, ওদিকে গেলে চিরকাল ল্যাং-বোট হয়ে থাকতে হবে । কী পার্সন্যালিটি ! যেন ক্লিওপ্যাট্রা !'

ভেঙ্কট ছদ্ম কান্নার সুরে বলল, 'যেদিন থেকে ঠাকুমা শত্রুতা করে এই জগঝম্প নাম গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে সেইদিন থেকে কেউ আমায় কোনও গুরুত্ব দেয় না রে গৌতম। এ বুকটায় বড় দুঃখ!'

'বাড়ি গিয়ে বুকে একটু জল থাবড়ে শুয়ে পড়', গৌতম পা চালাল।

রঙমহলের কাছাকাছি একটা গলিতে ভেঙ্কটেশের বাড়ি। বাড়ি ওদের একার নয়। তিনতলা বাড়িটাতে পাঁচ শরিক। এই পাঁচ আদি শরিকের আবার ডালপালা আছে। সব্বাইকার নাম বাইরে নেম প্লেটে লেখা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে পলি-ক্লিনিক না কি? দরজাটা রাত এগারোটার আগে বন্ধ হয় না। দিবারাত্র রাস্তায় কোনও না কোনও হুজুগে মাইক লেগে আছে। আলো, লোকজন। চুরি-ডাকাতির কোনও ভয় এ পাড়ায় নেই। ভেঙ্কট বলে, 'আমরা গুপ্তযুগে বাস করি। দরজা সব সময়ে খোলা।' এখন ছটার কাছাকাছি। এত সকাল সকাল সে কোনদিনই বাড়ি ফেরে না। দরজা দিয়ে ভেতর ঢুকেই একটা চৌকো উঠোন। কাঁচা উঠোন, তার ওপরে রাজ্যের ময়লা এবং আগাছা। শরিকদের যার যখন ইচ্ছে উঠোনটায় আবর্জনা ফেলছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ভেঙ্কটের খেয়াল হল সিঁড়িগুলো বোধ হয় কালে-ভদ্রে পরিষ্কার হয়। পায়রার বিষ্ঠায় ভর্তি। একটা হুমদো-মতো বেরাল নেংটি ইঁদুর মুখে করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে আলো জ্বলছে না। চারদিক ঘিরে বারান্দা। তারও অবস্থা তথৈবচ। যেখানেই সবাইকার চলনপথ সেখানেই আর কারুর হাত পড়বে না। দোতলার ডানদিকের দুটো ঘর তালাবন্ধ। মেজ ঠাকুর্দার ছেলে নেই। তিন বিবাহিত মেয়েই প্রবাসে থাকে। একজন কানাডায়। তার ছেলে- মেয়েরাও সেখানে বসবাস করছে। কেউ কোনদিন আসবে না। আরেক জন থাকে পুনে, তারও ছেলেদের বিয়ে হয়ে গেছে। পিসিমা নিজে ডাক্তার, ওখানে ফলাও প্র্যাকটিস। আসে না বিশেষ। ছোট পিসিমা থাকে আসাম। অনেক ভেতরে, কোথায় সরকারের এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ সেন্টার আছে, সরভোগ না কি, সেইখানে। এ পিসির মেয়ের বিয়ে হয়েছে দিল্লি। মাঝে মাঝে সেখানে গেছে ভেঙ্কট। যাই হোক, এদের কথা মনে রেখেই দোতলার এই চমৎকার ঘর দু'খানা মেজ ঠাকুর্দা তালা দিয়ে রেখেছেন। তলায় বিরাট গারাজ। তাতে ছোড়দাদুর গাড়ি থাকে। কিন্তু আরও তিনটে গাড়ি থাকতে পারত অনায়াসেই। সেই জায়গায় তার এক দাদার স্কুটার। ঘর দুটোর নাম পিসিমার ঘর। গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোনও পিসিমা এখানে এসেছেন বলে মনে করতে পারল না ভেঙ্কট। মেজ ঠাকুর্দা নিজে থাকেন আর একটু এগিয়ে দু'খানা ঘর নিয়ে। ঠাকুমা বহুদিন গত। ভেঙ্কটের মা-ই তাঁর দেখাশোনা করেন। দোতলাটা পুরোই ছিল ঠাকুমা-ঠাকুর্দাদের দখলে। বড় ঠার্কুদা অনেক দিন গেছেন, ঠাকুমা গেলেন সম্প্রতি, তাঁদের ঘরখানা তালা দেওয়া থাকে। তিন তলায় উঠতে উঠতে ভেঙ্কট মায়ের গলা পেল, 'একটু ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দেবে, তাতেও *এদের ভাগাভাগি, আমি কেন, তুমি নয় কেন*, ছি ছি ছি! এ বাড়িতে মানুষ থাকে!'

'তুমিও থাকো দিদি, মানুষের মধ্যে তাহলে তুমিও পড়ো না।' ঝাঁঝাল গলার জবাব এলো।

'নারদ, নারদ, নারদ নারদ', বলতে বলতে দু তিন সিঁড়ি টপকে নিজেদের ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ভেঙ্কট। মা ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়েই তাকে দেখে চমকে গেল, 'কি রে, তুই? এত তাড়াতাড়ি?'

'কাজ হয়ে গেল, বাড়ি আসব না ?'

'কিছু একটা মতলব আছে নিশ্চয়ই', কাকিমা সঙ্গে সঙ্গে বলল।

মা বলল, 'যা বলেছ, নির্ঘাৎ কিছু মতলবে এসেছে।'

'বাঃ, কী সুন্দর মাতৃসম্বোধন।' মা কাকিমার দিকে পরপর চেয়ে ভেঙ্কট বলল, 'এই তা ঝগড়া কাজিয়া করছিলে। যেই ঘেঁটু এলো অমনি দুজনে এককাট্টা হয়ে গেলে ? মাইরি কাকিমা, তোমাদের প্রতিভা আছে। করো না, কাজিয়াটা কনটিনিউ করো, শুনি, যদি কিছু শিখতে পারি !'

'ভালো হবে না ঘেঁটু, আমার হয়েছে এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল !' মা বলল।

কাকিমা বলল, 'ঝগড়া থেকে কী শিখতে পারিস ? শুনি !'

'কথার পিঠে কথা, লাগসই সব প্রবাদ-বাক্য। আমাদেরও তো দরকার হয় !'

কাকিমা ছদ্মকোপে বলল, 'হনুমান একটা।'

'সে কাকিমা তুমিও। তুমিও হনুমতী, দেখো এইটাকে হনু বলে, কাকিমার মুখে হনু-নির্দেশ করে ভেঙ্কট মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সমস্যাটা কী তোমাদের ?'

মা বলল, 'তোকে বলে কী করব ? করিস তো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।'

'বলো না। বলো না, দেখাই যাক না ঘরের খেয়ে ঘরের মোষ তাড়াতে পারি কি না !'

'উঠোনটা দেখেছিস ? কী অবস্থা ! থাকতে ঘেন্না হয়। মেজ জ্যাঠামশাই গন্ধে টিকতে পারছেন না। আমরাও টের পাচ্ছি। অসম্ভব মাছি-মশা বেড়ে গেছে। কেউ পরিষ্কার করাবে না। জমাদারও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আমি যদি করে দিই, কী দেবে ?'

'তুই ? তুই করবি ? তাহলেই হয়েছে ! তবে করলে ধন্যবাদ দেব।' কাকিমা বলল।

'শুকনো ধন্যবাদে আর চিঁড়ে ভিজবে না আন্টি। ডেভেলপ্‌ড কানট্রিতে ছেলে-মেয়েদের ঘরের কাজের জন্যে পে করতে হয়। তা জানো ?'

'এটা তো ভেডেলপ্‌ড কানট্রি নয়। এটা উন্নয়নশীল।'

'কিন্তু এখানকার ছেলেমেয়েরা উন্নত হয়ে গেছে অলরেডি। সবাই মিলে কিছু কিছু পহা ছাড়ো আমি শুধু উঠোন কেন, সিঁড়ি, বারান্দা সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি।'

পরদিন ভোরবেলা এক অভিনব দৃশ্য দেখা গেল। হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা ভেঙ্কট মুড়ো ঝাঁটা, খুরপি, শাবল আর বালতি নিয়ে উঠোনে নেমে পড়েছে। প্রথমেই সে তার পেল্লাই ঝাঁটা দিয়ে ময়লাগুলো সব জড়ো করল বালতিতে। দু তিনবারে সেগুলো গলির বাঁকে কর্পোরেশনের ট্যারা-হয়ে-থাকা ডাস্টবিনটাতে ফেলে দিয়ে এলো। একটা মরা ছুঁচো থেকেই মারাত্মক গন্ধটা বেরোচ্ছিল। এরপর সে খুরপি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগাছাগুলো তুলে ফেলল। সেগুলোরও গতি হল ডাস্টবিনে, তিন চার দফায়। এবার সে আগাগোড়া উঠোনটার মাটি শাবল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে ওলটপালট করে দিল। দশটা নাগাদ যখন তার কাজ শেষ হল ঘামে গা চকচক করছে, পা হাঁটু পর্যন্ত মাটি মাখা, মুখে জয়ের উল্লাস। তার নিজস্ব কাকিমা বলল, 'কী নিঘ্‌ঘিন্‌নে ছেলেরে বাবা !' শেষ দাদাটি অফিসে বেরিয়ে যাবার সময়ে বলে গেল, 'ব্রাভো, ঘেঁটু থ্যাংকিউ।' ভেঙ্কট নিচের কলতলায় আপাদমস্তক চান করে তার পরিষ্কৃত ঝাঁটা বালতি শাবল খুরপি ব্লিচিং ইত্যাদি কলঘরের কোণে গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে এলো। এই বস্তুগুলো সে কাল বাড়িরই বিভিন্ন শরিকের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। ব্লিচিং পাউডার ফিনাইল ইত্যাদি কেনা হয়েছে মেজদাদুর পয়সায়।

খেয়ে-দেয়ে কলেজ বেরোবার মুখে সে মেজদাদুর ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'কী মেজদাদু, গন্ধ আর পাচ্ছ ?'

উত্তরে মেজদাদু বললেন, 'আয় ঘেঁটু ইদিকে আয়।'

কাছে যেতে মেজদাদু সরু গলায় বললেন, 'আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব ব্যারিস্টার সবণীভূষণ পাল এই বাড়ি করেছিলেন অনেক সাধ করে, পরের জেনারেশনগুলোয় অকৃতী অধমও তেমন কেউ নেই, তবু তাঁর সাধের বাড়ি কেউ নিজের বলে ভাবে না। একটু যত্ন করে না, তুমি করলে—আশীর্বাদ করি জয়ী হও।'

'জয়ী হলে কী পুরস্কার দেবে ?'

'যা চাইবে বাপধন, এখনও একটু ব্লিচিং-এর গন্ধ পাচ্ছি যেন !'

'শিগগিরই সুগন্ধ পাবে কথা দিচ্ছি। তখন কিন্তু পুরস্কারের কথা ভুলো না।'

মাখখানেক ধরে ভেঙ্কট তাদের এজমালি বাড়ির উঠোন, সিঁড়ি, বারান্দা পরিষ্কার করল। প্রতিদিন। তারপর মেজদাদুকে একদিন বলল, 'সুগন্ধ চাও তো !'

'—আর কী চাইব বল ! ওই একটি ক্ষমতাই তো এখনও টিকে আছে। আজকাল তো খাবার-দাবারে পর্যন্ত সোয়াদ পাই না। বউমা রাগ করে বলে আপনার মন আর কোনদিনই পাব না। কিন্তু সত্যি বলছি ঘেঁটু মুখে দিলে সব অন্ন-ব্যঞ্জন আমার ঘাস মনে হয়।'

'টেস্ট-বাডগুলো গেছে আর কি ! তা সুগন্ধ চাও তো শতখানেক টাকা ছাড়।'

মেজদাদুর নিজের তো যথেষ্ট টাকাকড়ি আছেই। তিন মেয়ে যখন-তখন টাকা পাঠায়। শেষোক্ত টাকাগুলো তিনি ব্যাঙ্কে তোলেন না। তোশকের তলা থেকে একটা খাম বার করে তিনি দুশ টাকা ভেঙ্কটকে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নিচের উঠোন ফুলের টবে ভরে উঠল। সবই গন্ধপুষ্প। ভেঙ্কট নিজে এগুলোর পরিচর্যা করে। দু একটি ভাইপো ভাইঝি ফুল দেখে আকৃষ্ট হল। তখন সে তাদেরও লাগিয়ে দিল ফুলবাগানের কাজে।

কয়েকদিন আগেই কর্পোরেশন থেকে একটা নোটিস এসেছিল। বাড়ি অবিলম্বে সারাই করতে হবে, নইলে বাড়ি ভাঙা হবে। সেই নোটিসটা নিয়ে ভেঙ্কট তার ছোড়দাদুর কাছে গেল।

'ছোড়দাদু, নোটিসটা দেখেছ তো ! কী করবে ঠিক করলে ?'

'ওসব ঘুষ-ঘাষ দিয়ে কর্পোরেশনকে ঠেকিয়ে রাখা কিছু শক্ত না। তুই ছেলেমানুষ ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন ?

ভেঙ্কট বলল, 'যা ব্বাবা গ্র্যান্ডি ফ্লোরা, কেউ মাথা ঘামাবে না, এদিকে বিশুকাকাদের ছাতে মাঝে মাঝেই আমাদের কার্নিসের চাঙড় খসে পড়ছে, সে কথা জানো ? ওদের ঠাকুরের ছবি ছিটকে পড়ে চুরমার হয়ে গিয়েছিল একদিন, তা জানো ? যদি কোনও মানুষের ঘাড়ে পড়ে তো তোমাদের সবার হাতে দড়ি পড়বে কিন্তু ছোড়দাদু।'

'পড়লে পড়বে। ঘানি টানব এখন। তুই যা দিকি নি। কী পড়ছিস আজকাল ? হঠাৎ বাড়ি নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন ?'

'বাঃ একেই বলে গ্র্যান্ডি ফ্লোরা। দিবারাত্র শুনছি ঘরের খেয়ে নাকি বনের মোষ তাড়াই। যেই একটু চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম করতে গেলুম অমনি মাথা ঘামাচ্ছিস কেন ? পরিষ্কার সিঁড়ি দিয়ে পরিষ্কার বারান্দায় উঠতে কেমন লাগছে বলো ? দুরকমের গোলাপ এনেছি। ক্রমশ গোলাপবাগান করে ফেলব উঠোনটা। কেমন লাগছে ?'

'ভালোই করেছিস। এ বাড়ির ছেলেগুলো তো সব স্বার্থপরের চূড়ান্ত। যে যার নিজের টুকুর বাইরে আর কিছুই দেখতে পায় না। মক্কেলগুলো আসে, সদর দিয়ে ঢুকেই ধাপার মাঠ। অ্যাদ্দিন কী লজ্জাই করত! এই তো গত পরশু দ্বিজেন সমাদ্দার, একজন ধনী মক্কেল জিজ্ঞেস করছিল পড়ো উঠোনটা কী করে এমন হল!'

'ম্যাগনিফিকো প্রোফান্ডিস! ছোড়দাদু তুমি যদি অনুমতি দাও বাড়িটা আমি সারাবার ব্যবস্থা করি।'

'তুই বাড়ি সারাবি? তুই?'

'হ্যাঁ আমি। আমার ভাণ্ডার আছে ভরে তোমা সবাকার ঘরে ঘরে, জানো না! সহযোগিতা করতে হবে। সর্বপ্রথম লাগবে অনুমতি।'

'তো যা, দিলুম অনুমতি।'

'লিখিত দাও।'

'লিখিত আবার কী রে? পালা পালা। বড্ড ডেঁপো হয়ে গিয়েছিস।'

'অ, যেই আটঘাট বেঁধে কাজ করতে নামছি অমনি ডেঁপো হয়ে গেলুম। শাস্ত্রে পড়েছ শতং বদ, মা লিখ। সেইটে ফলো করছ ছোড়দাদু। কিন্তু তুমি এখন ভার্চুয়াল হেড অফ দা ফ্যামিলি, তুমি লিখিত অনুমতি না দিলে আমার স্ট্যাটাস কী? লোকে আমায় টাকা দেবে কেন! এই দেখো মেজদাদু লিখে দিয়েছে।'

মেজদাদু এবং ছোড়দাদুর অনুমতি-পত্র হাতে করে, বাড়ি সারানোর এস্টিমেট এক হাতে, কর্পোরেশনের নোটিস আরেক হাতে ভেঙ্কট অতঃপর সবার দ্বারস্থ হতে লাগল গলবস্ত্র হয়ে। কোথা থেকে একটা নতুন গামছা যোগাড় করেছে, সেইটাকে গলায় ঝুলিয়ে হাত জোর করে প্রত্যেককে বলে 'আজ্ঞে আমার গৃহদায়, কিছু ছাড়ুন, পুরো হিসেব পেয়ে যাবেন।'

কেউ বিরক্ত হয়ে, কেউ চক্ষুলজ্জায়, কেউ বা ভালোই হবে, আমাকে ঝামেলা পোয়াতে হবে না এই মনে করে প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু দিল। কিছুদিনের মধ্যেই ভেঙ্কটের তত্ত্বাবধানে, সম্ভবত পঞ্চাশ বছর পরে পালবাড়ি আগাপাশতলা সারাই আরম্ভ হল।

৬

'এখন সব প্রতিষ্ঠানই রাজনৈতিক সংগঠন'...'ধর্ম কি একটা চাই-ই?'

ঠিক দু'দিনের আড়াআড়ি এস. এফ. আই এবং ছাত্র পরিষদ রাজেশ্বরীকে কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নের নির্বাচনে তাদের সেকশনের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়াতে বলল। দু'দলকেই না করে দিল সে। কিন্তু ব্যাপারটা তাকে খুব অবাক করল। দু'দল দু'রকম পোস্টার সাঁটছে। মুখোমুখি হলেই দাঁতে-নখে। রাজেশ্বরী কাদের সমর্থন করে, আদৌ এ সব ব্যাপারে কোনও আগ্রহ আছে কি না, কোন কথাই কেউ জানতে চাইল না, জানবার চেষ্টাও করল না। এসে স্রেফ বলে দিল তুমি আমাদের হয়ে দাঁড়াও! তার মনে হল উজ্জয়িনীর সঙ্গে আলোচনা করবে এটা নিয়ে। এমনিতে উজ্জয়িনীকে সে খুব একটা পছন্দ করে না। উজ্জয়িনী ধনীর দুলালী। যথেচ্ছ আশকারা পেয়ে বড় হয়েছে এবং হচ্ছে। অহংকারী, খামখেয়ালী। বন্ধুদের ওপর ছড়ি ঘোরাবার অভ্যেস আছে। রাজেশ্বরী এগুলো ভালো করেই লক্ষ করেছে। ওর সঙ্গে একত্রে হায়ার সেকেন্ডারি পড়েছে সে।

উজ্জয়িনী ছিল তাদের হাউজ-লিডার। অনেক কাজই অণুকা বা মিঠুকে দিয়ে করাত তখন। অণুকে তো ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করত—'এই অণু আমার ব্যাগটা ধর তো, কাঁধে ব্যথা করছে,' কিংবা 'অণু কাল আমি স্কুলে আসব না, তুইও আসবি না খবর্দার,' কলেজে ঢোকবার পর রাজেশ্বরী লক্ষ করেছে অণু পাস ক্লাসের সব নোটস রাখে উজ্জয়িনীর জন্যে। খুব ভাগ্য সে দু'জনের আলাদা-আলাদা বিষয়ে অনার্স। না হলে অণুকে উজ্জয়িনীর সব লাইব্রেরি-ওয়ার্ক করে দিতে হত। স্কুল-জীবনে যে মিঠুকে দিয়ে কত চার্ট করিয়েছে। কত প্রাচীর-পত্রিকা লিখিয়েছে তার ঠিক নেই। পরীক্ষা, অসুখ কিছুই মানবে না। অণুকাকেও সে এই একই কারণে পছন্দ করে না, অমন ক্রীতদাস মনোবৃত্তি হবেই বা কেন। তার সন্দেহ অণু একেবারেই মধ্যবিত্ত বলে এইরকম একটা হীনম্মন্যতা তার মধ্যে আছে। টাকার পরিমাপ, তা-ও আবার বাবা-মার টাকার পরিমাপে মানুষের মনুষ্যত্বের গুণমান বিচার হবে ? ব্যাপারটা রাজেশ্বরীর খুব অশ্লীল লাগে। মিঠুর ধরনটা একটু অন্যরকম। সে উজ্জয়িনীকে সত্যি-সত্যি ভালোবাসে। মিঠুর বাড়ি খুব প্রগতিশীল। কিন্তু মিঠু মেয়েটা খুব নরম প্রকৃতির। মিঠুর প্রগতিশীল দিকটা সে পছন্দ করে, অত্যধিক নরম দিকটা ততটা নয়। সে জন্যেই উজ্জয়িনীকে এই আলোচনার জন্যে বাছল সে। হাজার হলেও অতদিন ক্লাস-ক্যাপটেন হাউস-লিডার হবার অভিজ্ঞতারও একটা দাম আছে তো ! উজ্জয়িনীর বাঁ পাশে নিজের ব্যাগটা রাখল সে। বেঞ্চের ওপর মাথা নামিয়ে ফিসফিস করে কথাগুলো তাকে বলল রাজেশ্বরী। গোপনতা রক্ষা করতে বলল। দ্বিগুণ বিস্মিত হয়ে উজ্জয়িনী বলল, 'তোকেও বলেছে এস. এফ ? আমাকেও তো ভীষণ প্রেশার দিচ্ছে ?' রেগেমেগে ক্লাসে বসেই দু'জনে ঠিক করল ইউনিয়ন রুমে যাবে, এর ফয়সালা হওয়া দরকার।

তিনটের আগে ইউনিয়ন রুমে যাবার সুযোগ পেল না ওরা। উজ্জয়িনীর ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। সে রাজেশ্বরীর জন্যে বসে আছে। মিঠু অণু দু'জনকেই সে কাটিয়ে দিয়েছে আজকে। ব্যাপারটার গোপনতা এখনও রক্ষা করছে ওরা। রাজেশ্বরী ক্লাস করে ছুটতে ছুটতে এলো।

ইউনিয়ন রুমে বেশ কয়েকজন ছেলে বসে বসে ফাইল গুছোচ্ছিল। ওরা গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সুকান্তদা নেই ?'

'বসো, এসে যাবে।' কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর একজন বলল 'সুকান্তকে খুঁজছ কেন ?'

'দরকার আছে।

'আমি তোমাদের সুকান্তদার আগে পর পর তিন বছর জি. এস. ছিলুম। আমাকে বলা যায় না ? আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কে যেন ফার্স্ট ইয়ার 'এ' থেকে দাঁড়াচ্ছ না ?' রাজেশ্বরী আর উজ্জয়িনী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। উজ্জয়িনী যুদ্ধং দেহি গলায় বলল, 'সেটাই জানতে চাইছি। কে ? কাকে আপনারা দাঁড়াতে বলছেন ? নিজেরাই বোধ হয় মনস্থির করতে পারেননি এখনও, না ? আমাকেও বলছেন, ওকেও বলছেন !'

এই সময়ে সুকান্তদা এসে গেল। রাজেশ্বরীকে দেখে বলল, 'কী ? মত বদলেছ, ভেরি গুড।'

তখন পূর্ববর্তী জি এস বলল, 'উঁহু, এদের তোর নামে গুরুতর অভিযোগ আছে। তুই নাকি একই সময়ে দু'জনের কাছেই প্রোপোজাল রেখেছিস ?'

'তো কী হয়েছে ? বিয়ের প্রোপোজাল তো আর নয় !' সুকান্ত হাসতে হাসতে বলল,

'আরে ভাই এসো, চা খাও। তোমরা দু'জনে খুব বন্ধু না? হবেই। দু'জনেই বর্ন-লিডার। কে দাঁড়াবে। তোমরা নিজেরাই ঠিক করো না!'

'কেন? আর কাউকে বলেননি?' রাজেশ্বরীর গলায় উষ্মা। 'আমি তো না-ই বলে দিয়েছি।'

'না না। তোমরাই ক্লাসে সবচেয়ে পপুলার। ইনফ্লুয়েনশ্যাল। ব্যক্তিত্ব আছে। কাজও করতে পারবে। কে রাজি হবে তা তো জানি না, তাই দু'জনের কাছেই...অন্যায় হয়েছে তাতে? মাফ চাইছি।' সুকান্তদা হাত জোড় করল।

উজ্জয়িনী এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল, 'আমি দাঁড়াচ্ছি না। আমাকে বাদ দিতে পারেন।'

রাজেশ্বরী বলল, 'আমিও ইনটারেস্টেড নই।'

'দয়া করো ভাই, দয়া করো' সুকান্ত করুণ গলা করে বলল, 'এক্কেবারে ডুবে যাব। রাজি হয়ে যাও রাজেশ্বরী। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না, আমরাই সব করব।'

এমনভাবে প্রথমে তিন চারজন, পরে পাঁচ ছ'জন রাজেশ্বরীকে ঘিরে দাঁড়াল যে রাজেশ্বরী চট করে উজ্জয়িনীর মতো বেরিয়ে যেতে পারল না। তারপর সবাই মিলে চলল অনুনয়-বিনয়, 'ভেবে দেখো, দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা সবার থাকে না, যাদের থাকে তারাও যদি এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়! তোমাদের ক্লাসে আমরা একটা মোটামুটি সার্ভে করেছি, বেশির ভাগই তোমাকেই প্রতিনিধি হিসেবে চায়।'

'আপনাদের রাজনৈতিক মতাদর্শে আমি বিশ্বাস করি কি না-করি সেটাও তো আপনারা জানেন না। জানেন?'

'আরে তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় তুমি প্রগতিশীল, এর চেয়ে বেশি আমাদের জানবার দরকার করে না। একটা তো বছর...থাকলই বা অনার্স...এমন কিছু সময় তোমার থেকে আমরা দাবি করব না।'

শেষপর্যন্ত গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যখন সে বেরোতে পারল তখন সুকান্তরা তার মত আদায় করে নিয়েছে।

কিন্তু কিছুদিন পর যখন ভোটের মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়ে গেল, এবং ক্লাসে রাজেশ্বরী আচার্যর নামে পোস্টার পড়তে লাগল, একদিন সবিস্ময়ে সবাই দেখল ছাত্র পরিষদের প্রার্থী হিসেবে তার পাশেই উজ্জয়িনী মিত্রর নাম পড়েছে।

মিঠু বলল, 'আমরা কেউ জানতাম না বিশ্বাস কর। উজ্জয়িনীকে বলব উইথড্র করে নিতে। আমাদের কাউকেই ঘুণাক্ষরেও বলেনি। কোনও মানে হয়? তা ছাড়া দেখ, কালেজ ইউনিয়নে ভোট হবে তার আবার এস. এফ. আই., সি. পি. কি রে? যাচ্ছেতাই ব্যাপার সব!'

গৌতম কাছেই ছিল, বলল, 'এ মেয়েটা কী রে! এস. এফ. আই. আর আর সি. পি. দুটো রাজনৈতিক দলের ছাত্রশাখা। দুটো দলই সব কলেজগুলোকে কব্জা করতে চাইছে। ভোটের বয়স আঠারো হওয়ায় গুরুত্বও ভীষণ বেড়ে গেছে ছাত্রদের রাজনৈতিক দিক থেকে। এটা বুঝতে অসুবিধে কোথায়?'

মিঠু বলল, 'তোদের মগজ ওইভাবেই ধোলাই হয়েছে তাই বুঝতে পারিস না।'

'ছাত্রশাখা তো কী! কলেজটা কি রাজনৈতিক সংগঠন? কলেজের গেটের বাইরে যা করবার করুক। ইচ্ছে হলে বাইরে থেকেও গাইড করতে পারে, কিন্তু ভেতরে এভাবে সর্দারি করাটা, খোলাখুলি রাজনৈতিক দলের নামে নির্বাচন হওয়াটা ভালগার। ভালো

করে বুঝে দেখ।'

গৌতম বলল, 'এভাবে কেউ এখন ভাবে না মিঠু। এখন সব প্রতিষ্ঠানই রাজনৈতিক সংগঠন। সারা দেশে কোনও মানুষই শুধু নিজের ব্যক্তি-পরিচয়ে চলাফেরা করছে না। কোনও না কোনও পার্টির কালারে তার পরিচয়। কে কংগ্রেস, তার মধ্যে আবার ভজকট, কে জনতা, কে বি. জে. পি, কে লেফট, কে রাইট।'

'তাহলে বল আমরা ক্রমশ অরওয়েলের "নাইনটিন এইট্টি ফোর"-এর দিকে চলেছি। যদিও সারা পৃথিবীতে পার্টি ডিকটেটরশিপ অচল হয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। গর্বাচেভ হ্যাজ আশার্ড ইন আ নিউ এরা। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো এক এক করে শেকল খুলে ফেলছে। আমরাই কী তবে খালি একটা পুরনো টেক্সট বই, পুরনো মডেল আঁকড়ে থাকব?'

'উত্তরে গৌতম বলল, 'কোথাও পার্টি ডিকটেটরশিপ অচল হয়ে যাচ্ছে না কমরেড। কোনও না কোনও ফর্মে, মানুষ ঠিকই গোষ্ঠীভুক্ত, দলভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এতদিন তার পেছনে একটা যাই হোক আদর্শবাদ ছিল, এখন প্রত্যেক দল, প্রত্যেক গোষ্ঠী খোলাখুলি নিজের নিজের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার তাগিদে কাজ করবে। আমাদের মতো ইল্লিটারেট থার্ড ওয়ার্ল্ড কানট্রিতে ডেমোক্র্যাসি চলে? চলে না।'

মিঠু আর গৌতমের প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক লেগে গেল। গৌতম যত বেশি কাগজ পড়ে, রাজনৈতিক খবরাখবর রাখে, মিঠু ততটা রাখে না। ওদিকে মিঠু আবার কিছুটা তত্ত্ব এবং সাহিত্য পড়েছে গৌতমের ততটা পড়া নেই। মিঠু বলে পার্টি-ইজম বাদ দিয়ে কি ডেমোক্র্যাসি হয় না? মানব সেবা বাদী বিশ্বসংঘের কথাও বলে সে। গৌতম বলে ওসব স্বপ্নের প্রাসাদ। রিয়্যালিটি হল, হয় মাল্টিপার্টি ডেমোক্র্যাসি, নয়তো পার্টি ডিকটেটরশিপ। গৌতমের গলা খুব চড়েছিল, মিঠুর অত গলার জোর নেই, তার প্রায় নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। ইমন কোথায় ছিল, দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

'মিঠু, আজ আমার হোস্টেলে যাবে বলেছিল না?'

গৌতম বলল, 'তাই যা বাবা, তাই যা। ওফ্ এমনি এঁড়ে তক্ক করতে পারে না এই মেয়েগুলো, জানবে না শুনবে না, কেঁদে জিতবে।'

মিঠু বলল, 'ভালো হবে না গৌতম, কথায় কথায় মেয়ে-মেয়ে করে খোঁচা দিবি না। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে মেয়েরাই নেতা হবে তা জানিস? বেশি কথা কী, ক্লাস-রিপ্রেজেনটেটিভ দাঁড় করানোর জন্যে পর্যন্ত তো ওই মেয়েদের কাছেই ছুটেছিস তোরা... তার বেলা?'

'সেটা তো স্রেফ স্ট্র্যাটেজি... তোরা মেজরিটি তাই। যেমন বড়বাজারে মাড়োয়ারি দাঁড় করানো হয়, রাজাবাজারে মুসলমান... তেমনি।' এই সময়ে অনু চুপিচুপি গৌতমকে কী একটা ইশারা করল, কিছু বললও।

গৌতম বলল, 'তো কী! আমি তো খারাপ কিছু বলি নি! এই মিঠু, রাজাবাজারে... মুসলমান বলে আমি তোকে কিছু আঘাত দিয়েছি? আমি অবশ্য জানতুম না তুই... কিছু না-ই বা জানলুম... কী এসে যায় এখনকার দিনে আর এইসব ধর্মে-টর্মে!'

মিঠু ভীষণ রেগে গিয়েছিল। তার মুখে কথা জোগাচ্ছিল না। ইমন তাকে জোর করে টেনে বার করে নিয়ে এলো। বাইরে এসে মিঠু সত্যি-সত্যি কেঁদে ফেলল। ইমন বলল, 'চলো চলো অনেক ডিবেট হয়েছে, এবার মুখটা ধুয়ে নেবে চলো। তাহলেই রাগও ধুয়ে

যাবে।'

বেলা শেষ হয়ে এসেছে। উজ্জয়িনীকে কোথাও দেখতে পেল না মিঠু। বলল, 'ইমন, আজ তোর হোস্টেলে গেলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে যে! বরং তুই আমাদের বাড়ি চ। মা বাবাকে কত বলেছি তোর কথা, খুব খুশি হবে সবাই।'

ইমন বলল, 'হোস্টেলে তো এরকম নিয়ম নেই।'

'চল না। মেট্রনকে বলি গিয়ে। যদি পার্মিশন দেন!'

ইমনের ভীষণ লোভ হচ্ছে। কতদিন যেন সে পারিবারিক স্নেহ আদর পায়নি। উপবাসী সে। এই অদ্ভুত গোলমেলে শহরটার মধ্যে এখন তার অনেক পরিচিতি। কিন্তু সবই খেলার সূত্রে। কলেজেও যারা যেচে এসে আলাপ করে ওই জন্যেই করে। ইমন জানে চ্যাম্পিয়নশিপ তাকে একটা গ্ল্যামার দিয়েছে, সে সেটা উপভোগ করে। নিজের এই প্রতিমা সে ভাঙতে চায় না। কিন্তু প্রতিমার আড়ালে সে বন্ধু খোঁজে। সত্যিকারের বন্ধু। মিঠু কি বন্ধু হবে?

এত কৃত্রিম এই শহরের মেয়েরা! এত কাঁচা বে-আব্রু এই শহরের ছেলেরা! কার সঙ্গে মিশবে সে! এরা মিশ্র ভাষায় কথা বলে। আগে ছিল ইংরিজিয়ানা। এখন আচার-আচরণে হিন্দিয়ানা ঢুকেছে খুব। নাকে-নাকে নাকছাবি। হাতে হাতে মেহেদির কারুকার্য, পায়ে পায়েল। সব মিলিয়ে কেমন যেন! সে সহজ হতে পারে না। কাউকে সেটা বুঝতেও দেয় না। এমন নয় যে সে হিন্দিভাষীদের অপছন্দ করে। কিন্তু বাঙালি মেয়ে যখন হিন্দিভাষীদের অনুকরণ করে তার মনে হয় এরা ঠিক করছে না। সে দূরে দূরে থাকে। দূরত্ব রেখে চলাটা তার খ্যাতির সঙ্গে মানিয়ে যায়। কিন্তু সে যে তার অনাথা মাকে ছেড়ে, পিতৃহীন ছোট ভাইটিকে ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে এসেছে! তার বুকের মধ্যে অনেকগুলো খালি জায়গা খাঁ খাঁ করে। মিঠু কি তার একটাও ভরতে পারবে? মিঠুদের বাড়ি... সে কী রকম? —চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবার মতো নাকি? মিঠুর মা কি খুব আধুনিকা? লিপস্টিক মাখা, চুল-ছাঁটা মা? মিঠুর বাবা? অ্যাসোসিয়েশনের ওইসব ভদ্রলোকদের মতো? যাঁদের বাবার বয়সী হওয়া সত্ত্বেও দাদাই বলতে হয়; বাবার মতো কিছুতেই নন যাঁরা।

মিঠু বলল, 'কী ভাবছিস এত!'

ইমন হাসল। সে যে ভাবছিল তা অস্বীকার করল না। আবার সরাসরি স্বীকারও করল না।

পেভমেন্টের ওপর দিয়ে হোস্টেলে যাবার পথটা এই পড়ন্ত বেলায় কী সুন্দর, শান্ত, বড্ড যেন মন-কেমন-করা। এই পথটাই যেন এঁকে বেঁকে চলে গেছে সারা জীবন বেয়ে। এটাই পৌঁছেছে তাদের বাড়ি। এটাই চলে গেছে সেই অদূর অতীতের দিনগুলোতে যখন বাবাতে ইমনেতে দালানের মাঝখানে নারকোল দড়ি টাঙিয়ে পিংপং খেলা জমে উঠত। মা গেলাস ভর্তি চা নিয়ে এসে দাঁড়াত আঁচলে জড়িয়ে, ভাই বল ধরবার জন্য হাত বাড়াত। সাড়ে তিনজন মানুষ বসে হুশহাশ শব্দ করতে করতে গরম খিচুড়ি খাওয়া হত শীতের দুপুরে।

হোস্টেলের গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে মিঠু বলল, 'তুই কি করে একা একা থাকিস রে ইমন! ভয় করে না?'

'ভয়?' ইমন হাসল। মনে মনে বলল—ভয় করলে তার চলবে না। আরও অনেক অনুভূতির মতো ভয়টাও তার পক্ষে বিলাসিতা। 'আমার ঘরে তো আরও একজন থাকে,

অজন্তা।' সে মিঠুকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

'ওরে বাবা, মা বাবাকে, বিশেষ করে মাকে ছেড়ে থাকবার কথা তো আমি ভাবতেই পারি না।'

'যাকে থাকতেই হয়, তাকে থাকতে হয়', উদাস গলায় বলল ইমন। চট করে ওর মুখের দিকে তাকাল মিঠু। নাঃ, ইমনের মুখে এখনও শান্ত সুদূর হাসি। ইমন কি আর আমাদের মতো' ? ও অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। কত সাহসী, আত্মবিশ্বাসী। সেন্টিমেন্টাল নয় একদম। ইমন কাঁদে না, মন খারাপ করে না। একমনে নিজের কাজ করে যায়। ওর সংকল্পের জোরই আলাদা। কী স্মার্ট ইমন, কোনও পরিস্থিতিতেই বোকা বনবার নয়। উজ্জয়িনী অত ব্রাইট, রাজেশ্বরীর অত ব্যক্তিত্ব, কিন্তু ওদের চেয়েও স্মার্ট ইমন। কত ভাগ্য যে ইমনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। কে জানে ইমন শেষ পর্যন্ত বন্ধু থাকবে কি না !

হালকা হলুদ বর্ডার দেওয়া সবুজাভ বাড়িটা। দুয়ারের কাছাকাছি পেভমেন্টের ওপর একটা কাঠবাদামের গাছ। বারান্দায় একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। মিঠু ওপর দিকে মুখ তুলে হাসল। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে পাথরের ফলকে পড়ল ইমন—'সাদেক চৌধুরী, অনুরাধা চৌধুরী'। সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে উঠে গোল দালান। পেছন দিকে জাফরি কাটা। মিঠুর মা দাঁড়িয়ে আছেন। হালকা হলুদ রঙের শাড়িতে কালো বুটি, কালো পাড়। মাথার চুলে একটা আলগা খোঁপা বাঁধা। দু চার গাছা সাদা চুল। চোখে চশমা। 'ইমন, না' ?

'হ্যাঁ মা, নিয়ে এলাম। ভালো করিনি ?'

'বেশ করেছিস। দেখেছ ইমন তোমার কথা শুনে শুনে তুমি কি রকম আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে ?'

ইমন নিচু হয়ে হঠাৎ প্রণাম করল। মিঠুর মা অবাক হয়ে বললেন 'ওমা, তুমি প্রণাম করতে জানো ? আমার ছেলেমেয়ে তো কক্ষনো আমাকে প্রণাম করে না।'

মিঠু বলল, 'আহা, জন্মদিনে করি না ?'

ইমন হাসল। মিঠুর মা মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'এসো, ঘরে এসো।'

মিঠু বলল, 'মা, আজ কিন্তু ইমন আমাদের বাড়ি থাকবে।'

'নিশ্চয়ই, এখন এত সন্ধেয় আবার সেই নর্থে ফিরতে পারে না কী ? হোস্টেলে বলে এসেছ তো ?'

মিঠু বলল, 'ইমনের যা প্রেসটিজ ! একবার বলতেই মেট্রন হ্যাঁ করে দিলেন। সুপারকেও উনিই বলে দেবেন। মা, আজকে কিন্তু ইমনকে বিরিয়ানি খাওয়াতে হবে !'

'দেখি পারি কি না !' মিঠুর মা হাসিমুখে বললেন, 'এখন তো তোরা হাত মুখ ধো !'

ইমন যত বলে আমি এইভাবেই থাকব। মিঠু ততই জোর করে।

'না তোকে আমার জিনিস পরতে হবে। চান করে আবার কেউ ছাড়া জামা কাপড় পরতে পারে না কি ? ঘেন্না করবে না ? এত যদি সঙ্কোচ করিস তবে আর বন্ধু কী ?' অগত্যা ভালো করে চান করে, ইমন মিঠুর ফুলছাপ লম্বা স্কার্ট আর লাল টপ পরে বাইরে আসে, আর মিঠু তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে থাকে। 'ইস্‌স্‌ ইমন। আমার ড্রেস তোকে কি সুন্দর ফিট করেছে। ফ্রি সাইজ হলে কী হয়, সবাইকে কিন্তু ফিট করে না। কী সুন্দর মেয়ে মেয়ে দেখাচ্ছে তোকে ! বাচ্চা মেয়ের মতো !'

হাতে কফির মগ নিয়ে বারান্দার জাফরিতে পা রেখে মিঠু বলল, 'দেখ ইমন,

উজ্জয়িনীকে আমাদের বলতে হবে নাম উইথড্র করে নিতে। আমরা সবাই এক স্কুলে পড়েছি। একজন তো হারবেই। কী বাজে হবে বল তো সেটা! তা ছাড়া আমরা! আমাদের তো দুজনেই বন্ধু। আমরা কাকে দেব? তুই কিছু বলছিস না যে?'

ইমন মন দিয়ে রাস্তা দেখছে। সে বলল, 'আমি এ সব ঠিক বুঝি না মিঠু। তবে মনে হয় যে কোনও প্রতিযোগিতাই খেলার মেজাজে নেওয়া উচিত।'

'তুই বুঝছিস না এটা ঠিক খেলার মতো নয়। আমরা একজনকে আমাদের প্রতিনিধি বলে বেছে নেব। দুজনেই আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনেরই যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। উজ্জয়িনী বরাবর আমাদের হাউজ-ক্যাপটেন ছিল স্কুলে। আর রাজেশ্বরী ভীষণ ভালো ডিবেট করতে পারে, বক্তৃতা করতে পারে, মেয়েও খুব ভালো। অনেস্ট। জাস্ট। আমাদের ডিলেমাটা বুঝতে পারছিস না?'

'আমি তো তোমাদের স্কুলের নই! যে বেশি যোগ্য তারই নির্বাচিত হওয়া উচিত। তবে তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি এর মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সঙ্কটের ব্যাপার আছে।'

'সবচেয়ে ভালো কী হত জানিস তো! যদি দুজনে উইথড্র করে নিত নাম আর সবাই মিলে তোকে পাঠাত।'

'না না, আমার অনেক কাজ মিঠু। এই কথাটা কারুর মাথায় ঢুকিও না প্লিজ।'

'জানি। সেইজন্যেই বলছি না। কিন্তু এ সঙ্কট থেকে কী করে উদ্ধার পাই বল তো?'

'সব সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়া বোধ হয় যায় না মিঠু। ছোট ছোট সঙ্কটগুলো দেখতে হয় নিস্পৃহভাবে। প্রার্থনা করা যাক বড় বড় সঙ্কটগুলো থেকে যেন আমরা উদ্ধার পাই।'

মিঠু অবাক হয়ে বলল, 'তুই এসবই ভাবিস, না রে? তুই আসলে জীবনটাকে অন্যভাবে দেখিস। আমাদের সঙ্গে তোর দেখাটা মেলে না।'

ইমন বলতে গেল, 'জীবন যে এক এক পাত্রে একেক রকম মিঠু।' কিন্তু বলল না। নিজেকে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। সে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো খুব সাবধানে আড়াল করে রাখে। নইলে তার পরিবারের কথা এসে পড়বে। তার দৃষ্টিতে তার মা বাবা ভাই যা, অন্যের দৃষ্টিতে তো তা নয়!

কিন্তু মিঠু একটু পরে বলল, 'ভাবিসনি আমার কোনও সঙ্কট নেই। জানিস তো আমার বাবা মুসলিম, মা হিন্দু। আমি কী রে? আমার ধর্ম কী? পরীক্ষা-টরীক্ষার ফর্মে লিখতে হয়—ইসলাম। কেননা বাবার পরিচয়েই ছেলেমেয়েদের পরিচয় হবার প্রথা। কিন্তু আমার বাবা কোনও ধর্ম মানে না। একদম শতকরা একশ ভাগ সেকুলার। আর আমার মা সব ধর্ম মানে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি এই যে অযোধ্যা নিয়ে এত কাণ্ড হচ্ছে, যদি হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধে তো কে আমাকে মারবে? আমি কার শত্রু!'

ইমন বলল, 'কেউ তোমাকে মারবে না মিঠু।'

'কিন্তু আমি কোথায় বিলঙ করি আমায় তো জানতে হবে! বাবা-মার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। মা ধর্ম পাল্টায়নি। আমার বড় দাদা মারা যাবার পর মা ভীষণ ভিতু হয়ে গেছে। এমন কি কালীমন্দিরে মানত করে। জন্মদিনে আমাদের মাথায় পুজোর ফুল ঠেকায়। আমি বাবাকে বলি—বাবা তুমি কী ঠেকাবে ঠেকাও। বাবা বলে "আমার কিচ্ছু নেই। খালি কোনক্রমে আমার আমিত্বটুকু এখনও বজায় আছে।" এইসব আমার সঙ্কট ইমন। এই সঙ্কটে আমায় পড়তে হত না, যদি ফর্মে রিলিজন ব্যাপারটা না থাকত। মুসলিম মেয়েদের ডিভোর্সের আইন চালু হল না বলে বাবা রাত্রে খেল না। সকালে উঠে

আমার মাথায় হাত রেখে বলল—ভাগ্যিস আমার মেয়েটা মুসলিম নয়, আমি তখন পুঁচকে, বললাম—তাহলে আমি কি ? হিন্দু ? তাতেও বাবা বলল—ভাগ্যিস আমার মেয়েটা হিন্দু নয় ! আচ্ছা তুই-ই বল, 'বাবা না হয় একটা নতুন ধরনের হেঁয়ালি উদ্ভাবন করে মজা পেল । হয়ত বাবা অনেক কিছু পেছনে ফেলে এসেছে । কিন্তু আমার পক্ষেও এ হেঁয়ালি হজম করা সম্ভব ? আমি কী ? আমি কী ?'

ইমন মন দিয়ে শুনছিল, বলল, 'তোমাকে কিছু হতেই হবে, তার কী মানে আছে ? ধর্ম একটা চাই-ই ?'

'বাঃ, সবার আছে, আমার না থাকলে, আমার কেমন খালি খালি লাগবে না ?'

ইমন হেসে ফেলল । বলল, 'এক হিসেবে তুমি কিন্তু খুব ভাগ্যবান মিঠু । তোমার কোনও সংস্কার নেই, অন্তত থাকার কথা নয় ।'

মিঠু বলল, 'সত্যিই নেই । কিন্তু খুব সংকটের সময় আমাকেও তো কারো কাছে প্রার্থনা জানাতে হয় ! ইমন আমি মনে মনে গড বলি, গডের কাছে যা বলবার বলি । তাহলে দেখ একটা না একটা খুঁটি তো আমার ধরতেই হল ! জানিস, আইরিশ কবি ইয়েটস ধর্মের অভাব পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন দেশের উপকথা পুরাণ দিয়ে, শেষ পর্যন্ত অকাল্টিজম-এ চলে গেলেন ।'

'তুমি দুর্গা পুজো, সরস্বতী পুজো এসব সময়ে কী করো ?'

'নতুন জামা-কাপড় পরে ঠাকুর দেখতে যাই । আমার বাবা তো মূর্তি গড়েন । অর্ডারি পান প্রত্যেকবার নিউ ইয়র্ক থেকে ।'

'ঈদের সময়ে ?'

'ঈদের সময়েও নতুন জামাকাপড় পেতাম । কিন্তু কেউ তো বাড়িতে রোজাও করে না । ঈদের চাঁদ দেখার জন্যে ব্যস্তও হয় না । অঞ্জলি দেওয়া, নামাজ করা কিচ্ছু নেই । নতুন জামাকাপড় পরে একটা মজা হত । এখন আর হয় না । আমার বাবার বন্ধুরা কেউ ঈদ মুবারক বললে আমার ভালো লাগে । আমিও বলি ঈদ মুবারক ।

'মাসী কী করেন ?'

'মা-ও প্রকাশ্যে কিচ্ছু করে না । পুজো-টুজো, অঞ্জলি দেওয়া, উপোস, বার-ব্রত ।'

ইমন বলল, 'এসব আজকাল কেউই করে না মিঠু, উচ্চশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এসব উঠে গেছে ।' মনে-মনে সে বলল, 'আমার মা অবশ্য করে, আমি বারণ করি শোনে না ।'

মিঠু বলল, 'কিন্তু মা ওই সব মানত-টানত করে, পুজো পাঠায় । কেমন একটা জগা-খিচুড়ি ।'

ওদের দুই বন্ধুকে আগে খেতে ডাকলেন মিঠুর মা । আজকে ইমনের সম্মানে তিনি চমৎকার একটা বিদেশি ডিনার সেট বার করেছেন । বললেন, 'বিরিয়ানির সময় করতে পারিনি । চটজলদি একটা পোলাও করেছি মিঠু । সামান্য একটু মাংসের কুচি আছে, মাছও দিয়েছি । দ্যাখ ইমনের ভালো লাগে কি না ।' তিনি পাশে দাঁড়িয়ে ইমনকে চাটনি, রায়তা, মাংস, মাছ, ভাজা তুলে তুলে দিতে লাগলেন ।

অতি সুন্দর সুগন্ধ পোলাও ইমন মুখের মধ্যে খুব সাবধানে রাখল, মনে মনে বলল, 'বাবুয়া খা, বাবুয়া দিদি দিচ্ছে খা ।' মাছের চপ ভেঙে মুখে দিতে দিতে মাকে স্মরণ করল যেমন লোকে ঠাকুরকে স্মরণ করে 'খাও মা খাও, আমার মুখ, আমার জিভ, আমার দাঁত দিয়ে খাও মা, যত দিন না নিজের হাতে দিতে পারছি ।'

যখন সে কোথাও খেলতে গিয়ে খায়, এত খিদে থাকে, এত অপরিচিত মানুষ থাকে

চারদিকে, আর আবহাওয়াটাও এমন পেশাদারি থাকে যে এসব কথা তার মনে আসে না। কিন্তু এখন সুন্দর আলোর নিচে, চমৎকার টেবিল-ঢাকার ওপর, ফুলকাটা কাচের বাসনে ঘরোয়া পরিবেশে সুখাদ্য খাবার সময়ে বাবুয়া আর মার কথা মনে করে হঠাৎ তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে।

'ইমন, ভাল হয়েছে রান্না?' কাঁধের ওপর আলতো হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন অনুরাধা। ইমন বলল, 'খুব ভালো।' সে একটুও মাথা নাড়ল না। যেটুকু বাষ্প আছে চোখে, আগে শুকিয়ে যাক।

ওদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময়ে মিঠুর বাবা আর দাদা এসে বসলেন ইমনের অনুমতি নিয়ে। ইমন চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল নীল ট্রাউজার্স আর কোরা রঙের বুশ শার্ট পরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট একজন ভদ্রলোক। মুখ পরিষ্কার কামানো। চুল প্রায় অর্ধেক সাদা। ভারি স্নেহভরা দু চোখে চেয়ে বললেন, 'এই ইমন! এ কি এত রোগা কেন তুমি ইমন। খাও, খুব ভালো করে খাও। আজকাল মেয়েরা বড্ড ফিগার-কনশাস হয়ে যাচ্ছে। মিঠুটা তো আলু, ভাত এসব খেতেই চায় না। তবে মিষ্টি আর আইসক্রিমে পুষিয়ে নেয়, তাই না রে মিঠু?'

মিঠুর দাদাকে ঠিক মিঠুর মতো দেখতে, সে বলল, 'না বাবা, মোটা হলে ও খেলবে কী করে? এখন খেলা প্রচণ্ড ফাস্ট। বিদ্যুতের মতো ঘোরাফেরা করতে হয়। ইমন তুমি আমার বাবার মতে মোটেই চলো না।'

মাসি বললেন, 'আচ্ছা, এখন তো ওকে খেতে দাও তোমরা। এই সময়ে আবার খাওয়ার তত্ত্ব আরম্ভ করলে।'

ইমন হাসি-হাসি চোখে একবার মেসোমশাই আর একবার দাদার দিকে তাকাতে থাকল, হঠাৎ যেন একটা বহু পরিচিত গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। একটা চেনা প্রিয় গন্ধ। সেটা তার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা মিঠুর মায়ের শরীর থেকে আসছে। না উল্টো-দিকে-বসা সাদেক চৌধুরীর দিক থেকে বইছে সে ভালো বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ পর যখন মিঠু ঘরে গিয়ে নীল ডায়মন্ড চালিয়ে দিল, আর রেমব্রান্টের ছবির অ্যালবাম দেখতে দিল তাকে, তখন কানে সুর চোখে ছবি নিয়ে মনে মনে সে বলতে লাগল বাবা! বাবা!

কত ভাগ্য মিঠুর বাবা রয়েছেন। কিছু নয় শুধু থাকাটা জরুরি। মিঠু জানে বাবাদের চারপাশ থেকে একটা আভা বেরোয়। সেই আভা ছেলেমেয়েদের ছেয়ে থাকে। সে হঠাৎ বলল, 'মিঠু, আমাদের ওদিকটায় অনেক মুসলিম আছেন। আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম। কিন্তু মেসোমশাইয়ের মতো এরকম পুরোপুরি ধর্মের উর্ধ্বে আমি কাউকে দেখিনি। এটা লাক। খুবই গুড লাক তোমার।'

মিঠু নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমার মা-বাবাকে তোর খুব ভালো লেগেছে, না?'

ইমন বলল, 'হ্যাঁ, দাদাকেও।'

'বারে, আর আমাকে?' মিঠু আবদেরে ভঙ্গিতে ইমনের গলা জড়িয়ে ধরল। এরকম করে তার গলা জড়ায় একমাত্র বাবুয়া, তার ভাই।

ইমন হেসে বলল, 'তুমি? বাঃ তুমি তো আগে!'

মিঠুর পাশে শুয়ে শুয়ে তার ঘুম এলো চমৎকার। যদিও একদম আলাদা জায়গা, আলাদা পরিবেশ। মিঠু সকাল বেলায় উঠে দেখল ইমন পাশে নেই, দালানে বসে সে জুতোর ফিতে বাঁধছে। খুব ভোর, বাইরে অল্প কুয়াশা জড়িয়ে রয়েছে শহরের বাড়িঘর

গাছপালার গায়ে। মা এক গ্লাস গরম দুধ এনে রাখল।

মিঠুর শীত করছে, সে বেড-কভারটাই গায়ে জড়িয়ে ঘুম চোখে উঠে এসেছে, সে ঘুমে ধরা-ধরা গলায় বলল, 'এ কী রে ?'

'এবার যাই। একটু ছুটতে হবে।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বেল্টটা ঠিকঠাক করে নিল ইমন। মুখে মায়াময় হাসি লেগে আছে।

'আবার আসবে ইমন। নিজের বাড়ি মনে করে আসবে, হ্যাঁ ?' মৃদুস্বরে বললেন অনুরাধা।

'ইস ইমন তুই কী পাজি ! এক্ষুনি চুপিচুপি পালিয়ে যাচ্ছিলি !'

'পালাচ্ছি না। হোস্টেলে ঠিক সময়ে ফিরছি শুধু। আবার আসব।'

ইমন মিছে কথা বলে না। ইমন আশ্বাসের হাসি হাসছে। একটা জার্কিন গায়ে চড়িয়ে ইমন বেরিয়ে যাচ্ছে।

৭

'এতক্ষণ আমাতে অমিতেতে আড্ডা মারছিলাম...

বাবা-মার ঘরটাতে ঢুকল ঋতু। দুদিকে দুটো খাট। মাঝখানে পর পর দুটো আলমারি। বারান্দার দিকের দরজার পাশে ড্রেসিং টেব্‌ল। এখন একদম ফাঁকা। বাবাদের যাওয়া পেছোতে পেছোতে জানুয়ারি হয়ে গেল। মিসেস মীনাক্ষী দাশ রকমারি প্রসাধন-দ্রব্য তাঁর কসমেটিক্‌স্ বক্সে পুরে নিয়ে গেছেন। প্যারিসের রাস্তায় রূপসী যুবতী সেজে বেড়াবেন। ঋতু নিজেই গুছিয়ে দিয়েছে সুটকেসটা। গাঢ় অরেঞ্জ, বেগনি সব শাড়িগুলো জোর করে দিয়ে দিয়েছে সে। মা খুব আপত্তি করছিল।

ঋতু বলেছিল, 'এই লাস্ট চান্স মাম্মি পরে নাও।' অরেঞ্জ শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং পলার সেট, বেগনি কাঞ্জিভরমের সঙ্গে আলেকজান্ডার স্টোন, সব মিলিয়ে মিলিয়ে দিয়েছে। খালি লালটা মা কিছুতেই নিতে রাজি হল না। বয়স্ক মহিলারা যখন চড়া রঙের শাড়ি পরে, রঙচঙ মেখে, রাজ্যের গয়নাগাঁটি পরে ঘোরে তখন ঋতুর ভীষণ হাসি পায়। অনেকে আবার ব্লাশার মাখে। আই শ্যাডো ব্যবহার করে দিনের বেলাতেও। ঋতুর মা মোটামুটি ভালোই দেখতে, খুব কিছু মোটা হয়ে যায়নি, চুলও আছে বেশ, সামান্যই পেকেছে, অনেকেই বলে সোমার দিদির মতো লাগে দেখতে। এটা নিয়ে মার একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে বুঝতে পারে ঋতু। ভাগ্যিস ঋতুকে কেউ মায়ের বোন বলে না। তাহলে তার সঙ্গে তার এক হাত হয়ে যেত। মায়ের সাজ দেখতে হয় বাবার সঙ্গে কোথাও বেরোলে। সোমার সঙ্গে বেরোলে খুব হালকা সাজবে। সাদার ওপর বুটির টাঙ্গাইল পরবে, গাদোয়াল পরবে, সোমা যদি বলে, 'মা পরো না পিঙ্ক শাড়িটা,' মা বলবে 'দূর, তোর মা না !' ঋতুর সঙ্গে বেরোলে আর একটু চড়ে মায়ের সাজ। কিন্তু বাবার সঙ্গে বেরোলে সাজের কী ধূম ! অত রঙ লাগালে, কড়া লিপস্টিক মাখলে আরও বুড়োটে দেখায় মা জানে না। ঋতু এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা আপাদমস্তক দেখল। জিভ বার করে, ঘাড় ঘুরিয়ে, দাঁত বার করে হেসে, ভ্রূকুটি করে, নানা ভাবে। ঋতুর চেহারার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য যে তাকে ভীষণ বাচ্চা-বাচ্চা দেখতে। একরাশ বাদামি

ল। সোজা কানের পাশ দিয়ে পিঠের ওপর, বুকেব ওপর নেমে এসেছে। মসৃণ গমের তো রঙ। বড় বড় বিস্ফারিত চোখ। ঠোঁট দুটো ফোলা-ফোলা, যে কোনও মুহূর্তেই াবদারে ফুলতে পারে। সোমা খুব লেডি-লাইক। তার পাশে ঋতু যেন খুকি। ায়নাটাকে জিভ ভেংচে, ঋতু বিছানার ওপর ধপাস করে বসে পড়ল।

'বাসন্তী, বাসন্তী, শিগগিরই এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও।'

বাসন্তী ঋতুর ছোট্ট থেকে আছে। এক রকম মানুষই করেছে তাকে। কিন্তু ঋতু তাকে াসন্তীই বলে। সে বাবা-মা ছাড়া আর সকল'কেই প্রায় নাম ধরে ডাকে। দিদিকে সোমা. দিদির বরকে অমিত, বাবাকেও মাঝে মাঝে আদর করে নাম ধরে। সে বলে, 'নামটাই তো পরিচয়। তা ছাড়া বাসন্তী ইজ দাসী। হাজার মাসি-পিসি ডাকলেও সে দাসীই থাকবে, ওসব ডাক এক ধরনের ভণ্ডামি।'

বাসন্তী জল এনে দাঁড়াল। এক হাতে জল খেতে খেতে অন্য হাত তুলে বাসন্তীকে দাঁড়াতে বলল ঋতু। তারপর গ্লাসটা ড্রেসিং টেব্‌লের ওপর রেখে খাটের কোনায় হাত দিল। বলল, 'হাত লাগাও তো, খাটদুটোকে জুড়তে হবে।' মাঝখানের কার্পেটটাকে সে আগেই গুটিয়ে রেখেছে।

বাসন্তী বলল, 'কেন ?'

'যা বলছি করো। কেন আবার কী ? সোমারা আসবে না ? এখানে থাকবে না ?'

চটপট খাট জোড়া হয়ে গেল। আলমারি থেকে তোয়ালে, নতুন সাবান বার করে বাথরুমে রেখে আসা হল। বসবার ঘর থেকে বাবার ছোট্ট লেখার টেবিলটা আর দুটো চেয়ার সে শোবার ঘরের অন্য কোণে আলোর ঠিক তলায় রেখে দিল। এয়ারপোর্ট থেকে ফেরবার পথে অনেক ফল কিনে এনেছিল, সেগুলো ভালো করে মুছে ফ্রিজের মাথায় রেখে দিল। একগুচ্ছ লাল গোলাপ রাখল শোবার ঘরে টেবিলটার ওপর। এরপর একটু দূর থেকে সবটা দেখে বেশ পরিতুষ্ট মুখে নিজের ঘরে ঢুকে, দু ঘরের যোগাযোগের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সোমারা না এলেই সে খুশি হত। কিন্তু জানা কথাই, বাবা-মা তাকে এতদিন বাসন্তীর ভরসায় একা রাখবে না। যাই হোক, সোমারা থাকলেও, সে-ই বাড়ির কর্ত্রী। এই সব চাবি, বাসন্তীকে ফরমাশ করে সংসার চালাবার অধিকার তার। সে হাতে করে চাবির থলোটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

বাসন্তী ঘরে ঢুকে বলল, 'ওরা কখন আসবে ?'

'অমিত য়্যুনিভার্সিটি থেকে সোজা আসবে। ওর জন্যে ভালো কিছু টিফিন করো। সোমার বোধ হয় আরো দেরি হবে। এয়ার-পোর্ট থেকে সোজা জোকায় চলে গেল। সেখান থেকে বাড়ি ফিরবে, গোছগাছ করবে, তারপর আসবে। কী বানাচ্ছ রাত্রের ন্য ?'

'মাটন রান্না করা আছে। রুটি হবে।'

'মাটন আবার কী ? মাটনের প্রিপারেশনটা কী বলো ?'

'মাটন মানে মাটন, যেভাবে রাঁধি রেঁধেছি। অতশত জানি না।'

'জানো না বললেই পারতে, আমি বই দেখে দেখে বলে দিতাম। আর কিচ্ছু করো । !'

'সোমা আসুক, জিজ্ঞেস করে নেবো।'

'কেন ? সোমা কেন ? আমি কি নেই ? এটা এখন আমার বাড়ি। আমি যা বলব তাই

করতে হবে। যাও বেগুন-ভাজা করো গিয়ে। পুডিং বানাও। কাশ্মিরী আলুর দ
বানাও।'

'কী মুশকিল, বেগুন না হয় খাবার সময়ে ভেজে দেব। আলু সোমা খেতে চায় না। পুডিং না হয় করছি। যদিও দুধ বেশি নেই, কনডেন্সড় মিল্ক ঢালতে হবে, আগে থেকে বলে দিচ্ছি।'

'হোক। আর সোমা তো একা খাবে না। অমিত কাশ্মিরী আলুর দম খেতে ভালবাসে। আমিও বাসি। স্যালাড কেটেছ?'

'ক-খন। ফ্রিজে ঢোকানো আছে।'

অমিত কিন্তু আগে এলো না। ওরা দুজনে একসঙ্গে পেল্লাই একটা সুটকেস নিয়ে নামল, রাত নটা। বাসন্তী খুলে দিল। তার মুখে খুশির হাসি।

'ঋতু কোথায়? ঋতু?' সোমা ঢুকেই জিজ্ঞেস করল।

'মাথা ধরেছে। শুয়ে আছে।'

'মাথা ধরেছে? কেন?' সোমার ভুরু কুঁচকে উঠেছে।

'তোমাদের জন্যে বাড়ি কত গুছোলো... রান্না-টান্না...' বাসন্তী ঢোঁক গিলল।

'ঋতু রান্না করেছে?'

'তা নয়। বলল আমাকে কী কী করতে হবে, ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।'

অমিত সুটকেসটা লিভিংরুমের একধারে রেখে ডাকতে লাগল, 'ঋতু, ঋতু উঠে পড়ো।' ডাকতে ডাকতে সে ঋতুর ঘরের সামনে চলে গেল, 'আসব?'

'এসো।' ঋতুর ধরা-ধরা গলা শোনা গেল।

'কী হল? উঠে পড়ো! খুব মনমেজাজ খারাপ নাকি মা-বাবার জন্য?'

অমিত ঋতুর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। ঋতু আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়ে একটা হা তুলল মুখে হাত চাপা দিয়ে, 'এক্সকিউজ মি।' তারপর অমিতের শার্টের বোতামে হা রেখে আদুরে গলায় বলল, 'হোয়াই কুড নট্ ইউ কাম আর্লিয়ার অমিত?'

'আরে বাড়ি ঠিকঠাক বন্ধ করতে হবে! নিশ্ছিদ্রভাবে তালা-ফালা দিতে হবে। ঢাউস সুটকেস তার পর, সোমা একা পারে না কি?'

'ইউ প্রমিজড়! আমি তোমার জন্যে চিকেন ওমলেট বানাতে বলে দিয়েছিলাম। তু ভালোবাসো বলে।'

'তো কী আছে? আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না! প্রত্যেক সন্ধ্যায় আমি য়ুনিভার্সি থেকে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে ফিরব, তখন দেখি তুমি কত খাওয়াতে পার। বোর হয়ে যা বলে দিলুম।'

সোমা ও-ঘর থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, 'অমিত চান করতে যাও। আমি গিজার চালি দিয়েছি ন'টা বেজে গেছে।' তারপর তোয়ালে হাতে ঋতুর ঘরে এসে বলল, 'খ টেবিলটা ঘরে এনে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছিস রে! গোলাপগুলো একেবারে টাটকা অমিত, তুমি ও বাথরুমে যাও, আমি ঋতুরটাতে যাই বরং। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

খাবার টেবিলে বসে সোমা বলল, 'অ্যাত্তো কি সব রাঁধিয়েছিস রে?'

'তোমার পছন্দ না হয় খেও না।'

'উঃ, আমি কি তাই বলেছি? আমার এমন রাক্ষসের মতো খিদে পায়! সমস্ত খাব। ইস্‌স্ মাটনটা কী ভালো হয়েছে!'

অমিত বললে, 'এ বাড়িতে এলে ঠিকঠাক জমিয়ে খাওয়া যায়। তোমার তো খা

য়লড় আর স্টু।'

'সেইজন্যেই অম্বলে না ভুগে সুস্থ শরীরে খাটতে পার। বুঝলে? একদিন দুদিন মুখ লাবার জন্যে এরকম ঠিক আছে। তাই বলে রোজ না। ঋতু তুই আজকাল রোজই কম খাস না কি রে?'

বাসন্তী বলল, 'ওর তো খেয়ালের ওপর। খাওয়ার দশ মিনিট আগে হয়ত ল—ঢাকাই পরোটা করে দাও।'

'তাই দাও?'

'না করে উপায়?' বাসন্তী যেন এক দিনেই ঋতুর অভিভাবিকা হয়ে উঠেছে।

'ঋতু অত ভাজাভুজি, মশলা খেও না সত্যি! অমিত বলল।

'আমি তোমাদের মতো ডেস্ক্ ওয়ার্ক করি না বসে বসে। রীতিমতো লম্ফ-ঝপ করতে, বুঝলে? ওসব ফ্যাট-ট্যাট, মশলা-টশলা সব কোথায় তলিয়ে যায়।'

সোমা বলল, 'তা অবশ্য। নাচে প্রচণ্ড খাটুনি। কিন্তু একটু আলগা দিলেই মোটা হয়ে ব। ও কি হাত গুটিয়ে আছিস যে?'

'খাওয়া হয়ে গেছে।'

'হয়ে গেল? এরই মধ্যে? পুডিংটা খাবি না?'

'নাঃ, আমি উঠছি, ডোন্ট মাইন্ড।' ঋতু উঠে চলে গেল, ঘরের দরজা বন্ধ করবার শব্দ া।

অমিত বলল, 'কিছু হল যেন মনে হচ্ছে?'

'রাগ হয়ে গেল বোধ হয়', সোমা স্যালাড নিতে নিতে বলল।

'রাগ? কেন?'

'ঋতুর রাগ-অনুরাগের কোনও কেন নেই অমিত। ওর মন নামে জটিল যন্ত্রটির কোন ধায়, কখন তার ঢিলে হয়ে যায় আমরা কেউ জানি না।'

'ডেকে আনব? কিছুই তো খেল না!'

'খবর্দার, অমন কাজটিও করো না। ও তো তাই-ই চায়। দরজায় ঘা দেব। দুজনেই ওয়া ফেলে ঋতু-ঋতু বলে ছোটাছুটি করব। অ্যান্ড শী'ল থ্রো ওয়ান অফ হার ফেমাস ন্ট্রাম্স!'

'তাই বলে খাবে না?'

'খেয়েছে তো! ও ওইরকমই খায়। বারে বারে খায়। রাত্তির তেরোটার সময়ে হয়ত জ থেকে পুডিং বার করে খেয়ে নেবে। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না তো!'

কিন্তু ঋতু বেশ ভালো হয়েই তো থাকছে। সকালে সর্বপ্রথম বেরোয় সোমা। মিতের একটু বেলায় ক্লাস থাকে। ইউনিভার্সিটিও খুব কাছে। ঋতু প্রায়ই গোড়ার কের ক্লাসগুলোয় যায় না তাই এগারোটা, সাড়ে এগারোটা, কোন কোন দিন বারোটায় নে খেতে বসে। অমিতের দুদিন যেতে হয় না। সে দুটো দিন, নিজের ব্যক্তিগত ড়াশোনা, পেপার টাইপ, লাইব্রেরি এ সব থাকে তার। ঋতুও প্রায়ই এই দিনগুলোতে ড়িমসি করে কলেজ যায় না। বলে, 'ধুর। ভাল্লাগছে না, এই অমিত রাখো তো তোমার লিশের মতো বইগুলো, এসো গল্প করি।'

কত যে গল্প ঋতুর! তার নাচ-ক্লাসের মাস্টার মশাইয়ের প্রতিভার গল্প। মেয়েদের ধ্যে, ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পলিটিক্স্। অমিত যখন জার্মানিতে ছিল তখনকার ল্প। খালি সোমার সঙ্গে অমিতের প্রেমের গল্পটা সে কখনোই শুনতে চায় না।

উজ্জয়িনী আর মিঠু এলো একদিন।

'কিরে ঋতু, কলেজ যাসনি কেন ?'

'এই তো পরশুই গেছি ! আবার কী ! ভারি তো কলেজ !'

'তাই বলে দিনের পর দিন ফাঁকি দিবি ? তারপর নন-কলেজিয়েট হয়ে গেলে ?

'আহা, ক জন প্রোফেসর রোলকল করতে পারেন রে ! অনার্স ক্লাসেই তো সাতচল্লিশ জন স্টুডেন্ট। সব ফুটকি দেওয়া থাকে আমি দেখেছি। পরীক্ষার সময়ে একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে দেব। বি কে সি-কে বলব, অনার্সের 'পি'গুলো দিয়ে দিতে।' গলা তুলে সে বাসন্তীকে ডাকতে লাগল, 'বাসন্তী ! বাসন্তী ! আমার বন্ধুরা এসেছে কফি করো, কফি উইথ ক্রীম, এই চিকেন রোল খাবি ?'

উজ্জয়িনী বলল, 'তুই ব্যস্ত হোস না তো ! এখন আর বাসন্তীদিকে কোথাও পাঠাতে হবে না।'

'পাঠাব না তো ! এভরিথিং ইজ রেডি। জাস্ট ভাজবে আর দেবে।'

'তুই খুব গিন্নি হয়েছিস তো !'

'হয়েছিই তো। জানিস না মা আর বাপী ফ্রান্স গেছে। আমিই তো এখন সব দেখছি।'

'সে কি রে ? তুই একা রয়েছিস ?'

'সোমা-অমিত আছে ! এতক্ষণ আমাতে অমিতেতে আড্ডা মারছিলাম তো !'

'অমিত কে রে ? সোমাদির বর ?'

'আবার কে ? এই অমিত এদিকে এসো শিগগির।'

বারান্দার দিকের দরজা দিয়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা অমিত ঢুকলো। ঋতু বলল 'ইজন্‌ট্ হি হ্যান্ডসাম ?'

মিঠু-উজ্জয়িনী জবাব না দিয়ে অমিতের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করল। অমিত বলল 'হাই !'

চিকেন রোল আর কফি খেতে খেতে শিগগিরই চারজনে খুব আড্ডা জমে গেল। মিঠু বলল, 'আপনার রোজ রোজ বেরোতে হয় না, কী মজা, না অমিতদা ?'

'আরে ! কে বললে যেতে হয় না। ক্লাস ছাড়াও অনেক কাজ থাকে। তো এই আহ্লাদি শ্যালিকাকে আগলাচ্ছি। মা বাবা নেই, মন-মেজাজ খারাপ। ঋতু তোমার বন্ধুরা এসে গেছে। আমি একটু বেরোচ্ছি।'

'কেন ?'

'দরকার আছে।'

'কী দরকার ?'

'আরে ! আছে।'

'দেরি করবে না, তাড়াতাড়ি ফিরবে।' ঘড়ি দেখে বলল, 'উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার।'

'অত তাড়াতাড়ি হবে না। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে ফিরব।' অমিত চট করে পোশাক বদলে বেরিয়ে গেল।

উজ্জয়িনী বলল, ঋতু, কলেজ ইলেকশন-এ আমি এবার ক্লাস-রিপ্রেজেন্টেটিভ দাঁড়িয়েছি। আমাকে ভোটটা দিবি তো ?'

'তুই দাঁড়িয়েছিস ? তুই ? অফ কোর্স দেব। আর কেউ দাঁড়িয়েছে না কি রে ?'

'হ্যাঁ, দেখ না রাজেশ্বরীও দাঁড়িয়েছে।'

'সে কী ? তোদের দুজনের মধ্যে আবার ভোটাভুটি কী ?'

মিঠু তাড়াতাড়ি বলল, 'দেখ না, এটাই উজ্জয়িনীকে বোঝাতে পারছি না কিছুতেই। রাজেশ্বরীর নামটা আগে পড়েছে। ও দাঁড়িয়ে গেছে, উজ্জয়িনীর আবার দাঁড়াবার দরকার কি ছিল, বল তো !'

মাথায় একটা ঝটকা দিয়ে উজ্জয়িনী বলল, 'তো দিস নি ! বারবার এক কথা বলছিস কেন ? দিস ইজ ইনসাল্টিং। আমাকে ডেকে দাঁড়াতে বলে ওরা হঠাৎ রাজেশ্বরীকে দাঁড় করালো কেন ? আমার একটা প্রেসটিজ নেই ? এটা আমার চ্যালেঞ্জ। রাজেশ্বরীকে আমি হারাব, এমন করে হারাব যে ওই সুকান্তদা, শৈলেশদা বুঝতে পারবে। এটা আমার চ্যালেঞ্জ জেনে রাখিস। আর তোরা তো রাজেশ্বরীকেও উইথড্র করতে বলতে পারতিস ! আমার কাছেই খালি ঘ্যানঘ্যান করছিস কেন ? বল ঋতু !'

ঋতু মজা পেয়ে বলল, 'তোরা খুব একসাইটেড মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা নিয়ে। সত্যিই তো মিঠু তোরা রাজেশ্বরীকে বলছিস না কেন ?'

মিঠু বলল, 'আসলে রাজেশ্বরীর নামটাই তো প্রথমে পড়েছে। ওকে নাম উঠিয়ে নিতে বলার কোনও মর‍্যাল রাইট আমাদের নেই। তবে, উজ্জয়িনী যদি এত ইয়ে করে, তো রাজেশ্বরীকেও বলতে হবে।'

ঋতু বলল, 'এখখুনি বল। দাঁড়া ফোনে ডাকি ওকে।'

মিঠু বলল, 'অত তাড়া করছিস কেন ? মুখোমুখি না হলে এ সব হয় ?'

'উঁহুঃ, ফোন ইজ বেস্ট।' বলে ঋতু চট করে ডায়াল ঘোরালো।

'রাজেশ্বরী আছে ? হ্যাঁ আমি ঋতু বলছি রে। এই ফিরলি ? হ্যাঁ ? হ্যাঁ। আমার বাপী-মা নেই তো তাই !' রিসিভারের ওপর হাত চাপা দিয়ে উত্তেজিতভাবে ফিস-ফিস করে ঋতু বলল, 'আমার কাছে ভোট চাইছে ! এই শোন রাজেশ্বরী, শুনলাম উজ্জয়িনীও দাঁড়িয়েছে ! তুই উইথড্র করে নে নামটা। দুই বন্ধুতে···কী ? না কেউ বলেনি বলতে। আমারই মনে হল।···বল !' আবার রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে ঋতু বলল, 'ও-ও একই কথা বলছে। বলছে ও আগে দাঁড়িয়েছে। উজ্জয়িনীকে নাম তুলে নিতে বল।' রিসিভারের দিকে ফিরে ঋতু বলল, 'কোত্থেকে জানলাম ? যেটুকু গেছি তাইতেই কানে এসেছে। আচ্ছা রাখি ! রাখছি রে !' ফোন রেখে হাসিতে ফেটে পড়ল ঋতু।

ঋতু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোরা দুজনেই খুব ওয়ারিড না ? এত গোঁ কেন রে তোদের ? এক জন নামটা তুলে নিলেই তো ফুরিয়ে যায়।'

'ঠিক আছে। দিস নি আমাকে ভোটটা। আমি চলি', উজ্জয়িনী উঠে দাঁড়াল।

'ইস ? এত সহজে রেগে যাস কেন রে ? ভোটটা তোকেই দোব। হল তো ?'

'ঠি-ক !'

'ঠিক ! কী আশ্চর্য তোর সঙ্গে কত দিনের বন্ধুত্ব !'

উজ্জয়িনী বলল, 'থ্যাংকিউ।' মিঠুও উঠে পড়ল। কিন্তু তার মুখে স্পষ্ট অশান্তির ছাপ। উজ্জয়িনী আড়চোখে সে দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিঠু তুই রাজেশ্বরীকেই দিস। তোর থেকে আমি ভোট চাইছি না। তোকে আমার সঙ্গে আসতেও হবে না। কী জানি ! তোকে যদি আবার ইনফ্লুয়েন্স করি ! আমার কী মর‍্যাল রাইট আছে বল !'

মিঠু কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, 'কী হচ্ছে উজ্জয়িনী ! আমি একবারও বলেছি তোকে দেব না !'

উজ্জয়িনী ক্রুদ্ধ মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই তো ঋতু কত সহজে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। মানছি তোদের পক্ষে অস্বস্তিকর হচ্ছে ব্যাপারটা। কিন্তু আমারও তো একটা প্রেসটিজ আছে। তা ছাড়া কোথায় আমি, কোথায় রাজেশ্বরী ! রাজেশ্বরী তো এসেছে মোটে এইচ.এস-এ। আর আমার সঙ্গে পড়ছিস্ নার্সারি থেকে। তোদের মনে এত দ্বিধা আসে কোত্থেকে ? আমি সব বুঝি মিঠু। তোর আমাকে ভালো লাগে না আর। আমি খেয়ালি, আমি তোকে ঠেলে দিতে পারি জলে। তো ঠিক আছে, রাজেশ্বরীকে ভালো লাগে। তাকে বেশি ডিপেন্ডেব্‌ল্ মনে হলে তার কাছে যা। আমি তো তোকে বেঁধে রাখি নি ! যেখানে খুশি, যার কাছে খুশি যানা !'

মিঠুর চোখের কোল ভরে উঠছে। সেদিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে উজ্জয়িনী বলল, 'ক্রাই বেবি !' সে বেরিয়ে গেল।

মিঠুকে ঋতু টেনে বসিয়ে রাখল। মিঠু রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে। ধরা গলায় বলল, 'সত্যি রে ঋতু, আমি একটা অপদার্থ, চরিত্রের কোনও জোর নেই, কিছুই পারি না। কিচ্ছু না !'

ঋতু বলল, 'দূর। ছাড় তো ! উজ্জয়িনীটা চিরকাল একটা বুলি। সেলফিশ। নিজেরটা ছাড়া কারুরটা দেখতে পায় না। আমি ওকে কথা দিয়েছি যখন ওকেই দেব। তুই রাজেশ্বরীকে দে। ও তো তোকে অনুমতি দিয়েই দিয়েছে !'

'তা হয় না ঋতু। উজ্জয়িনী দাঁড়ালে ওকে আমার দিতেই হবে। তাই বলে ওর ভুলটা আমি দেখিয়ে দেব না ? আমি যাই রে !'

'যাবি ? যা তা হলে। শুধু শুধু মন-খারাপ করিস না।'

৮

'আসল কথা না জেনেই এরকম করছিস...'

উজ্জয়িনী বাড়ি পৌঁছতে ওদের যে রান্না করে সেই যমুনাদি বলল, 'জুনিদিদি মা তো আজও খেল না সকালে। কয়েক কাপ চা খেয়ে আছে খালি। এমনি করলে যে একটা অসুখ করে যাবে !'

মা-বাবাকে নিয়ে উজ্জয়িনী পড়েছে মহা মুশকিলে। দুজনের মধ্যে কথা-বার্তা নেই। প্রায় এক বছর হতে চলল। সে মাঝখানে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। বাবা ডক্টর রজত মিত্র, প্রচণ্ড রুক্ষ ভাষী, মেজাজী। বদরাগী। মা অমিতা মিত্র অনেকগুলো মেয়েদের সংস্থা চালান। কোথাও সেক্রেটারি, কোথাও প্রেসিডেন্ট। মার অভিমান, আত্মমর্যাদাজ্ঞান খুব বেশি। মা-বাবার মধ্যে শীতল যুদ্ধ চলছে অনেক দিন। যখন সে খুব ছোট ছিল, মনে পড়ে মা-বাবার হাত ধরে বেড়াতে যেত হংকং, সিঙ্গাপুর, ইয়োরোপ। সে-সব দিনগুলো কী সুন্দর ছিল। হাত ভরে যেত উপহারে। গাল ভরে যেত চুমোয়। মার কোলে, বাবার কোলে। সাত-আট বছর বয়স পর্যন্ত সে কোলে চড়েছে বাবার। এখনকার বাবাকে সে চিনতে পারে না।

সাড়ে ছটা প্রায়। সে মায়ের ঘরে ঢুকে ডাকল, 'মা'।

মা বলল, 'আজ এত দেরি করলি ?'

'ঋতুদের বাড়ি হয়ে এলাম, দরকার ছিল।'

'কী খাবি ?'
'আমি খেয়ে এসেছি। এখন তুমি কী খাবে বলো ?'
'আমি আবার এখন...'
'মা, এরকম যদি করো, আমি কিন্তু কোথাও চলে যাব।'
'চলে যাবার ব্যবস্থাই তো হচ্ছে।'
'মানে ?'
'তোমার বাবা তোমাকে স্টেটসে পড়তে পাঠাবেন।'
'আমার তো এখনও পার্ট ওয়ানই হল না।'
'তা জানি না, তুমি টোয়েফ্‌ল আর স্যাটে বসেছিলে, ভালো করেছ, কোন কোন য়ুনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে, সেইসব বলছিলেন।'
'তাই কি তুমি খাওনি ?' উজ্জয়িনী মৃদু স্বরে বলল, 'মা, চলো না তুমি আমি দুজনেই চলে যাই। ওখানে আমরা বেশ থাকব দুজনে। কোনও ঝামেলা থাকবে না।'
তিক্ত হাসি হেসে অমিতা বললেন, 'আমার কাছ থেকে দূরে রাখবার জন্যেই তো এত ব্যবস্থা! আমার যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না!'
'তোমার কাছ থেকে দূরে ? আমি থাকতেই পারব না! আমি বাবাকে বলব মা ? বলি, হ্যাঁ ? যে আমরা দুজনে...'
'খবর্দার জুনি। বলো না। হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। ওঁর ধারণা হয়েছে তোমার ওপর আমার প্রভাবটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। সে জন্যেই এ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এখন যদি তুমি আমাকে পাঠাবার কথা বলো তো ওঁর আরও জেদ চেপে যাবে।'
উজ্জয়িনীর ঘরে একটা বেল বাজল। এখান থেকে শোনা যায়। এটা বাজছে বাবার চেম্বার থেকে। উজ্জয়িনীর একদম যাবার ইচ্ছে নেই। সে বাবাকে, বাবার চেম্বারের ওই অংশটাকে একদম পছন্দ করে না। এই মাল্টি স্টোরিড বাড়িটাতে তাদের দুটো ফ্ল্যাট। আট তলায় একটা আর দোতলায় একটা। দোতলার ফ্ল্যাটটা বাবার চেম্বার, রোগীদের ওয়েটিং রুম, খাবার, রেস্ট রুম, কিচেন, টয়লেট সবই আছে। বেশির ভাগ সময়েই বাবা ওখানেই কাটান। দুপুরের খাবার ওখানে দিয়ে আসতে হয়। রাতটা ওপরে এসে খান। নিজের আলাদা ঘরে শোন। গত কয়েক মাস ধরে নিচেই শুচ্ছেন। সে অত্যন্ত অনিচ্ছুক পায়ে বেরিয়ে গেল, ইচ্ছে করে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল, যাতে দেরি হয়। পাশের দরজা দিয়ে, বাবার রেস্ট রুম দিয়ে সে চেম্বারে ঢুকল। পেছন থেকে দেখতে পেল বাবাকে। গাঢ় ব্রাউন রঙের সুট পরা। মাথার পেছন দিকটা পুরো টাক। টাকটার পর্যন্ত গোলাপি রং। ইস, সেই মহিলা ঘরে ঢুকছে। দেখে আপাদমস্তক জ্বলে গেল উজ্জয়িনীর। কী নির্লজ্জ, কী বেহায়া। এই বদমাস মহিলার জন্য তার মায়ের যত কষ্ট, যত অপমান! খুব নাকি সুদক্ষ ও. টি. নার্স। বাবার চেম্বারেও গত কয়েক বছর ধরে সন্ধে বেলায় ডিউটি দেয়। মানে চাকরি করে। একজন নাম্বার ওয়ান ও. টি. নার্স ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বারে রোগী পরীক্ষায় সাহায্য করবার কাজ নিয়েছে! উজ্জয়িনীকে দেখে এক মুখ হেসে আবার বলছে, 'কী জুনি! কেমন আছ!' বিরস মুখে উজ্জয়িনী বলল, 'ভালো।' ফিরে 'আপনি কেমন আছেন'টা সে বলল না। কেমন আছে দেখাই তো যাচ্ছে। গালে লালচে আভা। একটা দামী সিল্কের শাড়ি পরেছে। আজকে নার্সের পোশাকে নেই। কী মতলব, কে জানে!
বাবা চেয়ারটা ঘুরিয়ে উজ্জয়িনীর মুখোমুখি হল, বলল, 'আমি কদিনের জন্যে শিলিগুড়ি

যাচ্ছি। খুব জরুরি কেস আছে। কবে ফিরব বলতে পারছি না।' বাবা পকেট থেকে একটা চেক-বই বার করে দুটো তিনটে ফাঁকা চেক খস খস করে সই করে দিল তলায়। বলল, 'এটা রাখো।' তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফিরে আসি তোমার স্টেটস যাবার ব্যবস্থা সব পাকা করে ফেলব তারপর! এখানে কী হবে? কিস্যু হবে না।' ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো শীলা, চলো।' মসমস করে বেরিয়ে গেল বাবা, পেছন-পেছন সেই মহিলা—শীলা না অনুশীলা। হাতে আবার পাতলা একটা লাগেজ। উজ্জয়িনী তাড়াতাড়ি বারান্দায় ছুটে গেল। একটু পরেই সাদা অ্যামবাসাডর গাড়িটায় বাবা উঠল, পাশে উঠে বসল শীলা। মদন গাড়ির বুটে দুটো সুটকেস তুলে দিল। তারপর গাড়িটা দ্রুত বেরিয়ে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল সাদা বিন্দুটার দিকে তাকিয়ে রইল উজ্জয়িনী। তারপর লিফটে চড়ে ওপরে চলো এলো।

সাড়ে আটটা নাগাদ উজ্জয়িনী বলল, 'মা বড্ড খিদে পেয়েছে। দেবে?' মা সেন্টারের কি সব মিলোনোর কাজ করছিল। বলল, 'চল দিচ্ছি।'

'দুজনে এক সঙ্গে বসব কিন্তু।'

'ঠিক আছে।'

আস্তে আস্তে বসে বসে গল্প করতে করতে মাকে খাওয়ালো উজ্জয়িনী। সারা দিনের পর এই রাত সাড়ে আটটায় বোধ হয় কিছু পড়ল তাঁর পেটে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অমিতা বললেন, 'যমুনা, সাহেবের খাবারটা রেডি করো, সময় হয়ে আসছে।'

ন'টার সময়ে ডক্টর মিত্র খান দুখানা আটার রুটি, এক বাটি চিকেন স্টু, একটু স্যালাড। এক গ্লাস দুধ খাবেন আরও রাতে, শোবার সময়ে।

উজ্জয়িনী বলল, 'মা, বাবা জরুরি কল-এ শিলিগুড়ি চলে গেল।'

'কখন?' অমিতা ভুরু কুঁচকে বললেন।

'এই তো, যখন আমায় ডাকল।'

'সে তো অনেকক্ষণ। এতক্ষণ বলিসনি!' অমিতা ফেলে ছড়িয়ে খেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর মায়ের খাওয়া মোটামুটি শেষ বুঝতে পেরে উজ্জয়িনী বলল, 'ওই মহিলা সঙ্গে গেল, অপারেশন আছে বোধ হয়।'

সতর্ক হয়ে বসলেন অমিতা, 'কে? শীলা ভার্গব? শিলিগুড়ি গেল?'

গ্লাসের জলটা শেষ করে, অমিতা উঠে পড়লেন। নিজের ঘরে গিয়ে একটা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন। একটু পরেই আবার উঠে পড়লেন। উজ্জয়িনী নিজের ঘর থেকে মায়ের চলা-ফেরা দেখতে পাচ্ছে। মা পায়চারি করছে, হাত মুঠো করল, রাগে মুখ থমথম করছে, তার পরেই মুখ কালো হয়ে গেল, মা আলো নিবিয়ে দিল, চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে দিয়েছে, চোখের ওপর হাত চাপা।

এই প্রথম উজ্জয়িনী এমনি সময়ে মার ঘরে ঢুকতে সাহস করল, ডাকল 'মা।' চমকে চোখের ওপর থেকে হাত সরালেন অমিতা।

'দিনের পর দিন এভাবে...কী লাভ?'

'তুই গান-টান শুনগে যা জুনি!'

'গান-টান শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখবার দিন আমার চলে গেছে মা!' তার গলার স্বর রূঢ়।

অমিতা আবার চমকে উঠলেন, বললেন, 'কী বলবি, বল?'

'তুমি সহ্য করছ কেন এ সব? আজ শীলা, কাল শর্বরী। পরশু রোজি। তোমরা মনে করো খুব স্থূলভাবে কিছু চোখের ওপর না দেখলে আমি বুঝতে পারব না? আমি

এখন বড় হয়েছি, বন্ধু-বান্ধবের একটা সার্কল আছে আমার। আমি আর কতদিন এভাবে মরমে মরে থাকব ? তোমরা একটা কিছু স্থির করো ! কিছু একটা করো মা ! সকলে জানে। তুমি মনে করো কেউ কারো খবর রাখে না ? আমার পরিচয় পেলেই লোকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকায় তা জানো ? আমি আর সহ্য করব না। সহ্য করতে পারছি না।

'তোর বাবা তো তোকে খুব ভালোবাসে জুনি !' একটু পরে অমিতা বললেন।

'ওকে ভালোবাসা বলে না, দিবারাত্র মেয়ের চোখের সামনে মাকে অপমান করে, "জুনি আমি তোমাকে স্টেটস পাঠাব।" ভেংচে উঠল উজ্জয়িনী। 'নিজের ক্ষমতা দেখানো হচ্ছে ? আমার চাই না ওই বাজে লোকটার ভালোবাসা, যে তোমাকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছে, তাকে আমি বাবা বলে মানতে পারব না। বলে দিলাম এই শেষ কথা।'

শিউরে উঠে অমিতা বললেন, 'এদিকে আয় জুনি।'

মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে জুনি চেয়ারে বসা মায়ের কোলো মাথা রাখল। অমিতা তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'যতই হোক। তোর বাবা। বাবার সম্পর্কে ওভাবে বলিস নি।'

'তাহলে তুমি প্লিজ এবার ডক্টর মিত্রকে আলটিমেটাম দাও।'

'কী হবে দিয়ে ? উনি বলবেন, তোমার না পোষায় তুমি চলে যেতে পার।'

'যাব। তাই যাব মা। তুমি আর আমি চলো যাব।'

'ডিভোর্স করতে বলছিস ?'

'হ্যাঁ, তাই করবে দরকার হলে।'

'অনেকবার ভেবেছি। তোর কথা মনে করে পারি না যে জুনি।'

'আমার কথা ? এই অশান্তির চেয়ে লজ্জার চেয়ে বরং আমি অন্য যে কোনও অবস্থায় থাকতে রাজি আছি। এই লজ্জা, এই ঘেন্না নিয়ে দিনের পর দিন...'

উজ্জয়িনীর চোখ দিয়ে গরম জল পড়তে লাগল।

অমিতা বললেন, 'তুই চিরদিন খুব আদরে মানুষ জুনি। পারবি না। বলা সোজা, কিন্তু কষ্ট সহ্য করা ভীষণ শক্ত কাজ, পারবি না।'

'কী বলছ মা ! আমি এত মীন যে তোমার এত অপমানের পরও স্রেফ বিলাসের লোভে এই ঘৃণ্য বাড়িতে ওই ঘৃণ্য ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকব ? আমাকে তুমি এত ছোট মনে করো ?'

'তুই আমাকে খুব ভালোবাসিস না রে ?' অমিতা ভিজে-ভিজে গলায় বললেন।

উজ্জয়িনী জবাবে মায়ের হাঁটু দুটো আরো জোরে চেপে ধরল, সজল গলায় বলল, 'তোমাকে ভালোবাসায় আমার তো কোনও বাহাদুরি নেই মা। মাকে সবাই ভালোবাসে। কিন্তু তুমি তো কবে থেকেই আমার মা-বাবা সবই। তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে আমার মন হয় তাকে...তাকে.. তা ছাড়া ওই ভদ্রলোককে আমার আজকাল বাবা বলে মনেও হয়

'জুনি, তোর বাবাকে ডিভোর্স করা আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়।'

'কেন ? ঠিক আছে এবার বাবা ফিরলে আমি, আমিই যা বলার বলব, আই'ল হ্যাভ এ ।-ডাউন উইথ হিম।'

'না না', ভীষণ ব্যস্ত হয়ে অমিতা বললেন, 'অমন কাজও করিস নি, মাথা গরম করিস । সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'কিসের সর্বনাশ ! একজন চরিত্রহীন লোককে বাবা বলে পরিচয় দেবার চেয়েও

সর্বনাশ ! মা তোমাকে আমি এই কদিন ভাববার সময় দিলাম। এর মধ্যে তুমি যা হয় ঠিক করো।'

'ওরে না না, এসব বলিস নি, জুনি এসব বলিস নি।' অমিতা আকুলভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন।

'তাহলে, তুমি কি এখনও, এসব সত্ত্বেও বাবাকে ভালোবাসো ? বলো ! জবাব দাও !'

অমিতা মাথা নাড়তে থাকেন।

'তাহলে এই সুখ, ঐশ্বর্য, বিলাস, স্ট্যাটাস এই সবের জন্যে ছাড়তে পারছ না ? বুঝেছি।'

'কিছুই বুঝিস নি। শোন জুনি, তোর একটা ভালো দেখে বিয়ে হয়ে যাক। তারপর, তার-পর আমি তোর বাবাকে ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাব। ডিভোর্স-টিভোর্স কিচ্ছু লাগবে না। স্রেফ এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। আমার যা গয়নাগাঁটি আর নিজস্ব টাকা আছে তাতে আমার কোনক্রমে চলে যাবে। জুনি ভালো পাত্র দেখা আছে আমার, দেখলেই তোর পছন্দ হবে। তুই বাবাকে বলবি তোর পছন্দের কথা, উনি এটাতে আপত্তি করবেন না, তারপর...'

'কী বাজে কথা বলছ ? মোটেই আমি এখন বিয়ে করতে রাজি নই মা ! তোমাদের দেখে দেখে বিয়েতেই আমার ঘেন্না ধরে গেছে।'

'তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব ছেলেটির, শুভংকর, তোর বড় মেসোর বন্ধুর ছেলে, দেখেছিস না দেবারতির বিয়েতে !'

ভুরু কুঁচকে উজ্জয়িনী বলল, 'তুমি কি ভাবছ, ডিভোর্স করলে বা ওই রকম কিছু করলে আমার বিয়ের অসুবিধে হবে ? সে রকম ছেলেকে আমি বিয়েই করব না জেনে রাখো সেটা।'

'আমার বড্ড মাথা ধরেছে জুনি, আমায় একটু চোখ বুজোতে দে এবার। সামনে ক্যাশ মিলিয়েছি আর ক্যাশমেমো কেটেছি সকাল থেকে। একটু বিশ্রাম দরকার।'

'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি এখন, কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব না দিলে ভালো হবে না।' উজ্জয়িনী চলে গেল নিজের ঘরে। সামনে একটা আমজাদ আলির ক্যাসেট পেলো, সেটাই চড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর একটা বিশ্রী আওয়াজ পেয়ে অমিতা মেয়ের ঘরে ছুটে এলেন। উজ্জয়িনী ক্যাসেটটাকে বার করে প্রচণ্ড জোরে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সে আরও ক্যাসেট বার করছে, সেগুলো দুমড়ে ভেতরে থেকে টেপগুলো বার করবার চেষ্টা করছে। তার মুখ-চোখ রাগে, চোখের জলে মাখামাখি। সে একটা বহু মূল্যবান পাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি তুলে ধরতে যাচ্ছিল, অমিতা তাড়াতাড়ি এসে তার হাত ধরলেন, 'ছাড় জুনি, ছাড় বলছি ! উজ্জয়িনী হাত তুলে নিল মূর্তিটা থেকে, তারপর ক্ষিপ্ত গলায় বলল 'সব ভেঙে চুরে ফেলব, যা যা দিয়ে এতদিন এই নরকটা সাজিয়েছ, সব, স-ব চুরমার করে ফেলব, ফেলে যে দিকে দু চোখ যায় চলো যাব।'

অমিতার চোখদুটো ভয়ে বড় বড় হয়ে উঠেছে, তিনি বললেন, 'আসল কথা না জেনে এরকম করছিস ? জানলে তাহলে কী করবি ? ওঃ ভগবান, কী বিপদেই পড়লুম।'

হঠাৎ উজ্জয়িনী শান্ত হয়ে গেল। বলল, 'কী আসল কথা মা ? বলো না. আমি বড় হয়ে গেছি, এত বড় মেয়ের কাছ থেকে কিছু লুকোনো যায় না। আমি অন্যত্র জেনে নেবই। তখন তোমার মুখ কোথায় থাকবে ?'

অমিতা তার চোখের জলে ভেজা লালচে মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'তুই যে আগে তোর বাবার মেয়ে। তোর বাবা দয়া করে আমার হাতে তুলে দিয়েছে তাই আমার হয়েছিস মা।'

অমিতার চোখ ছলছল করছে, ঘরে ঘড়ির বাজনা শুরু হল। সাড়ে ন'টা বাজছে। অমিতা বললেন, 'তুই একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নার্সের মেয়ে। তোর জন্মের সময়ে সে মেয়েটি মারা যায়। রাঁচির ভেতর দিকে একটা মিশনারি হাসপাতালে ডেলিভারি হয়েছিল। ওরাই তোকে রাখতে চেয়েছিল। আমি নিঃসন্তান। স্বামী থেকেও নেই। তোকে আমি চেয়ে নিই। সবাই জানে তুই আমারই মেয়ে, তোকে নিয়ে পুরো এক বছর আমি ওই মিশনারি প্রতিষ্ঠানে কাটাই। আত্মীয়রা জানত আমি স্বামীর ওপর রাগ করে চলে গেছি, তারপর—বাচ্চা হবে বুঝতে পেরে আবার ফিরে এসেছি। তোর বাবা আর আমি ছাড়া এ কথা আর কেউ জানে না। রাগারাগি করে যদি আমরা পরস্পরকে ছাড়ি, তুই যদি আমার কাছে থাকতে চাস, তোর বাবা সেটা হতে দেবে না। তোর আসল জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করে দেবে।'

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল উজ্জয়িনী। তার দেহ কি রকম অসাড় হয়ে যাচ্ছে। চোখ ঝাপসা। পায়ের তলায় মাটি দুলছে। অমিতা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তোর পাঁচ দিন বয়স থেকে তোকে বুকে করে বড় করেছি। আমি নিজেই ভুলে গেছি তুই আমার কোলে জন্মাসনি। আমিই তোর সত্যি মা। তুই ছাড়া পৃথিবীতে আমার কেউই নেই। চলছি যে এতদিন ধরে, কাজ করছি, সংসার করছি, সামাজিকতা করছি, সবই তোর জোরে। তুই না থাকলে আমিও নেই। আজ এইভাবে তোর বাবা এক দিক থেকে তুই আরেক দিক থেকে আমাকে বড্ড কোণঠাসা করলি, নইলে কোনও দরকার ছিল না তোর জানবার। তোর বার্থ সার্টিফিকেট পর্যন্ত আমার নামে। তোর বাবা নিজে ডেলিভারি করিয়েছে বাড়িতে এই মর্মে করিয়ে নিয়েছিল, সেটা তো তোর ফাইলে দেখেছিস.....'

উজ্জয়িনীর চোখের সামনেটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এই মা সাদা খোলের টাঙাইল শাড়ি পরা মাথার খোঁপা ভেঙে পড়েছে, মার চুলগুলো ডান দিকের খানিকটা সাদা হয়ে গেছে। কপালে ছোট লাল টিপ। অনেক দূর থেকে এই মূর্তিটা দেখতে পাচ্ছে উজ্জয়িনী। মা বক্তৃতা করছে, মুখ দিয়ে অনর্গল শব্দ বেরিয়ে আসছে, উদ্দীপিত হচ্ছে কত সমাজসেবী, মহিলাদের উন্নয়নের জন্য মা ভীষণ পরিশ্রম করে, অনেক পদস্থ লোক খাতির করেন মাকে। যেমন রাজ্যপাল, মন্ত্রী, এম.পি, বড় বড় ব্যবসায়ী বাড়ি, বিশেষ সম্মান দিয়ে কথা বলেন মার সঙ্গে। এই মাতৃমূর্তি উজ্জয়িনীকে গর্বে, আনন্দে, আশায়, বিশ্বাসে ভরে দেয়। এই মা তার না!

ভালো করে মার দিকে চাইল উজ্জয়িনী, অমিতা বললেন, 'এই নিয়ে তুই ব্রুড করলে আমিও আমার মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারব কি না বলতে পারছি না। সারা জীবনটা বড্ড ঝড় গেল রে জুনি, আর কি পারব...'

অমিতা কাঁদছেন না। তিনি খুব শক্ত মেয়ে। কিন্তু কান্নার জন্য শুধু চোখের জলই দরকার হয় না। উজ্জয়িনী দেখল তার মার দু চোখে অতল অন্ধকার, তিনি যেন কোথাও আর এতটুকু আলো দেখতে পাচ্ছেন না।

সে আস্তে আস্তে মার ডান হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, 'মা। আমি ব্রুড করব না।

করব না কথা দিচ্ছি তোমায়। সার্টিফিকেটে তো তোমারই নাম আছে। তাহলে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?'

'আসলটা, রাঁচির সেই হসপিট্যালের ডিসচার্জ সার্টিফিকেটটা তোর বাবা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।'

মা এখন উজ্জয়িনীর খাটে তার পাশে শুয়ে পড়েছে। উজ্জয়িনী পাশ ফিরে ডান হাত দিয়ে তার মাকে জড়িয়ে আছে। এক বালিশে দু'জনের মাথা। মায়ের দু চোখ বোজা। উজ্জয়িনী লুকিয়ে লুকিয়ে মাকে দেখছে। কী ক্লান্ত ' কী সর্বহারার মতো দেখাচ্ছে। কী দুঃখিনী এই মা তার! কত আশা নিয়ে হয়ত একদিন জীবন আরম্ভ করেছিলো, কানাঘুষায় শুনেছে বাবা মাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল, প্রচণ্ড আপত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। সেই বিবাহের এই পরিণতি! 'স্বামীর মিসট্রেস' বাংলা প্রতিশব্দটা মনে মনেও উচ্চারণ করতে পারল না সে, স্বামীর 'মিসট্রেস'-এর মেয়েকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছেন, এখন তাকেও কেড়ে নেবার পরিকল্পনা হচ্ছে। উজ্জয়িনী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—সে কখনও কাউকে বিয়ে করবে না, কোনও পুরুষকে সে ভালোবাসবে না। বাবার যে প্রিয় ছাত্রটি গত জন্মদিনে তাকে এক বাক্স ফরাসী পারফুম দিয়েছে, সে বুঝতে পারে বাবার প্রশ্রয়ে সে একটু একটু করে তার দিকে এগোচ্ছে, তাকে তো না-ই, মায়ের নির্বাচিত ওই শুভঙ্করকেও কদাপি নয়। পুরুষ জাতির প্রতি নিবিড় নির্মম ঘৃণায় তার শরীর-মনের প্রতিটি রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে গেল বুঝি বা। কেউ কেউ বলে তাকে বাবার মতো দেখতে। কিন্তু বেশির ভাগেরই মত সে নাকি বসানো অমিতা মিত্র। স্নেহ-ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে মায়ের আদলটুকুও কি অলৌকিকভাবে তার শরীরে বয়ে এসেছে? বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে ভাববার পর উজ্জয়িনী একেবারে স্থির নিশ্চিত হয়ে গেল অলৌকিক ব্যাপার পৃথিবীতে আছে। এবং সবার ওপরে ভাগ্য সত্য। অবিবাহিত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নার্সের মেয়ে, রাঁচির মিশনে আর পাঁচজন অনাথ এবং আদিবাসীর সঙ্গে মানুষ হবার কথা তার। এখন হয়ত তার জন্মদাত্রী মায়ের মতো সে নার্সিংই শিখছে, কিংবা শর্ট-হ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং। এত জ্বলজ্বলে রঙ তার, সুন্দরী বলে সবাই। সে এতদিনে আবার কোনও নারীখাদকের গর্ভে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, হত। এই অমিতা মিত্র যদি সমস্ত লজ্জা-ঘেন্না-কষ্ট চেপে তাকে বুকে করে না নিতেন। অতুল ঐশ্চর্য, বংশ পরিচয়, স্ট্যাটাস, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, সবার ওপরে এই মা, এই মহীয়সীকে মা বলে সে পেয়েছে। এত ভাগ্য কল্পনা করা যায়!

দুজনের কেউই ঘুমোচ্ছে না। দুজনে দুজনকে পৃথিবীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রিয়জন বলে অনুভব করছে। এভাবে থাকতে থাকতেই উজ্জয়িনী বুঝতে পারল—এই স্ট্যাটাস, এই নিজের হাতে গড়া সাজানো-গোছানো বাড়ি, ঘরসংসার, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এই বয়সে ছাড়তে মায়ের কী অসহ্য কষ্ট, কী লজ্জা হবে। প্রধানত তার জন্য, তাঁর মেয়ের জন্যই তিনি তাঁর শূন্যগর্ভ ঘরের চারপাশ এমনিভাবে গড়ে তুলেছেন, তারপর এক সময়ে এটাই তাঁর অভ্যাস, তাঁর জীবন হয়ে গেছে। স্টেটস যাওয়াটা সে যেমন করে হোক ঠেকিয়ে রাখবে, যেভাবে হোক, খুব সাবধানে কূট বুদ্ধি করে চলতে হবে। বুঝতে দিলে চলবে না মাকে ফেলে যেতে হবে বলেই সে যেতে চায় না। কিন্তু কী উপায়ে মাকে এই প্রতিদিনের অপমান থেকে বাঁচানো যায়, কিভাবে?'

ভাবতে ভাবতে একটা দিবাস্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়ল উজ্জয়িনী। বাবা যেন ঘুমোচ্ছে। ওই তো ওদিকের ঘরে। রাত এগারোটা কি বারোটার সময়ে। এক গ্লাস দুধ নিয়ে যাচ্ছে সে বাবার জন্যে, বাবা ওপরে শুলে সে সব সময়েই এটা নিয়ে যায়। বাবা রাত-আলোটা

জ্বেলেছে। পায়জামা পাঞ্জাবি পরেছে, রুক্ষ চোখে যতটা সম্ভব স্নেহ নিয়ে বাবা তাকাচ্ছে উজ্জয়িনীর দিকে। —'কী রকম পড়াশোনা চলছে? জুনি, তোমাকে আমি স্টেটস পাঠিয়ে দেব। এখানে কী হবে? কিস্যু হবে না।' দুধটা এগিয়ে দিচ্ছে উজ্জয়িনী, ড্রয়ার থেকে একগাদা ওষুধ বার করে খাচ্ছে বাবা, দুধের সঙ্গে, শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশের বালিশটা আস্তে আস্তে তুলে নিয়েছে সে, বাবার মুখের ওপর জোর করে চেপে ধরেছে। হাই ডোজে ঘুমের ওষুধ খায় বাবা। নেতিয়ে থাকে এখন। দুর্বলভাবে নড়াচড়া করছে। কিন্তু উজ্জয়িনীর গায়ে খুব জোর। সে প্রাণপণে বালিশটা চেপে উপুড় হয়ে আছে।

'জুনিদিদি, চা এনেছি, মুখ ধুয়ে এসো' —চমকে উঠে বসল উজ্জয়িনী। সে ঘামে ভিজে গেছে। সামনে যমুনাদি। মা ঘরে ঢুকছে। বোধ হয় মুখ-চোখে জল দিয়ে এলো। সেই কালচে ভাবটা এখনও মায়ের মুখ থেকে পুরোপুরি যায়নি। কিন্তু মুখ এখন শান্ত। কাল রাতে যে নিদারুণ মনঃকষ্ট, দ্বন্দ্ব আর দিশা হারানোর আঁচড় দেখেছিল, সেগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। মা তুমিও কি দিবাস্বপ্নে কাউকে? ..না মায়ের দিবাস্বপ্ন অন্য রকম হবে। মাকে দেখেই বুঝতে পারছে উজ্জয়িনী। পরে, অনেক পরে, যদি পরিবেশ অনুকূল বলে বুঝতে পারে, তা হলে মায়ের দিবাস্বপ্নের কথা সে জিজ্ঞেস করবে। আপাতত যে কটা দিন বাবা বাইরে থাকে, সে আর মা, তার মা, দুজনে মুক্ত।

৯

'এনলাইট্‌নড্ কো-অপারেশন... এই এখন একমাত্র পথ...

নির্বাচন নিয়ে উজ্জয়িনীর সঙ্গে মন কষাকষি হবার পর মিঠু যখন বাড়ি ফিরছিল তার মনটা কি রকম চুরমার হয়ে ভেঙে যাওয়া কাচের পেয়ালার মতো হয়ে গিয়েছিল। সে পা টেনে টেনে বাড়ি ফিরল। বুকের ভেতরের গুম গুম শব্দটা সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে। অনেক কষ্টে অনেক দিন ধরে জোড়াতালি লাগিয়ে এই বন্ধুত্ব সে টিকিয়ে রেখেছিল। আর থাকবে না। উজ্জয়িনী চিরদিনের মতো তার থেকে দূরে অনেক দূরে চলে গেল। শুধুমাত্র ভুল বুঝে। বাড়ি ফেরার সময়ে সাধারণত বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে থাকে। আজ বাবা-মা দুজনেই বসে আছে মনে হল। কিন্তু মিঠুর মনে হল কেউই নেই তার। সে দরজা খোলা পেয়ে ওপরে উঠল, মুখ-হাত ধুয়ে জামাকাপড় বদলে ঘরে আলো না জ্বালিয়ে পড়ার টেবিলে মাথা রেখে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর মায়ের গলা শোনা গেল বারান্দা থেকে, 'কি রে মিঠু। খাবি না!'

'না, ঋতুর বাড়ি অনেক খেয়েছি।'

বাবা চেঁচিয়ে ডাকল, 'মিঠুমায়ি, এখানে এসে বসো।'

মিঠু ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। বেশ প্রশস্ত ঝুল বারান্দা। মা বাবা দুটো বেতের চেয়ারে বসে আছে। বারান্দার কোণে একটা পেল্লাই টাইগার লিলি ফুটেছে। মিঠু একটা মোড়া নিয়ে গিয়ে বসেছে। মা বাবা গল্প করছে। হঠাৎ মিঠু মুখটা মায়ের কাঁধের কাছে গুঁজে দিল। মা কিছুই জিজ্ঞেস করছে না। বাবার কথা থেমে গেছে। মিঠু কাঁদছে বুঝতে পেরে অবশেষে বাবা বলল, 'কি রে মিঠু?'

'আমি খুব বাজে বাবা।'

'কে বললে ?' বাবার গলায় হাসির আভাস। মা বলল'উজ্জয়িনীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি ?'

'কী করে বুঝলে ?' এবারে মিঠু মুখ তুলল।

'সত্যি তো কী করে বুঝলে ?' —সাদেক বললেন।

অনুরাধা বললেন, 'প্রত্যেকের জীবনে একটা করে সমস্যা থাকে, উজ্জয়িনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব মিঠুর জীবনের সেই কেন্দ্রীয় সমস্যা।' শুনে সাদেক গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন।

'বাবা তুমি চুপ করো তো, তুমি কিছু বোঝ না ?' মিঠু ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'ও মা! তুমি বাবাকে হাসতে বারণ করো না।'

'কই, বাবা তো আর হাসছে না।'

'বলো না ভোটের কী করব ? উজ্জয়িনীকে তো আমায় দিতেই হবে।'

'তো দিবি, সিক্রেট ব্যালট তো।'

'না, বাবা, তুমি কিছু বোঝ না, বন্ধুদের মধ্যে ওরকম করলে ট্রেচারির মতো দেখাবে ব্যাপারটা। এমনিতেই তো উজ্জয়িনী আমায় সর্বক্ষণ ভুল বুঝছে। এর পর যদি রাজেশ্বরীও ভুল বুঝতে আরম্ভ করে...'

'তো বল মা তারা দাঁড়াই কোথা ? না কি রে মিঠু ?' বাবা হাসি হাসি মুখে বলল।

'সোজাসুজি বলবি ওকে', মা বলল।

'আমিও তাই ভাবছিলাম। সোজাসুজি ওকে বলব, ওকেও আমি খুবই যোগ্য মনে করি, কিন্তু উজ্জয়িনীর সঙ্গে ছোট্ট থেকে বন্ধুত্ব, কাজেই উজ্জয়িনীকে আমায় দিতেই হবে।'

'ঠিক।' মা বলল।

'সাদেক বললেন, 'সবচেয়ে ঠিক, অর্থাৎ ঠিকেরও ঠিক ডিসিশন হল কাউকেই ভোট না দেওয়া।'

'তা কি করে হবে বাবা। দুজনে দাঁড়িয়েছে যে।'

'উদ্দেশ্যটা কী ? ক্লাসের প্রতিনিধিত্ব ? ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধে, ইত্যাদির কথা জানাতে যাচ্ছে, এই তো ? ছাত্রদের হাতে কিছু ক্ষমতা আছে, কিছু বার্ষিক আয়-ব্যয় বরাদ্দ আছে, অ্যাকটিভিটিজ কিছু আছে সেইগুলো ঠিকঠাক চালাতে হবে, বুঝতে হবে, এই তো ? তা এর মধ্যে ভোট-টোটের কী আছে ? সবাই মিলে একজনকে মেনে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

'ঠিক বলেছ বাবা, ঠিক। আমিও ঠিক এইভাবে ভাবি। সক্কলে বলে আমি কিছু বুঝি না। আকাশে পা দিয়ে হাঁটি। পার্টি নাকি থাকবেই।'

সাদেক বললেন, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিসে ছুঁলে ছত্রিশ, আর পলিটিকসে ছুঁলে : রক্ষা নেই। ঘা গোনা যাবে না, এত।'

অনুরাধা বললেন, 'এটা কি তুমি ঠিক বললে! অনেকগুলো মানুষ যেখানে জমেছে সেখানে পছন্দ-অপছন্দের পার্থক্য তো হবেই।'

'কথাটা তো পছন্দ-অপছন্দের নয়, রাধা, যোগ্যতার। যাকে যোগ্য মনে করছ তাকে পাঠিয়ে দিলেই তো হল। এই করে করে কমপিটিটিভ মনোভাবের বিষ ছোট ছোট ইউনিটেও ঢুকে যাচ্ছে। সর্বত্র, সবার মাথার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে এ ছাড়া পথ নেই, এটা গণতন্ত্র। আসলে কিন্তু এসব গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে গোষ্ঠীতন্ত্র। গোষ্ঠীর স্বার্থতন্ত্র। একটা কলেজ। কতটুকু তার পরিধি ? কাজ কী ? না একটা পত্রিকা বার করা, একটা কি দুটো

্যানুয়্যাল ফাংশন নাবানো, আজকাল ছাত্র প্রতিনিধি কলেজের গভর্নিং বডিতে থাকছে, জেদের অভাব-অভিযোগ সরাসরি জানাবার জন্য। এর জন্যে এত ! মানুষে মানুষে ম্পর্ক খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে। দেখো দেখি আমার ছোট্ট মেয়েটা মনে কত দুঃখ পেল ? থচ সবটাই শুধু শুধু। একেবারে অনর্থক। এনলাইটনড্‌ কো-অপারেশন, এই এখন কমাত্র পথ, মিঠু বুঝলি। সহযোগিতা আর সৌহার্দ্য এ ছাড়া বাঁচবার পথ নেই মা।'

মিঠুর মনে পড়ছিল গৌতমের সঙ্গে তার তুমুল তর্কের কথা। সে তা হলে তার হজাত বোধ দিয়ে ঠিক জিনিসটাই বুঝেছে। তার মনটা আস্তে আস্তে হালকা হয়ে চ্ছে।

'বাবা একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবে না ?' মিঠু আস্তে গলায় বলল।

'মনে করব ? হায় আল্লা, তাহলে বাবা হলাম কেন ?'

মিঠু বলল, 'বাবা আমার ধর্ম কী ? আমি হিন্দু না মুসলিম ?'

'কোনটাই না হবার অতি দুর্লভ সৌভাগ্য তোর হয়েছে মিঠু। তুই পৃথিবীর সেই ল্পতম, একমুঠো মানুষের অন্যতম যাদের পেছনে ধর্মের ভূত ষাঁড়ের মতো তাড়া করছে া, যারা খোলা চোখে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে ধর্মের দিকে তাকাতে পারবে।'

'কিন্তু বাবা, আমি যে লিখি আমি মুসলিম।'

'কিন্তু তুমি জানো মিঠু, আচরণে তোমাকে আমরা হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান কিছু হতেই শখাইনি ! তোমার কোনও পূর্ব-সংস্কার থাকার কথা নয়।'

'ধর্ম কি খারাপ ?'

'শোন মিঠু, চার ধরনের মানুষ ধর্ম তৈরি করেছে, তারাই ধর্ম ভোগ করে। এক নম্বর ভতু, নার্ভের অসুখ এর, এই বিশাল জগৎ-ব্যাপারের সামনে, জীবনের জটিলতার সামনে ভয়ে জুজু হয়ে যায়। বোঝে না ভুবন বিশাল হলেও তার ওপর মোটেই ভুবনের ভার স্ত নয়। দু'নম্বর ক্ষমতালোভী, এ দেখে বেশ মজা তো, ধর্মের ভয় দেখিয়ে বা লোভ দখিয়ে অনেক মানুষের ওপর দিব্যি ছড়ি ঘোরানো যায় তো ! পাওয়াও যায় অনেক কছু ! এরা ভণ্ড, পাপিষ্ঠ, স্বার্থান্ধ, সব ধর্মের চার্চ এরা চালায়। তিন নম্বর কবি। শ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবতে ভাবতে, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য এবং রহস্য অবলোকন করতে রতে এঁরা নানান অলঙ্কারের মধ্যে দিয়ে নিজেদের বিস্ময়, আকর্ষণ, ভক্তি প্রকাশ করেন, রা কল্পনা করেন কোটি দেব-দেবী, তাঁদের নিয়ে বহু পুরাণ, এঁরা দেখেন াখা-মেলে-উড়ে আসা দেবদূত, কণ্ঠ শোনেন জিব্রাইলের, এঁরা কল্পনা করেন এক জ্যাতির্ময় শিশু কোনও পিতার সাহায্য ছাড়াই ভূমিষ্ঠ হচ্ছে এবং বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তার জা করছেন। আর চার নম্বর হলেন দার্শনিক, আইডিয়া বা ভাবের জগতের লোক এঁরা, রা কোনও না কোনও একটা তত্ত্ব দিয়ে বিশ্বরহস্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, শ্বসংসারকেই নৈতিক পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করেন। এই চারটে শ্রেণীর মধ্যে কজনের ভেতর একাধিক প্রবৃত্তি থাকতে পারে। কিন্তু ধর্মের পেছনে যে উদ্দেশ্য-শক্তি াজ করছে তাতে তুই এই চারটে ধারায় ভাগ করে ফেললে তোর বুঝতে সুবিধে হবে !

'তাহলে কি বাবা, ঈশ্বর বলে কিছু নেই !'

'এই রে ! তা তো আমি বলিনি ! কিছু একটা তো আছেই। কিন্তু তা এখনও পর্যন্ত আমাদের ধারণার বাইরেই আছে। ক্ষমতালোভীর দণ্ডচালনায় ভিতুর গলির মধ্যে ঢুকে সে স্তুর খোঁজ পাওয়া যায় না।'

'তাহলে কী বাবা, বিভিন্ন ধর্মে যে সব কথা পাওয়া যায় সেগুলো সব হয় চালাকি, নয়

ভণ্ডামি, নয় কবিতা আর তা নয়ত হাইপথেসিস ?'

'কতকটা তাই। একটা জিনিস ভেবে দেখ—সব ধর্মগুলোই তো সৃষ্টি হয়েছে অনেক দিন আগে যখন বিজ্ঞানের চোখই ফোটেনি। বিশেষ করে প্রকৃতিবিজ্ঞান। এখন এইসব ধর্ম ইতিহাসের অন্তর্গত। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় এরা। গবেষকের চোখ দিয়ে দেখতে হবে এদের। খুঁজতে খুঁজতে তোর নিজের স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে কোনও তত্ত্ব তোর ভালো লেগে যেতে পারে, তখন তার থেকে আচার-আচরণ, মোল্লা-পুরোহিত এই সমস্ত খোসার মতো ছাড়িয়ে ফেলে তুই সে তত্ত্বের চর্চা করতে পারিস, সত্য কী জানি না তবে সেই সত্যের কাছাকাছি পৌঁছনোর আনন্দটা পেতে পারিস !'

মিঠু বলল, 'বাবা আমার ভাবতে ভালো লাগে একজন আছেন, তিনি আমায় রক্ষা করবেন, আমার ডাক শুনবেন। বাবা আমি কি ভিতুর দলে ?'

'নিঃসন্দেহে মা। তুই তো একা নয়। আমাদের বেশির ভাগের মধ্যেই এই ভিতু মানুষটা কম বেশি পরিমাণে থাকে।'

অনুরাধা বললেন, 'না রে মিঠু, যদি কাউকে ডেকে ভরসা পাস নিশ্চয়ই ডাকবি, আস্তে আস্তে বুঝতে পারবি সে যে প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তায় সকল খানে !

রাতের অন্ধকারে তিনজনে বসে রইলেন আধো-অন্ধকার বারান্দায়। অনুরাধা বললেন 'একটা গান ধর না মিঠু ! তোরা বড্ড কথা বলিস। গান গা।'

'কী গাইব বলো !'

অনুরাধা নিজেই ধরলেন, 'কী আর চাহিব বলে, হে মোর প্রিয়...। মিঠু ধরে নিল দ্বিতীয় পঙক্তি থেকে 'তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।' মায়ের পরিণত গলা আর মেয়ের কাঁচা গলার ভক্তিরসে প্লাবিত হয়ে যেতে লাগল সদর্থে ধর্মহীন বাড়িটার সান্ধ্য বারান্দা।

১০

'এনভায়রনমেন্ট পাল্টাপাল্টি করে দিলে দুটো মানুষে কি সত্যি খুব তফাৎ হবে ?'

সার ব্যালট বাক্সটা উপুড় করে দিলেন, 'দেখো উজ্জয়িনী, আর নেই। আর একটাও নেই।' উজ্জয়িনীর মুখ পাংশু হয়ে গেছে। ঠিক যেন তার গালে কেউ একটা চড় মেরেছে। মিঠুর মুখেরও তাই দশা। অণুকা প্রায় ছুটে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে স্লোগান উঠছে—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ। জিতছে কে, জিতছে কে, এস এফ আই আবার কে !'

সার বললেন, 'রাজেশ্বরী আচার্য কই ? সে-ও দেখুক। এসব ফর্ম্যালিটিজ মানো তোমরা, যখন সবই আইনমাফিক করছ।' এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও রাজেশ্বরীকে দেখতে পেলো না মিঠু। ভেঙ্কট এগিয়ে এসে বলল, 'আমি রাজেশ্বরীর এজেন্ট সার, আমি দেখেছি, ঠিক আছে। সই করে দিচ্ছি।'

গৌতম বলল, 'কোথায় গেল রাজেশ্বরী ? এই তো একটু আগেও এখানে ছিল' রাজেশ্বরীকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মিঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে গৌতম আস্তে আস্তে বলল, 'এস.এফ.আই যাকে দাঁড় করাবে, সে-ই জিতবে, এই সামান্য জিনিসটা

বুঝতে তোরা এত সময় নিলি ?'

ঠিক তার স্কুলের বন্ধু যে কজন সেই কটা ভোট পেয়েছে উজ্জয়িনী। সে বন্ধুদের সঙ্গে কাউন্টিং হলের বাইরে বেরিয়ে আসছে। একটা হাতে মিঠুর হাত এত শক্ত করে ধরেছে যে মিঠুর হাতে লাগছে। ভেঙ্কট উজ্জয়িনীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ অপ্রস্তুত হল। সে থতমত খেয়ে বলল, 'সরি উজ্জয়িনী নো অফেন্স মেন্ট।' উজ্জয়িনী এক ঝটকায় পেছন ফিরে গেল। সে ফুলে ফুলে কাঁদছে। জীবনের গ্রন্থ থেকে তার একটা একটা করে ছবিঅলা পাতা খসে যাচ্ছে। হারাবার খেলা। হারবার খেলা শুরু হয়ে গেছে। ক্রমশই ন্যাড়া, বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে সব। মিঠু রুমাল দিয়ে মুছে মুছে লাল করে ফেলেছে মুখ, চোখ দুটোও ভারী, লাল হয়ে আছে।

ভেঙ্কট বলল, 'ইস ছি ছি, মেয়েগুলো এত সেন্টিমেন্টাল হয়! গৌতম তন্ময়কে ডাক তো একবার!'

তন্ময় এসে বলল, 'কী হয়েছে? হেরেছে? তো কী? ভ্যাট! উজ্জয়িনী, বেঁচে গেছ। গৌতম চল আমরা ক্যানটিনে যাই। মিঠু বিষ্ণুপ্রিয়া, উজ্জয়িনী চলো সবাই।'

উজ্জয়িনী অনেক কষ্টে বলল, 'আমি এখন বাড়ি যাব। তোমাদের আমাকে করুণা দেখাতে হবে না।'

ভেঙ্কট বলল, 'কে তোকে বাড়ি যেতে দিচ্ছে? দেবই না যেতে! এই সবাই মিলে ওকে ঘেরাও কর তো!' মুহূর্তের মধ্যে উজ্জয়িনী আর মিঠুকে ঘিরে একটা বলয় তৈরি হয়ে গেল।

'কী হচ্ছেটা কী? উজ্জয়িনী রেগে কাঁই হয়ে বলল, 'সবাই মিলে রিজেক্ট করে এখন আবার ঢং করা হচ্ছে!'

মিঠু জানে উজ্জয়িনী ভীষণ অহংকারী। পরাজয় সে কখনও সহ্য করতে পারে না। পরাজয়ের কাছে কখনও আত্মসমর্পণও করে না। কোনও ব্যাপারে হারলে তার প্রতিক্রিয়া হল—ভারি বয়ে গেল। মিঠুর নিজের জোর অনেক অনেক কম। উজ্জয়িনী যেমন তাকে আঘাত করে, তেমনি আবার অনেক সময়ে তার এই 'বয়ে গেল' জীবনদর্শন দিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধও করে। এসব ব্যাপারে উজ্জয়িনী মিঠুর আশ্রয়। যে কোনও বন্ধুবান্ধবের দলের মধ্যে এই ধরনের একটা পারস্পরিক পরিপূরকতার ব্যাপার থাকে, এই ভিত্তিতেই বন্ধুতা গড়ে ওঠে, মোটেই সবসময়ে মনের মিলের ওপর গড়ে না। এটা আজকাল মিঠু খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারে। উজ্জয়িনীকে কখনও এত বিচলিত হয়ে পড়তে সে দেখেনি। প্রকাশ্যে, সর্বজনসমক্ষে উজ্জয়িনী কাঁদছে এটা একটা নতুন ঘটনা।

ভেঙ্কট উজ্জয়িনীর কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, 'রিজেক্ট? কী বলছে রে গৌতম? রিজেক্ট কী?'

'আর ই জে ই সি টি—বুঝলি না?' গৌতম সঙ্গে সঙ্গে যোগান দিল।

'অ, তাই বল। রিজেক্ট? কে বললে তোকে রিজেক্ট করা হয়েছে? যত দিন যাবে বুঝবি শাপে বর হয়েছে তোর। শাপে বর, বুঝলি?'

'বুঝেছি। আর বোঝাতে হবে না। পথ ছাড়ো আমি বাড়ি যাব।'

'চেষ্টা করে দেখ!'

'ভেঙ্কট, আমি কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের কাছে নালিশ করব তোমাদের নামে!' উজ্জয়িনীর চোখ-মুখ থমথম করছে রাগে।

'এই তো কী সুন্দর রীজনেবল কথা বলছিস! এমনি রাগ-টাগ করবি তবে তো তোকে

মানাবে ! চল আজ আমার বাড়ি চল সবাই। খাওয়াবো। উজ্জয়িনী চল প্লিজ !'

উজ্জয়িনী কিছুতেই রাজি হল না। সে মিঠুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মোহন গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, দুজনে উঠতে সে বলল, কী ধর ?'

'বাড়ি চলো, কোঠি।'

'বাস !' মোহন সাধারণত এত সকাল সকাল কোঠি ফরমাশ শুনতে অভ্যস্ত নয়।

'হাঁ হাঁ কোঠি চলো না !' স্বভাব মতো আদেশের সুরে অধৈর্যভাবে ঝাঁঝিয়ে উঠল উজ্জয়িনী। তারপরে সীটে হেলান দিয়ে চোখ দুটো বুজতে হঠাৎ তার এখনকার বাস্তব তার কাছে হু হু করে ফিরে আসতে লাগল। কে সে ? ডক্টর মিত্রর চাকরকে এভাবে আদেশ করবার সে কে ? যে কোনও দিন ডাঃ মিত্র ফিরে এসে তাঁর একটি অঙ্গুলিহেলনে তাকে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দিতে পারেন, নয়ত তাকে মেনে নিতে হবে মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের নিয়তি।

মিঠু বলল, 'এই উজ্জয়িনী, অত ভেঙে পড়ছিস কেন ? বুঝতেই তো পারছিস সবই পলিটিক্‌সের খেলা। প্লিজ একটু হাস তুই এরকম করে থাকলে আমার ভেতরটা কিরকম করতে থাকে।'

উজ্জয়িনী গাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ভিখারিণীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'মিঠু তুই আমাকে খুব ভালোবাসিস, না রে ? আচ্ছা ধর, আমি যদি ওই রকম একটা বেগার-মেইড হতাম। ভালোবাসতিস ?'

এ আবার কী খেয়াল ?' মিঠু বলল, 'ইলেকশনে হেরে তোর এমন অবস্থা হল যে ভিখারির সঙ্গে নিজের তুলনা করছিস... ?' উজ্জয়িনী কোনও জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পর মিঠু বলল, 'দেখ উজ্জয়িনী, জীবনের এক একটা ঘটনা আমাদের এমনভাবে আঘাত করে যে কতকগুলো মৌলিক প্রশ্নের সামনে যেন আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়, না রে ? আমি কে ? শুধু আমি, সমস্ত আনুষঙ্গিক বাদ দিয়ে সুদ্ধু আমিটুকু কে ! তার মূল্য কী অন্য আরেক জনের সঙ্গে আমার তফাত কোথায় ! ধর সত্যিই ভিখারিণী মেয়েটা যদি আমার জায়গায় জন্মাতো আর আমি যদি ওর জায়গায় জন্মাতাম কী তফাত হত !'

উজ্জয়িনী বলল, 'তোর এরকম মনে হচ্ছে ?' তার গলা এত আস্তে যে প্রায় শোনাই যাচ্ছে না।

মিঠু বলল, 'হচ্ছে না। মাঝে মাঝেই হয়। এনভয়রনমেন্ট যদি পাল্টাপাল্টি করে দেওয়া হয় তাহলে কি সত্যি দুটো মানুষে খুব তফাত হবে ?'

উজ্জয়িনী বলল, 'সত্যি ! দৈবাৎ, একেবারে দৈবাৎ আমরা আমাদের ভাগ্যটা ভোগ করছি। এভাবে ভোগ করার কোনও অধিকারই আমাদের নেই রে মিঠু। ওই রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা অনাথ ছেলে-মেয়েগুলোর জন্যে আমাদের কিছু করা উচিত। এভাবে..এটা ঠিক নয়। একদম ঠিক নয়।' সে 'নয়' বলতে বলতে মাথা নাড়ছিল, তার গাল বেয়ে এক দানা চোখের জল টুপ করে চিবুকের ওপর পড়ল। মিঠুর ভেতরটা উজ্জয়িনীর জন্যে করুণায়, সমবেদনায়, ভালোবাসায় দ্রব হয়ে যাচ্ছিল।

সেই সময়ে কলেজের ইউনিয়ন রুমে আর একটা নাটক হচ্ছিল। কাউন্টিং প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময়ে হঠাৎ রাজেশ্বরী ফলাফলটা কী হতে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারে। সে এসে সোজা সুকান্তকে একটা পদত্যাগপত্র দেয়। খাতার পাতা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে খসখস করে লিখেছে সে পদত্যাগপত্রটা। তার চোখমুখ লাল। না কাঁদলেও ঝড়ের আকাশের মতো তার অবস্থা।

সুকান্ত বলল, 'এ কি করছ রাজেশ্বরী ! এ রকম হয় নাকি ? এইমাত্র অত মার্জিনে জিতে এলে এক্ষুনি আবার ব্যাক আউট করা যায় না কি ? আবার ইলেকশন, আবার হাঙ্গামা। না না, এরকম হয় না।'

'আবার ইলেকশনের কী আছে ? আমি ড্রপ করলেই উজ্জয়িনী আপসে চলে আসছে।'

'তা হয় না রাজেশ্বরী। ওকে দাঁড় করিয়েছে সি.পি। আমরা এমনি এমনি ছেড়ে দেব না কি ?'

'সে আপনারা যা ইচ্ছে করবেন।' বলে রাজেশ্বরী আর দাঁড়াল না। তার চোখের সামনে খালি ভাসছে উজ্জয়িনীর ক্রমশ ছাইয়ের মতো হয়ে যাওয়া মুখটা। সে কারুকে ডাকলো না, একলা একলা চুপি চুপি বাস-স্টপের দিকে চলে গেল।

উজ্জয়িনীর ফোন এসেছে। —'হাল্লো !'

'আমি ভেঙ্কট কথা বলছি। শোনো উজ্জয়িনী। জোর খবর। রাজেশ্বরী ভীষণ কান্নাকাটি করে রেজিগনেশন দিয়ে গেছে।'

কী ?'

'যা বললুম নির্জলা সত্যি। এস এফ আই-কে আবার ক্যান্ডিডেট দাঁড় করিয়ে আমাদের ক্লাসের ভোট নতুন করে করতে হবে। শোনো, ক্লাসের সবাইকে আমরা বলে দিচ্ছি, কেউ দাঁড়াতে রাজি হবে না। তোমাকে আমরা ইউন্যানি মাসলি পাঠাচ্ছি।'

'এ সব কী হচ্ছে ? আমি কি তোমাদের কাছে এসব চেয়েছি ? রাজেশ্বরীই বা হঠাৎ এরকম করল কেন ?' উজ্জয়িনী এখন অনেক শান্ত হয়ে গেছে।

'রাজেশ্বরী তো তোকে হারিয়ে ভীষণ আপসেট হয়ে গেছে, সুকান্তদা বলছে, কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ লাল করে ফেলেছে। তোরা মাইরি দেখালি একখানা !'

'আমি হেরে গেছি সেটা মেনে নেওয়াই আমি সম্মানজনক মনে করি ভেঙ্কট। ওসব মতলব ছাড়ো। ন্যাড়া বেলতলায় দুবার যায় না।'

'যা ব্বা বা।'

'বাবাকেই ডাকো আর মাকেই ডাকো, রাখছি।'

রাজেশ্বরীর নম্বর ডায়াল করল উজ্জয়িনী।

'হ্যাললো ?'

আমি উজ্জয়িনী বলছি। রাজকে একটু ডেকে দেবেন ?'

'উজ্জয়িনী ? রাজির কি হয়েছে রে ? হাউ-হাউ করে কাঁদল কলেজ থেকে এসে। খেলো না। এখন তো শুয়ে পড়েছে।'

'প্লিজ একটু ডাকুন মাসি।' আমার নাম করে বলবেন।'

কিছুক্ষণ পরে ভারী ধরা গলা শোনা গেল ওদিকে।

উজ্জয়িনী বলল, 'রাজ কংগ্র্যাচুলেশনস।'

'কিসের জন্য ? আমি তো রিজাইন করেছি। বাজে যত সব।'

'তুই না গেলে আর কেউ যাবে রাজ, আর কাউকে তো আমরা তোর মতো বিশ্বাস করতে পারব না ! প্লিজ, পাগলামি করিস না। কালকে গিয়ে চিঠিটা ফিরিয়ে নিস।'

'দূর, পড়াশোনার ক্ষতি হবে, আমি পারব না।'

'একটা তো বছর। চালিয়ে দে না। আমাদের মুখ চেয়ে কর রাজ, প্লিজ।'

'দেখি। চিন্তা করতে হবে।'

'দেখি নয়, কথা দে। বিশ্বাস কর আমি কিছু মনে করিনি। আর আমারই তো ভুল, অনেকেই আমায় বলেছিল উইথড্র করে নিতে।'

'তো নিলি না কেন ?'

'কি রকম একট রোখ চেপে গিয়েছিল, সত্যি বলছি ভুল করেছি। ক্ষমা করবি না ?'

এইভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই কে জয়ী, কে পরাজিত, কে কাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, সব গুলিয়ে গেল। উজ্জয়িনী রাজেশ্বরীর কাছ থেকে কথা আদায় করে, হালকা মনে মিঠুকে ফোন করল একঘণ্টা ধরে। রাতে খুব শান্তির ঘুম ঘুমোলো। পরদিন কলেজ গিয়ে রাজেশ্বরীকে পাকড়াও করল। তারপর চিঠি ফেরত নেবার জন্য ইউনিয়ন রুমে চলল।

সুকান্ত বলল, 'কী ছেলেমানুষি কাণ্ড বলো তো উজ্জয়িনী। ভাগ্যিস তুমি ছিলে তাই আমরা রক্ষা পেলুম। তুমিই দেখছি বেশি স্টেডি। রাজেশ্বরী, ওকে দেখে শেখো। অত ইমোশন্যাল, ইররাশন্যাল হলে কোনও কাজ করা যায় না।'

রাজেশ্বরী বলল, 'ফেলো ফিলিং বাদ দিয়ে, ইমোশন, ইনভলভমেন্ট এসব বাদ দিয়ে যে কাজ তাতে আমি বিশ্বাস করি না। আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে ইনভলভড। এতে যদি আপনাদের কাজের অসুবিধে হয় তো আমি থাকছি না। বলেই তো দিয়েছি।'

'উঃ বাবা, এই মেয়েগুলো আমার মাথা ধরিয়ে দিলে, রাজেশ্বরী কালচার‍্যাল সেক্রেটারি থাকবে, বুঝলি অরবিন্দ। ওকে লিডারশিপ দেওয়া যাবে না।'

উজ্জয়িনী ক্লাসে এলে গম্ভীরভাবে ভেঙ্কট বলল, 'আমরা সেলিব্রেট করব। আমার বাড়িতে কাল সন্ধেয়, সুবিধে হবে কি না দেখো।'

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, 'সন্ধেয় বলছিস, আমি ফিরব কী করে ?'

'কেন ? তন্ময় পৌঁছে দেবে।'

তন্ময় বলল, 'হ্যাঁ, এর মধ্যে অসুবিধের কি আছে ! ভেঙ্কট, গৌতম আমরা সবাই তো নর্থে আসব।'

মিঠু বললে, 'তোরা কেউ ইমনকে দেখেছিস ?'

'ইমন ? তুই জানিস না। ও তো ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে ব্যাঙ্গালোর গেছে।'

'তাই বুঝি ? ও মা। আমাকে বলেনি তো !'

'কাউকেই বলেনি। ভোটের ব্যাপারে যোগাযোগ করতে গিয়ে শুনলুম।'

ইমন যদি ভালো কিছু করে, তাহলে কিন্তু আমার বাড়িতে সেলিব্রেট করব।' ভেঙ্কট বলল।

'কী ব্যাপার রে ভেঙ্কট, তোর যে দেখি ভীষণ উৎসাহ !' মিঠু বলল।

ভেঙ্কট হাসি-হাসি মুখে বলল, 'আরে বাবা আছে। র‍্যাটিওসিনেটিভ সিনক্রোনাইজেশন।'

সব্বাই হাসতে লাগল। আসলে ভেঙ্কট একটা ছোটখাটো বিপ্লবই করে ফেলেছে। ওদের বাড়িতে পাঁচ শরিকের ডালপালার সবার সঙ্গে সবাইকার ভালো সম্পর্ক নেই। ফলে অত বড় সেকালের বাড়ি, তার সেগুন কাঠের জানলা দরজা, পাথরের মেঝে, বাথ-টবঅলা বড়-বড় বাথরুম নিয়ে অবহেলিত পড়েছিল। কার্নিশ থেকে গজিয়েছে বিশাল বটগাছ। ছাতের পাঁচিলের ফাঁকে তো রীতিমতো একটা ডুমুর গাছ। তাতে কষা কষা ডুমুর ফলে। যেখান সেখান থেকে ভেঙে ভেঙেও পড়ছিল। কিন্তু কারুর নজর ছিল না। সেইখানে ভেঙ্কট উদ্যোগ নিয়ে, সবাইকার কাছ থেকে টাকাকড়ি আদায় করে

াড়ি সারিয়েছে, উৎকৃষ্টতম রঙ দিয়ে রঙ পালিশ হয়ে বাড়ি এখন ঝকঝক করছে। াঝের উঠোনটা বাঁধানো হয়েছে তার মাঝখানে একটা লাল নীল মাছের ছোট্ট পুকুর, এবং ারে ধারে হরেক রকমের গোলাপ। ঘরের মালিকানার একটু অদলবদলও হয়েছে। এখনও নিচেই সবাইকার আলাদা আলাদা রান্নাঘর। কিন্তু দোতলায় তেতলায় প্রত্যেকটা ারিবার মোটামুটি পাশাপাশি।.সকলেই মোটের ওপর তুষ্ট, এবং ভেঙ্কটের ওপর সবারই একটা আলাদা রকম আস্থা এসেছে। সবচেয়ে খুশি হয়েছেন তার দুই জীবিত দাদু, মজদাদু ও ছোড়দাদু। পুরস্কারস্বরূপ মেজদাদু তাঁর অংশের দোতলার পাশাপাশি ঘরদুটো ভেঙ্কটকে ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছেন। ঘর দুটো বিশাল। তাতে খুব সুন্দর সকেলে আসবাব আছে। সেগুলো পালিশ করে হয়েছে যেন রাজরাজড়ার ঘর। একটা শায়া, পড়াশোনা ইত্যাদির জন্যে ব্যবহার করে ভেঙ্কট, আরেকটা বসার ঘর। অদূরেই াথরুম, এটাকেও একেবারে আধুনিক করে ফেলেছে ভেঙ্কট। বসার ঘরে একটু রান্নার ্যবস্থাও রেখেছে। মেজদাদু এবং ছোড়দাদু দুজনেই তাকে বেশ কিছু টাকা দিয়েছেন। উপরন্তু মেজদাদু তাকে শেয়ার বাজারের নানা খুঁটিনাটি শেখাচ্ছেন। সে শিগগিরই একটা পরীক্ষা দেবে। দাদুদের কাছ থেকে পাওয়া টাকাগুলো সে খাটাচ্ছে। বাড়ির আর সবাইকে সে বলেছে, 'দেখো, আজকাল বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়িতে অ্যাসোসিয়েশন করে কমন খরচগুলো চালায়, তা তোমরাও আমাকে বাড়ির কেয়ারটেকার করে দাও। প্রত্যেক ফ্যামিলি কিছু কিছু দেবে, আমি সব কিছু দেখাশোনা করব।'

পরীক্ষামূলকভাবে এ ব্যবস্থা চালু হয় এক মাস। ভেঙ্কট সবাইকার আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। ফলে, এখন তার নিজের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হয়েছে, সে বাড়ির প্রয়োজনে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, ছুতোর মিস্ত্রি, জমাদার ইত্যাদি সব কিছুরই দায়িত্ব নিয়েছে। ছোটখাটো কাজ সে নিজেই করে দেয়। তার এখন এসব বিষয়ে প্রচুর ব্যবহারিক জ্ঞান। কোন পেন্টের কত দর, সিমেন্ট কোন কোম্পানির ভালো, পুরনো সেগুন কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, রাজমিস্ত্রির রোজ, জোগাড়ের রোজ, কিভাবে ওরা ফাঁকি দেয়, এসব এখন তার নখদর্পণে। পাড়ার নিতাই জ্যাঠা তাকে অনুরোধ করছেন তাঁদের বাড়িটা সারিয়ে দিতে। ভেঙ্কট বলেছে, 'টু পাইস দেবেন তো জ্যাঠা!'

'আরে ভাই, কনট্রাক্টরকে দিলেও তো সে নেবে।'

'হ্যাঁ, নেবে মানে সব মালের থেকে কেটে কেটে নেবে, আপনি জানতেও পারবেন না। কত নিল, কোনখানে দু নম্বরি মাল দিয়ে এক নম্বরের দাম আদায় করল। তো আমি তা করব না। কাজেই আমার খাটুনির দাম পুষিয়ে দেবেন।'

এখন নিতাই জ্যাঠার সঙ্গে তার দর কষাকষি চলছে।

যাই হোক, তার নিজের একখানা চমৎকার আস্তানা হয়েছে, এবার সে কলেজের বন্ধুদের এখানে এনে আড্ডা দিতে চায়। ভেঙ্কটের এখন সর্বদাই ফুরফুরে মেজাজ। দিলদরিয়া ভাব। দাড়িটা আজকাল সে খুব কায়দা করে ট্রিম করছে। তার গোল মুখটা, ঈষৎ ছুঁচলো আঁতেল আঁতেল দেখায়, জামাকাপড়ের যত্ন বেড়েছে। রাজেশ্বরীর থেকে বেঁটে হওয়ার মনোদুঃখটা বোধ হয় অনেকটা ভুলেও গেছে সে।

গৌতমকে একদিন কোচিং থেকে ফিরতে ফিরতে বলল, 'তুই সেদিন ভবিষ্যৎ-ভবিষ্যৎ করছিলি না? কী করবি ঠিক করলি?'

'কী আর ঠিক করব? এখন আমি দু ফুট দূর পর্যন্ত দেখতে পাই। তো তাইতেই সন্তুষ্ট আছি। বেশি দূর অবধি দেখতে চাইলে সমস্ত মজাই মাটি। খিদে চলে যাবে।

মাথা ধরবে, অম্বল হবে....'

'থাম, থাম। তোর সঙ্গে অনেক জরুরি আলোচনা আছে'

'জরুরি আলোচনা ? কে করবে রে ভেঙ্কট ? তুই ? হাঃ হাঃ।'

'কিছুদিন আগেই তো তুই ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞেস করছিলি। এখন আবার উল্টো গাইছিস ?

'কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ভাবতে ইচ্ছে করছে না। তুই হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেলি কেন ? তোর সঙ্গে কথা বলে আমি যা হোক একটু শান্তি পাই। এমনিতেই তো সবারই মুখ গোমড়া, বাবা মা, দিদি দাদা বউদি। সব একধার থেকে রামগরুড়। কলেজে মনটা একটু মুখ বদলায়।

গৌতমকে নিয়ে ভেঙ্কট হেদুয়ার ভেতর ঢুকল। খালি বেঞ্চি আর পাওয়াই যায় না অবশেষে ঘাসের ওপরেই দুজনে বসে পড়ল। ভেঙ্কট বলল, 'আমার মাথায় অনেক খেলছে। দেখ তুই যদি পার্টনার হোস তো সাহস করে নেমে পড়তে পারি।'

'ব্যবসা-ট্যাবসা করবি না কি ?' গৌতম সন্দিগ্ধ সুরে বলল, 'দেখ ঘেঁটু। ওসব আনসার্টেন ব্যাপারে আমি নেই। মাস গেলে থোক পকেটে আসবে। নিশ্চিন্ত মনে ঘুম যাব। আমি এই বুঝি। প্রাণপণে রেজাল্টটা ভালো করবার চেষ্টা করছি। আজকাল টিচিং লাইনে মালকড়ি ভালোই দিচ্ছে।'

'দূর দূর ও আবার একটা টাকা নাকি ? জানিস, আমি এখন শুধু পার্টটাইমে কত কামাচ্ছি !'

'এই যাঃ, মনে করিয়ে দিলি। উঠি রে ভেঙ্কট টুইশনি আছে।' গৌতম তড়বড় করে উঠে পড়ল, 'আরেকদিন হবে।'

গৌতম চলে গেলেও ভেঙ্কট একা একা বসে রইল জলের দিকে তাকিয়ে। তার মাথায় ঘুরছে আর সি সি, এফ এ আর, ট্রাডিশনাল ব্রিক, মডুলার ব্রিক, নীট সিমেন্ট, ডেডো ফিনিশ, চাঝা, কলাম, বিম...। কলকাতার আশেপাশে বিশাল-বিশাল বাড়ি উঠছে ভেঙ্কটের। মোটা মোটা তাড়ার নোট সে গুনে গেঁথে মেজদাদুর আয়রন চেস্টে তুলে রাখছে। আস্তে আস্তে ভরে গেল সিন্দুকটা। তখনও টাকা রয়ে গেছে প্যান্টের পাশ পকেটে, হিপ পকেটে। ভেঙ্কট মস্ত বড় একটা গাড়ির পাল্লা খুলে বসল, স্প্রিংটা তাকে নাচিয়ে নিল একবার। ভেতরটা চমৎকার ঠাণ্ডা। এয়ার-কন্ডিশনড তো ! সে নিজেই ড্রাইভ করছে। ভি আই পি রোড ধরে সোজা। দুধারে সুন্দর সুন্দর বাড়ি সরে সরে যাচ্ছে। গাছপালা, মাঠ-ময়দান, গরু-বাছুর। তার পেছনে, সামনে আরও গাড়ি। ভেঙ্কট একটা সিগারেট ধরালো। না, পাইপ। পাইপ না হলে ঠিক মানায় না। সে এখন এয়ারপোর্টে যাচ্ছে। তার গাড়ির বুটে একটা ফাইবারের সুটকেস আছে। সঙ্গে একটা বিউটিফুল ব্যাগ। সে আজ সন্ধের ফ্লাইটে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে। দিন সাতেক নিউ ইয়র্কে তার পিসতুতো ভাই শুভো আছে, তারপর কানাডা। উত্তর আমেরিকা মহাদেশটা সে ভালো করে দেখবে। তিন মাস ধরে। কয়েক লাখ টাকা খরচ হবে। তা হোক।

ওর ভেতরে একটা সূক্ষ্ম ইম্পিশ ব্যাপার আছে...'

সোমার বেশির ভাগ দিনই বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। একেক দিন সন্ধে উতরে যায়। অমিত রিডারশিপের জন্য চেষ্টা করছে। তারও পোস্ট ডক্টর‍্যাল পেপার্সের জন্যে খাটতে হয়। একেকদিন সেও ফেরে সোমার সামান্য আগে বা পরে। সোমা দেখছে শ্বশুরবাড়িতে এসে অমিতের কেমন একটা গা-ছাড়া ভাব এসে গেছে। আজ নিয়ে তিনদিন সে বাড়ি ফিরে দেখল অমিত ঋতুর ঘরে চিতপটাং হয়ে শুয়ে আছে, আর ঋতু উপুড় হয়ে তার গা ঘেঁষে, পা দুটোকে ওপরে তুলে গালে হাত দিয়ে মগ্ন হয়ে গল্প করে যাচ্ছে। পাশেই বেড সাইড টেবিলে দুটো প্লেটে ভুক্তাবশিষ্ট। অর্থাৎ এইখানে, এই শোবার ঘরেই খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। সামান্য উঠে গিয়ে খাবার টেবিলে বসতেও আলস্য। সোমা মাস কয়েক হল অভ্যন্তরে একটি নতুন প্রাণের বীজ বহন করছে। এই নিয়ে তাকে প্রাণান্তকর খাটুনি খাটতে হয়। একে জোকায় যাওয়া-আসা। সেটাই তো প্রাণ বের করে দেয়। নেহাত সময়টা শীত তাই সহ্য করা যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই তার ভীষণ শির টেনে ধরে পায়ে, পেটে। পাগলের মতো খিদে পায়। তার পরেই গা বমি করতে থাকে। নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যাওয়া-আসাটাও সে একাই করে। অমিত কাজ করুক। পড়াশোনা করুক। কিন্তু এ কী? ঋতুর নিজের পড়াশোনা, কলেজ ইত্যাদিও চুলোয় গেছে।

সোমা বাবা-মাকে তার অবস্থার কথা বলেনি। ফ্রান্স যাওয়া ঠিকঠাক হয়ে যাবার পরে তার মা ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। সোমা অবশ্য খুবই স্বাবলম্বী। সে কোনও অবস্থাতেই কারো সাহায্য নেওয়া পছন্দ করে না। মায়েদের সময়েও এ অবস্থায় বাপের বাড়ি থাকার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু সোমা এসব প্রথাকে পাত্তা দেয় না। মীনাক্ষী অপরাধী গলায় বলেছিলেন, 'তার ওপর ঋতুকে তোর ওপর চাপিয়ে যাচ্ছি।'

সোমা তখন খুব রাগ করেছিল, 'মা, আমি একটা অ্যাডাল্ট মেয়ে, আড়াই মাসের জন্য ছোটবোনের দায়িত্ব নিতে পারব না?'

'কিন্তু তোমার ছোটবোনটি যে কখন কী মেজাজে থাকে '

'—আমার ওপর ছেড়ে দাও', চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসে বলেছিল সোমা . 'তাছাড়াও ঋতু তো বড় হচ্ছে!' সোমার ধারণা তার ক্ষেত্রে যেমন বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মেজাজে ভারসাম্য এসেছিল, দায়িত্ববোধ এসেছিল, নিজের জীবন সম্পর্কে নিজের একটা আলাদা কৌতূহল এসেছিল, ঋতুর বেলাতেও তাই-ই হবে। কিন্তু এ ক সপ্তাহে এ বাড়িতে থাকতে এসে তার সেসব ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। ঋতুকে ঠিক যে অবস্থায় রেখে সে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল, ফিরে এসে তাকে ঠিক সে জায়গায় তো সে দেখতে পাচ্ছেই না। উপরন্তু একজন সম্পূর্ণ অচেনা, কিরকম কুঁড়ে, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন, নাক উঁচু, মরিয়া ধরনের এক তরুণীর সঙ্গে বাস করতে হচ্ছে তাকে। ব্যক্তিস্বাধীনতায় সেও বিশ্বাস করে, কিন্তু তাই বলে কিছু বলতে পাবে না? সে বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে, বাইরের জামাকাপড় বদলে, গায়ে একটা গরম শাল মুড়ি দিয়ে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসন্তী চা এনে হাজির করল, সঙ্গে চিকেন ওমলেট।

সোমা বলল, 'নিয়ে যাও বাসন্তীদি। খিদে নেই।' বাসন্তী বলল, 'কিছু খেয়েছ আপিসে?' 'না', 'তাহলে? সোমা এখন খিদে ফেলে রাখতে নেই, খেয়ে নাও।' সোমা

উল্টো দিকে ফিরে শুলো। বাসন্তী চা এবং জলখাবার টেবিলে রেখে, ঋতুর ঘরে সোজা ঢুকে গেল। ঋতু এখন অমিতের মাথার চুল নিয়ে খেলা করছে। বাসন্তী বলল, 'জামাইবাবু, সোমাদিদি এসেছে, শুয়ে পড়েছে ও ঘরে, কিছু খেলো না। না খেলে কিন্তু ভয়ঙ্কর যন্তন্না হবে—কিছুক্ষণ পর, বলে দিচ্ছি।'

অমিত ধড়মড় করে উঠে বসল, তারপর এক লাফে মাটিতে নেমে তাড়াতাড়ি ও ঘরে পৌঁছে গেল।

'সোমা, সোমা, কখন এসেছ ? খাওনি কেন ? এই তো এখানে রয়েছে, ওঠো। খেয়ে নাও।' সোমা একইভাবে শুয়ে। একটু নিচু হয়ে অমিত দেখল তার গালে জলের দাগ চিকচিক করছে, সে এদিক-ওদিক দেখে সোমার গালে একটা ভারী গোছের চুমু দিয়ে বলল, 'কী হল ? রাগ করেছ কেন ? আমি বুঝতে পারিনি তুমি এসেছ।'

'আমি আছি, আমি তোমার স্ত্রী, আগে বান্ধবী ছিলুম, এসব কিছুই মনে রাখবার দরকার কি অমিত ? যাও, যেখানে ছিলে সেখানে যাও। আমায় বিরক্ত করো না।'

'তাই বলে তুমি খাবে না ? সারাদিনের পর ? তারপরে যন্ত্রণা শুরু হবে, তখন ছোটাছুটি ...'

'তোমাকে ছোটাছুটি করতে হবে না। লেট মি অ্যালোন।'

অমিত অসহায়ের মতো দরজার দিকে মুখ করে ডাকল, 'ঋতু, ঋতু দিদির কি হল দেখো তো, খাচ্ছে না ...।'

এবার সোমা সটানে উঠে দাঁড়াল—তার মুখ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে, সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে করতে চাপা গলায় বলল, 'বেরিয়ে যাও এ ঘর থেকে অমিত, বেরিয়ে যাও বলছি !'

ঋতু ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'পাগলের মতো চেঁচামেচি করছিস কেন ? খাবি না তো খাস না—তাই বলে শুধু শুধু সীন ক্রিয়েট করবি ?' সোমা আর পারল না, হাত বাড়িয়ে ঋতুর গালে একটা ঠাস করে চড় কষিয়ে দিল, তারপর টাল সামলাতে না পেরে দড়াম করে পড়ে গেল।

'রাইটলি সার্ভড'—ঋতু খানিকটা সরে যাওয়ায় বেশি লাগেনি। সে নিজের গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল।

'অমিত বলল, "বলছ কি ঋতু—ওকে তোলো ! বাসন্তীদি ! বাসন্তীদি !' বাসন্তী রান্নাঘরের ভেতর দিকে স্টোররুমের মধ্যে ছিল। কিছু বুঝতে পারেনি। সে ঘরে এসে দেখল—সোমা সটান মেঝের ওপর পড়ে আছে। অজ্ঞান। সে বলল, 'তখনই বলেছিলুম তিন মাস পোয়াতি, সারাদিন খেটেখুটে এসে না খেলে এমন যন্তন্না হবে, তা মেঝেতে শুয়ে পড়েছে কেন ?'

অমিত বলল, 'পড়ে গেছে।'

'পড়ে গেছে ?' বাসন্তী আতঙ্কিত গলায় বলল, 'পড়ে গেছে ? হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী ? ঋতু বাড়ির ডাক্তারবাবুকে কল দাও, শিগগিরই। দেখো দিকিনি, মা-বাবা নেই, এ সময়ে কত যত্ত-আত্তি, সেবার, আদরের দরকার। কেউ নেই। কী করি গো !' বাসন্তী গ্লাসে করে জল এনে সোমার মাথায় ছিটোতে লাগল।

ডাক্তারবাবু চেম্বারে নেই, আসবামাত্র তাঁকে যেন খবরটা দেওয়া হয় বলে ঋতু ফোন রাখল। বাসন্তীতে অমিতে মিলে এখন সোমাকে বিছানায় শুইয়েছে। বাসন্তী তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, অমিত মাথায় কপালে জলের ছিটে দিচ্ছে একটু একটু। সোমার

পাতলা চেহারা, ঋতুর মতো সে ছোটখাটো মানুষ নয়, চেহারার ধরনটা বেশ লম্বাটে। সে এখন চিত হয়ে শুয়ে আছে বলে ঋতু বুঝতে পারল দিদি অন্তঃসত্ত্বা, এইবার বোধহয় সোমার জ্ঞান হয়েছে, চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপছে, ঠোঁট দুটোও থরথর করে কাঁপছে। মাঝে মাঝে সে যন্ত্রণার শব্দ করছে। বাসন্তী মুখ ফিরিয়ে বলল, 'রান্নাঘর থেকে একটু দুধ ছেঁকে নিয়ে এসো তো ঋতু, আমি এই জ্বাল দিয়ে নামিয়ে এসেছি। একটা চামচও এনো।'

ঋতু দুধটা এনে বাসন্তীর হাতে দিল। সে নরম গলায় বলল, 'সোমা, খুকু—দুধটা খেয়ে নাও তো সোনা!' চামচে করে সে দুধ খাইয়ে দিতে লাগল, সোমা বাচ্চা মেয়ের মতো দুধটা খেয়ে নিল। ঋতু আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। ডাক্তার-কাকা আসছেন না কেন এখনও?

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ডাক্তার সেন এবং অমিত দুজনে মিলে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে নার্সিং হোমে নিয়ে গেলেন। তার পেটে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, ব্লীডিং হচ্ছে।

ঋতু বারান্দায় দাঁড়িয়েই ছিল, দাঁড়িয়েই ছিল। বাসন্তী যখন খাবার জন্য ডাকতে এলো, সে ববল, 'অমিত এলে খাব।'

বাসন্তী সামান্য ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'অমিতের সঙ্গে তোমার কী? সে কখন আসবে তার কোনও ঠিক আছে নাকি? আর এও বলি ঋতু অত বড় জামাইবাবুকে দাদা বলতে পার না?'

'জ্ঞান দিচ্ছ নাকি আমাকে?' ঠাণ্ডা গলায় ঋতু বলল।

'যা খুশি বলো আমাকে, ছোট থেকে আছি তোমাদের বাড়ি। তোমাকে দু হাতে মানুষ করেছি। কাজ করে খাই বলে মনে করো না, আমার চোখ নেই, কান নেই। মানতে না পার যেদিন বলবে চলে যাব। এখন সোমাটার কী হবে ভেবে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে।' ঋতু চুপ করে বারান্দায় বসে রইল। দশটা নাগাদ অমিত ফিরল, উদভ্রান্ত চেহারা। বাসন্তী উৎকণ্ঠিত মুখে বলল, 'কী হল জামাইবাবু, ভালো আছে?' ঋতুও পেছনে দাঁড়িয়ে। অমিত বলল, 'চেষ্টা করছেন ডাক্তাররা, সী ইজ বীয়িং, গিভন এভরি কাইন্ড অফ হেল্প। আমি একটু পরেই আবার যাব।'

ঋতু বলল, 'আমিও যাবো অমিত।'

অমিত খাচ্ছিল, মুখ তুলে বলল, 'তুমি কোথায় যাবে, ছেলেমানুষ!'

ঋতুর খাওয়ার রুচি চলে গেল। তবু সে প্লেটের খাবারগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। বাসন্তী আপন মনেই বলল, 'আজকাল সব ছেলে-ছোকরার কাণ্ড। বাড়িতে একটা বড়ো মানুষ কেউ নেই। শরীরের যত্ন, মনের যত্ন, এ সময়ে মনটাও নরম হয়ে যায়। বউদি যে এই সময়ে কেন গেল?'

অমিত মুখ-টুখ ধুয়ে ওইখানেই বসে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর ব্যাগের ভেতর থেকে আর কিছু টাকাকড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল, যাবার সময়ে বলে গেল, 'বাসন্তীদি, ঋতুকে দেখো। আমি দরকার হলে টেলিফোন করব।'

দিন সাতেক পরে সোমা বাড়ি এলো। অনেক কষ্টে বাচ্চাটা বেঁচেছে। আপাতত একদম বেড-রেস্ট। খুব ফ্যাকাশে হয়ে গেছে সোমা। স্ট্রেচার থেকে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেবার পর ঋতু একটা পাতলা কম্বল তার গায়ে ঢাকা দিয়ে দিল। বলল, 'সোমা! এখন কেমন আছিস?'

'ঠিক আছি।' সোমা একটু বিবর্ণ হাসল, 'তুই? ঠিক আছিস তো? ব্যস্ত হোস না।

কলেজ-টলেজ যা।'

অমিত ছুটি বাড়িয়ে নিল। বাসন্তীই সব করছে সেবার কাজ। ঋতু মাঝে মাঝে বাসন্তীর নির্দেশমতো একটু আধটু রান্না করে। তার কলেজ এবং নাচের ক্লাস বন্ধ করতে দেয় না কেউই। অমিত প্রায় সব সময়েই সোমার ঘরে। বিশেষত ঋতু এলেই সে যেখানেই থাকুক বোঁ করে সোমার ঘরে ঢুকে যায়। ঋতুর এতে অত্যন্ত অপমানবোধ হয়। সে-ও ঢুকেই কোন দিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়, সেখানে বসেই খায়। একটু পরে সোমার ঘরে গিয়ে সোমার খোঁজ নেয়। তারপর আবার নিজের ঘরে ঢুকে যায় বা বারান্দায় গিয়ে বসে। রাত্রে খাওয়ার সময়ে অমিত ঘরে খায়। ঋতু খায় খাবার টেবিলে। একা।

সোমা এখন একটু ভালো। গায়ে জোর পেয়েছে। সে বলল, 'ঋতু ফিরলেই তুমি ওরকম ল্যাজ তুলে এ ঘরে দৌড়ে আসো কেন ?'

অমিত গম্ভীরভাবে বলল, 'তোমার স্বাস্থ্যটা তো দেখতে হবে ?'

'অমিত শ্লেষ করে নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করো না। দিনের পর দিন কাজ ফেলে বাড়িতে বসে আড্ডা দিয়েছ, আমাকে বাদ দিয়ে দুজনে সিনেমা গেছ, দোকানবাজার গেছ, দিনের পর দিন। প্রতিদিন রাত্তির সাড়ে ছটা সাতটায় বাড়ি ফিরে দেখেছি ...' সোমা থেমে গেল।

'কী দেখেছ বলো ! বললে না !'

'তুমিও জানো আমিও জানি, বলবার আর কী আছে !' সোমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'সেই জন্যেই তো এই ব্যবস্থা নিয়েছি।'

'এটাও মোটেই ঠিক হচ্ছে না। ও কি ভাবছে বলো তো ! একটা ছোট মেয়ে বই তো নয়।'

'তুমি যতটা ভাবছ ততটা ছোট ও নয় বোধহয়, ওর ভেতরে একটা সূক্ষ্ম ইম্পিশ ব্যাপার আছে।'

'সূক্ষ্ম-টুক্ষ্ম নয়। বেশ স্থূলভাবেই আছে। ও নিজে সব সময় সবার মনোযোগের কেন্দ্র হতে চায়। ছলে-বলে-কৌশলে। না হতে পারলে খেপে যায়', সে ক্ষীণ স্বর তুলে ডাকতে লাগল, 'ঋতু ! ঋতু !'

বেশ কিছুক্ষণ পর ঋতু এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়াল। সোমা বলল, 'খেয়েছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে এসে বস না রে একটু ! শুয়ে শুয়ে বোর হয়ে গেলাম।'

'কেন একজন তো রয়েছে।'

'দূর দুজনে আড্ডা হয় ! এখন তো আমি আউট অফ ডেঞ্জার। চলে আয়, তিনজনে মিলে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

ঋতু একবার অমিতের, একবার সোমার মুখের দিকে তাকাল। তার পর গম্ভীরভাবে বলল, 'আমার নাচ প্র্যাকটিস আছে। ও ঘরে যাচ্ছি।' সে চলে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়িয়েছে, সোমা বলল, 'এ ঘরে কর না।'

'এ ঘরে স্পেস নেই যথেষ্ট,' বলে ঋতু আর দাঁড়াল না।

একটু পরে সোমা বলল, 'ওর মেজাজ ঠিক হতে সময় লাগবে।'

অমিত বলল, 'তোমার অত ব্যস্ততার দরকার কি ? যখন ঠিক হবে, হবে।'

'সে তো বটেই।' সোমা বলল, 'তবে আমার আট ন'বছরের ছোট বোন কি না

দেখো অমিত ও ছেলেমানুষ। ওর মধ্যে এখনও অনেক ইম্যাচুওরিটি আছে। চড়টা আমি ওকে মেরেছিলুম অসভ্যতার জন্য। বড় দিদি হিসেবে শাসন করবার রাইট আছে বলে। কিন্তু, আসল চড়টা আমি নিজের গালেই মেরেছি।'

অমিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সোমা হতাশ হয়ে বলল, 'বুঝতে পারলে না? তুমি কিন্তু ছেলেমানুষ নও, ইম্যাচিওর নও, বুঝতে না পারার কোনও কৈফিয়ত তোমার নেই। জীবনে যা করবে, দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে করবে।'

অমিত বলল, 'বুঝলুম।'

'কী বুঝলে?'

'সময়ে বলব। আপাতত বাদানুবাদ চালাবার পক্ষে বড্ড চিঁচিঁ করছ। চুপ করো।'

১২

বোলও তো চমৎকার বললে ...'

এই সময়ে উজ্জয়িনীদের বাড়ির জমায়েতটা ঋতুর কাছে আশীর্বাদের মতো এলো। এমনিতে উজ্জয়িনী তার বাড়িতে যেতে কাউকে উৎসাহিত করে না। কারণটা ঋতু জানে। অনুকা আর মিঠুরই একমাত্র ও বাড়িতে অবাধ যাতায়াত। অনুর কাছ থেকেই সে শুনেছে। স্কুলে থাকতে অবশ্য উজ্জয়িনীর জন্মদিনে গেছে। সামান্য কয়েকজন বন্ধুকে ডাকত উজ্জয়িনী। ঋতুদের বাড়ির মতো জমজমাট পার্টি হত না। মাসি বাড়িতেই রান্না করে খাওয়াতেন। সেই সময়ে কখনও কখনও উজ্জয়িনীর বাবাকে দেখেছে। টকটকে ফর্সা, যেন ইংরেজ। দারুণ সুন্দর ছিলেন এককালে বোঝা যায়। এখনও মোট-টোটা হয়ে গেলেও খুব আকর্ষণীয়। অন্তত ঋতুর তাই মনে হয়। গলার আওয়াজটা? দূর থেকে যেন মেঘের ডাক ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। সব মিলিয়ে ভেরি ভেরি মাচ ম্যাসকুলিন। কলেজের অত জনকে বাড়িতে ডেকে উজ্জয়িনী পার্টি দেবে শুনে সে একটু অবাকই হয়েছিল। অনুকে জিজ্ঞেস করে জানলো উজ্জয়িনীর বাবা এখন এখানে নেই। জরুরি কেসে বাইরে গেছেন।

ওই আকর্ষণীয় মানুষটিকে দেখতে পাবে না বলে ঋতুর একটু মেজাজ খারাপ হল। কিন্তু বাড়িতে আরো স্যাঁতসেঁতে থাকে মেজাজ। ঢুকেই মিঠুকে দেখতে পেল ঋতু। তারপর রাজেশ্বরী, অনু। প্রচুর ফুল সাজিয়েছে উজ্জয়িনী। কিন্তু নিজে একদম সাজেনি। একটা হলুদ-কালো হায়দ্রাবাদি শাড়ি পরেছে। ঋতু কিন্তু অনেক দিন পর হল্লা হবে বলে খুব সেজেছে। লিভিংরুমে লম্বা আয়নায় নিজের নতুন ফ্যাশনের সালোয়ার কুর্তা পরা চেহারাটা দেখে সে খুব খুশি হল। ফিল্ম স্টারের মতো দেখাচ্ছে। গ্ল্যামারাস। মিঠু বলল, 'ঋতু তুই দিন দিন সুন্দর হচ্ছিস।' ঋতু বলল—'আহা কে কাকে বলছে?' এই সময়ে খোলা দরজা দিয়ে আরও কয়েকজন ঢুকে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ঋতুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ওই ভেঙ্কট আর গৌতম বলে ফাজিল ছেলেগুলোকে কেন যে উজ্জয়িনী-মিঠুরা এত পাত্তা দেয়! একেবারে ফালতু। তন্ময় হালদারও এসেছে। এটা অত ফাজিল নয়। কিন্তু ওরা কি ঋতুদের 'সেট'-এর। সে যেখানে বসেছিল সেখানেই বসে বসে উজ্জয়িনীদের য়ুরোপ ঘোরার অ্যালবামটা দেখতে লাগল। মাসি সবার সঙ্গে পরিচয় করছেন।

ভেঙ্কট দারুণ মাঞ্জা দিয়ে এসেছে, গৌতমও তাই। খালি তন্ময় পরিষ্কার শার্ট-প্যান্ট পরা। মাসি বললেন, 'কোথায়, ঠিক কোন জায়গায় থাকো বলো তো ?

'সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট।' ভেঙ্কট বলল।

'সাহিত্য পরিষদের পালবাড়ি ? মঞ্জুষা তোমার কে হয় ?'

ভেঙ্কট বলল, 'মঞ্জুপিসি ? আমার পিসি হন, মেজদাদুর মেজ মেয়ে।'

'তাই বলো, মঞ্জু তো আমার ভীষণ বন্ধু ছিল, কত গেছি এক সময়ে তোমাদের বাড়ি। মঞ্জু এখন কোথায় আছে ?

'পুনেতে।'

'আসে ?'

'কই আর ? ওখানে প্র্যাকটিস করে তো ! রেগুলার চিঠিপত্র দেয়। ফোন করে !'

'খুব ভালো লাগল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে, আমাদের সেইসব অল্প বয়সের দিনগুলো ! মাধুরীদি, অলকা ওদের কী খবর ?'

ভেঙ্কট বলল, 'মাধুরী পিসিমা কানাডায় সেট্‌লড, অলকা পিসি থাকে আসাম।'

'কী বিরাট পরিবার ছিল তোমাদের। কত দিনের ঐতিহ্য ! তোমার বাবার নামটা বলো তো হয়ত চিনতে পারব।'

'আমার বাবার নাম পঙ্কজ পাল। আমাদের এখনও ওই রকমই বিরাট ফ্যামিলি মাসিমা।'

'ওরে ব্বাবা, পঙ্কজদা ? দারুণ ফুটবল খেলতেন। ভীষণ ব্রাইট। কোথায় আছেন এখন ?'

'বাবা তো অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, হেলথ ডিপার্টমেন্টে।'

'আচ্ছা ! ক'ভাই বোন তোমরা ?

'—বোন নেই মাসিমা, বড় দাদা আছে, ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, সি ই এস সি-তে আছে।' ঋতু কান খাড়া করে ছিল। ফুটবল ? বারবেরিয়ানস' গেম ! অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রটারি, হেল্‌থ ! দাদা এঞ্জিনিয়ার ? ভেঙ্কটের সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড তো খারাপ না ! মাসি যা করছেন, ভেঙ্কটের সঙ্গেই বোধহয় সারাক্ষণ কথা বলবেন !

তন্ময়ের মা যে কলেজের প্রিনসিপ্যাল, সেখানে মাসিরা পড়েছেন দেখা গেল। মাসি এবং ভেঙ্কটেশের পিসিরা—মাধুরী, মঞ্জুষা আর অলকা।

উজ্জয়িনী বলল, 'মা, তুমি ওদের এমন করে ঠিকুজি-কুলুজি নিতে শুরু করেছ যে !' মাসি বললেন, 'আসলে, নর্থ ক্যালকাটায় আমার মামার বাড়ি। ছোটবেলায় বাবার ঘুরে ঘুরে কাজ ছিল, আমরা তো মামার বাড়ি থেকেই মানুষ। সেইসব ছিল জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিন। কত দিন যাওয়া হয় না। অনেক দিন ধরে ভাবছি আমাদের মহিলা-শিল্প সমিতির একটা উত্তরের শাখা খুলব। তোমাদের বাড়ি একদিন মেসোমশাইকে দেখতে যাব ভেঙ্কট।'

'নিশ্চয়ই যাবেন, আমি তো একটু আগেই বলতে যাচ্ছিলাম।'

ঋতু অ্যালবামটা বন্ধ করে রেখে দিল। মিঠু বলল, 'এই আজকে ঋতুর নাচ হোক। ঋতুর কত্থকের সিক্সথ ইয়ার চলছে। দারুণ নাচে। ঋতু প্লিজ নাচ্।' ঋতু বলল, 'তবলা নেই। তাছাড়া বোল বলে বলে আমি নাচতে পারব না। হাঁফিয়ে যাই।'

রাজেশ্বরী বলল, 'ঠুংরির সঙ্গে নাচ না। আমি গেয়ে দিচ্ছি।'

গৌতম একটু লাজুক গলায় বলল, 'তবলা আছে ?'

অমনি সবাই হই-হই করে উঠল। মাসি বললেন, 'সব আছে, তবলা, ঘুঙুর, হার্মোনিয়াম। মেয়ে কিছুই শিখল না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব বেরোল। ঘুঙুরের বাক্স থেকে ঘুঙুরগুলো বার করে নেড়ে-চেড়ে দেখল ঋতু। বলল, 'খুব ভালো ঘুঙুর রে উজ্জয়িনী, দারুণ আওয়াজ, ওয়েটটাও ঠিক আছে।'

'তবে তো সাত মন তেল পুড়ল, রাধা এবার নাচুক। 'ভেঙ্কট মন্তব্য করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজেশ্বরী হার্মোনিয়ম নিয়ে, গৌতম তবলা ঠুকতে ঠুকতে বসে গেল। গৌতম বলল, 'বোল যদি কিছু মাঝখানে বলতে হয়, লিখে দাও। আমি বলে দেব।'

উজ্জয়িনী বলল, 'সবই যদি হল তাহলে আর আলোকসম্পাতটা বাকি থাকে কেন! খাবার টেবিল একেবারে ধারে সরিয়ে মাঝখানে নাচের ফ্লোর হল। এটা জ্বালিয়ে ওটা নিবিয়ে উজ্জয়িনী এমন আলো জ্বালল, যাতে মাঝখানে ঋতুর ওপরেই শুধু আলো পড়ে। দারুণ জমে গেল। মাসি মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'এ তো প্রোফেশন্যাল স্ট্যান্ডার্ড একেবারে!' ঋতু গৌতমের দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে বলল, 'তুমি তো দারুণ বাজাও!'

'শখ আর কি!' গৌতম লজ্জা পেয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল।

'বোলও তো চমৎকার বললে!'

'ওই। শখ। মাঝে মাঝে নাচের সঙ্গেও বাজাতে হয় তো। বলতেও হয়।'

রাজেশ্বরী দুটো ভজন গাইল। তবলায় গৌতম নন্দী। মিঠু গাইল দুটো রবীন্দ্রসঙ্গীত। মাসি খুব হৃষ্ট মুখে বললেন, 'এ তো রীতিমত জলসা হয়ে গেল রে! যাক তোরা গল্প স্বল্প কর, আমি খাবার জোগাড় করি।'

উজ্জয়িনী আলো জ্বেলে দিল কতকগুলো। বলল, 'প্রিয়া তুই এতো চুপচাপ কেন রে? কি হয়েছে?'

'...কই? কিছু না তো!'

মিঠু বলল, 'সন্তোষকে বলিস নি উজ্জয়িনী?'

'সন্তোষ আজ দিন আষ্টেক হল কলেজে আসেনি, ফোনও নেই। থাকে বেহালায়। খবর দেওয়া যায়নি।

রাজেশ্বরী বলল, 'ও জানতে পারলে খুব রাগ করবে রে!'

ভেঙ্কট বলল, 'তাতে কী হয়েছে? আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম তো আমার বাড়িতে। তখন আসবে। হই চই হবে।'

এই সময়ে একটা ট্রলি ঠেলে যমুনা প্রবেশ করল, তার ওপর লম্বা ডাঁটির ছোট ছোট সুদৃশ্য পাত্রে লাল রঙের পানীয়।

গৌতম আর ভেঙ্কট সবিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। উজ্জয়িনীর মা বললেন, 'রাজেশ্বরী ইলেকশন জিতেছে, সেই জয়ের অনারে একটা ভোদকার বোতল খুলেছি। সবাই নাও।' ভোদকার সঙ্গে টোম্যাটো রস, ব্লাডি মেরি।

ভেঙ্কট বলে উঠল, 'মাসিমা হুর্‌রে, আপনি না...'

'কী? গেম?' হাসতে হাসতে অমিতা বললেন।

ভেঙ্কট মাথা নাড়ল, জনান্তিকে গৌতম আর তন্ময়কে বলল, 'গেম ফেম নয় মাসিমা একেবারে ঘ্যাম।'

মিঠু বলল, 'আপনি নেবেন না, মাসি?'

'হ্যাঁ নেব।' একটা পাত্র তুলে নিয়ে অমিতা বললেন, 'চীয়ার্স।' সবাই প্রতিধ্বনি করল, একটু পরে অমিতা বললেন, 'এটা কিন্তু একসেপশন, ডোন্ট মেক ইট এ রুল।' সবাই হেসে উঠল।

ক্রমশ টেবিল খাদ্যসম্ভারে ভরে উঠল। উজ্জয়িনী ওদের হাতে প্লেট চামচ, সব তুলে দিতে লাগল। সে তার মাকে এত হাসিখুশি, উজ্জ্বল, ছেলেমানুষ কখনো দেখেনি। তার নিজের মধ্যেটা এখনও ভারী হয়ে রয়েছে। যদিও যা শুনেছে তা অতি দূর, অদেখা সুতরাং, গল্পকথার মতো। কিন্তু মা? মা কি গোপন কথা বলতে পেরে হালকা হয়ে গেছে?

বন্ধুরা চলে গেলে উজ্জয়িনী একলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ওরা বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে একে একে। সবাই স্বাভাবিক পরিবারের ছেলে মেয়ে। মা আছে বাবা আছে। এইরকম লজ্জাকর অতীত। লজ্জাকর বর্তমান কি কারো? সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল হে-ভগবান, আমি কেন? আমাকেই কেন? এত জনের মধ্যে থেকে সব রকম দুর্ভাগ্যের জন্যে আমাকেই বেছে নিলে কেন? সব কিছুতে আমাকেই হারতে হবে কেন? আমি কেন? কেন? কেন? এখন আমি কী করব? বাবা যে কোনও মুহূর্তে আমার জীবনটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে দিতে পারে। যেভাবে শীলা ভার্গবকে নিয়ে বেরিয়ে গেল, বাবা মরিয়া হয়ে গেছে। হয়ত নিজেই ডিভোর্স চাইবে। লোকলজ্জার বালাই তো নেই। সবার চোখের সামনে দিয়েই তো এইভাবে চলছে, মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে। যত লজ্জা, যত দুঃখ, অপমান তো স-বই মায়ের। আর আমার। কত সুখী আর সবাই! ওরা যখন জানতে পারবে আমার পরিচয়। চোখে চোখ ফেলবে না। মুখ লুকিয়ে পালিয়ে যাবে লজ্জায়!

উজ্জয়িনী আর ভাবতে পারছে না। মা এসে বলল, 'জুনি শুতে চল।' উজ্জয়িনী আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গেল। মা বলল, 'ড্রেস চেঞ্জ করে আমার ঘরে আয়। আমার কাছে শুবি।'

অনেক রাতে অমিতার ঘুম ভেঙে গেল, পাশে মেয়ে নেই। জানলার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। গালের ওপর রাস্তার আলো পড়েছে। সেই উজ্জয়িনী, গর্বিত, অভিমানী, আদুরে, অসহিষ্ণু, সর্দারি করা যার মজ্জাগত; কথায় কথায় বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া, এই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আবার দুদিন পরেই ভাব, কোনক্রমেই লেখাপড়া বা অন্য কিছুতে গুরুত্ব দিতে শেখাতে পারেননি। সে যেন চিরকাল তার অবস্থানের জোরেই সব কিছু পেয়ে যাবে, তাকে কোনও উদ্যম নিতে হবে না। আজ তাকে চেনা যাচ্ছে না। অমিতার ভয় করতে লাগল। কিন্তু তিনি কত পাহারা দিয়ে রাখবেন ওকে? তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলেন তিনি মেয়ের ওপর। কিন্তু নড়লেন না। চুপচাপ বসে রইলেন। আধঘণ্টা পরে উজ্জয়িনী ঘরে এলো। ফিসফিস করে বলল, 'মা তুমি বসে আছ?'

'তুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আমার ঘুম ভেঙে গেল।'

উজ্জয়িনী আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। ছটফট করছে। অমিতা মাথায় হাত রাখলেন 'ঘুমো, ঘুমো।'

'ঘুম আসছে না মা।'

ভোর রাত অবধি দুজনে জেগে রইল। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে যেন তারা দুটিই মাত্র বিনিদ্র মানুষ।

১৩

ার কষ্ট বেশি না ইমনের ?

ইমন ফাইনাল খেলছে। উল্টো দিকে বম্বের মায়া ভাবনানি। ইমনের চোখ, মন সমস্ত ুজ টেবিলটার আলোকবৃত্তের ওপর কেন্দ্রীভূত। সে দেখে নিয়েছে মায়া ভাবনানির গর হ্যান্ডটা দুর্বল। মায়া বেঁটেখাটো। একটা পিংপং বলের মতোই সে লাফাচ্ছে তার ল্টো দিকে। ইমন লম্বা, রোগা, সে দুলছে জোরালো হাওয়ার বেগে বাঁশের কঞ্চির তো। মায়া সার্ভিস করে যেন কেউটে সাপের ছোবল। টেবিলের কোনায় পড়ে ছিটকে চ্ছে বল। ওর সার্ভিসগুলোতে ছুঁতে পারছে না ওকে ইমন। শেষ বলটা সে চমৎকার কটা টপ স্পিন মারল। পয়েন্ট ইমনের। ইমনের সার্ভিস। তুলেছে মায়া, নেটের ওপর য়ে টুক করে ড্রপ শটে পড়ল, এক লাফে এগিয়ে এসে ইমন তুলল বলটাকে, টেবিলের ইরে চলে গেল। এইভাবে পাঁচটা অবধি গড়ালো গেম, ইমন পারল না। একটুর জন্যে রে গেল। ঘামে সোঁপাটে ভিজে গেছে। ভাবনানির সঙ্গে হ্যান্ড শেক করে ইমন ফিরে চ্ছে। ক্লিক ক্লিক ক্যামেরা, সাংবাদিকরা তাকে ঘিরে ধরেছে। 'দারুণ খেলেছেন, জাস্ট াড লাক।' 'স্টাইল অনবদ্য।'

'কী মনে হচ্ছে আপনার ? টুর্নামেন্টটা কিন্তু আপনারই হাতে ছিল।. অত ভ্যারাইটির র। কী মনে হচ্ছে ?' নাছোড় সব সাংবাদিক।

'কী মনে হবে ? পারলাম না এই মনে হচ্ছে !' ইমন হাসল। আসলে কিন্তু সে সবুজ লের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশে অজানা গাছ। গুল্ম, সমুদ্রের তলার সব প্রাণী াকে নিরীক্ষণ করছিল। ইমন ভেসে ভেসে বেরিয়ে যাচ্ছিল। যখন খুব মনোযোগ াকে, তখন সে এইরকম আলোকময় সবুজ জলের তলায় চলে যায়। অনেকক্ষণ এই ায়গা থেকে বার হতে পারে না। ট্রোফি নিল মায়া। সে রানার আপ। টীম ইভেন্টেও ম্বে। ডাবল্স্-এ কুসুম ভার্গিজের সঙ্গে তারা জিতেছে।

হোটেলে ফিরে চান-টান খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই লাউঞ্জে বসে আছে। কুসুম লে, 'ইমন, তোমার ওপর কিন্তু আমাদের অনেক আশা ছিল।' ইমন বলল, 'জানি।' মন জানে তার ওপর অনেকের আশা, অনেকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কুসুম আবারও লল, 'দারুণ খেলা তোমার যেন গান গাইছ, কিন্তু ইমন ওই যে বলে কীলার ইনস্টিংট। ইটেরই কি অভাব তোমার ?' ইমন উঠে বসল। সত্যিই তো ! খেলতে খেলতে খেলার ান্দে সে মগ্ন হয়ে যায়, প্রতিপক্ষকে প্রতিপক্ষ বলে মনে করে না, যেন তার পার্টনার। জতার ওপর সে গুরুত্ব দেয় না। কুসুম বলল, 'কিচ্ছু না, তুমি কোচ পাল্টাও। ইমন।'

সংবাদটা টিভি-র মারফত শুনে মন খারাপ হয়ে গেল মিঠুর, ভেঙ্কটের। খেলা ানিকটা দেখালও। মিঠুর দাদা সুহাস বলল, 'একটা এক্স ফ্যাকটর থাকে, থেকেই যায় সব খেলায়। একটু এদিক ওদিক হলেই পয়েন্ট গেল। তাছাড়া বম্বের কোচিং অনেক বশি বৈজ্ঞানিক। কত খরচ করে ওদের পেছনে। এখানে কী আছে ? না কোনও নকারেজমেন্ট, না টাকা-পয়সা, না প্রপার কোচিং। আমি ইমনের খেলা আগেও দখেছি। খুব ভালো। কিন্তু ঠিক লোকের হাতে পড়া চাই।'

অনুরাধা বললেন, 'ওর কি সব চান্সই চলে গেল ? এই শেষ ?'

'তা কেন ?' সাদেক বললেন, 'আবার আসছে বছর খেলবে, আসছে বছর ও পাবেই। মামি বলে দিলুম, দেখো।'

ভেঙ্কট প্রথমটায় খুব ভেঙে পড়েছিল। খবর শুনেই মাথায় হাত দিয়ে নিজের ঘ
শুয়ে পড়ল। পারল না ? ইমনটা পারল না ! বেঙ্গলে ওকে কেউ ছুঁতে পারেনি দু বছর।
কলকাতায় থাকতে এসে কি অবনতি হল মেয়েটার ?

কলেজ গিয়ে কিন্তু সে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলতে লাগল। ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ-
রানার আপ হওয়াটাই কি সোজা কথা ! তাছাড়া কাগজে ফলাও করে ইমনের স্টাইলে
প্রশংসা করেছে। এমনিতেই তো খেলার পাতার দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকে ক্রিকেট আ
ফুটবল, বাকি টুকুতেও টেনিস, হকির জয়জয়কার। টেব্‌ল্ টেনিস কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে
ক্রমশ, অথচ কী বিউটিফুল খেলাটা ! ভেঙ্কট বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। বলে
দেখ ইমনের হার কোনও কারণে সেদিন শরীরটা ঠিক ছিল না। এইসব আনুষঙ্গি
ব্যাপারই ভীষণ জরুরি হয়ে দাঁড়ায় এ ধরনের টুর্নামেন্টে। সবাই বলল, 'ভেঙ্কট তুই-
ট্রোফিটা দিয়ে দে ইমনকে।'

'দেবই তো, দেবই তো' ভেঙ্কট একটুও দমে না।

মঙ্গলবার খেলা শেষ হল, ইমন কলেজে এলো পরের সোমবার। সেই একই রক
আলগা শার্ট আর ব্লু-জীন্‌স্ পরে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে তন্ময়ের কাছে সাহায
প্রার্থনা করল। অনেকদিন কলেজ কামাই হয়ে গেছে, তন্ময় নোট-টোট যদি দেয়।
ভেঙ্কট বলল, 'আমি তোর জন্যে সব জিরক্স করে রেখেছি। ফিলসফির জ
রাজেশ্বরীকে বল।' মিঠু বলল, 'এতদিন কোথায় ছিলি রে ইমন ?' ইমন বলল—'বা
গিয়েছিলাম, মাকে ভাইকে দেখতে।'

'বাবা ?'

'বাবা তো নেই !'

'তোর বাবা নেই ? বলিসনি তো ?'

'বলবার আর কি আছে !' ইমন স্মিতমুখে বলছে যেন বাবা না থাকাটা খুব এক
স্বাভাবিক ব্যাপার।

'তোর ভাই কত বড় রে ?'

'বছর দশ হবে।'

'কোথায় পড়ে ?'

'ওখানেই স্কুলে পড়ে।'

'খেলে তোর মতো ?'

'না।'

উজ্জয়িনী বলল, 'শেখাস না ?'

'পারবে না। পোলিওতে একটা পা জখম।'

'ইস্‌স্। মাসিমা ওকে নিয়ে একা একা ? কার কাছে থাকিস তোরা ?'

বিপজ্জনকরকম ব্যক্তিগত আওতায় চলে আসছে আলোচনা। ইমন বলল, ' কা
কাছে থাকবে ? একা একাই থাকে। কোয়ার্টার্স আছে।'

'মাসি কাজ করেন ? কোথায় রে ?'

'হাসপাতালে, নার্স।'

উজ্জয়িনী পাশেই দাঁড়িয়ে শুনছিল। হঠাৎ তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।
তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। মিঠু লক্ষ্য করেনি। কিন্তু ইমন লক্ষ্য করেছিল।
সে জানে, সে জানত তাঁর মায়ের বৃত্তির পরিচয় পেলে এরা এইসব সম্পন্ন পরিবারে

ছেলেমেয়েরা সেটা ভাল ভাবে নেবে না। তার বাবা নেই। তার ভাইয়ের পোলিও, তার মা নার্স, নার্স মানে কী? তাদের তো আলাদা কোনও কোয়ার্টার্স নেই, ছোট্ট এক ঘরের একটা আস্তানা, একটু রান্নাঘর আর কলঘর। উজ্জয়িনীর বাবা মস্ত বড় ডাক্তার, তাইনি, সে জানে, মিঠুর বাবা নামকরা কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, ঋতুর বাবা প্রাইভেট ফার্মে বড় অফিসার, ওদের মায়েরাও বড় বড় কাজ করেন, কেতাদুরস্ত, চলায় বলায় একেবারে অন্য জগতের মানুষ। এরা তার দিকে, তার মায়ের দিকে বাঁকা চোখে চাইবে, সে সহ্য করতে পারবে না। তাই সে এক একা থাকে, কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চায় না। নিষ্ঠুর, দাম্ভিক, এই শহর, সে জানে। কিন্তু তার মা যে তার মা-ই। তার সমস্ত ছেলেবেলা, আনন্দ, ভালবাসার কেন্দ্র, তার পঙ্গু ভাইটি আর তার মা, আর তার অকালমৃত বাবা, যিনি হাসপাতালের ক্লার্ক ছিলেন। কী কঠোর দারিদ্র্যে তাদের দিন কাটছে। এরা এইসব ফর্সা, চুল কাটা, লিপস্টিক মাখা মেয়েরা সেসব কল্পনাও করতে পারবে না।

হোস্টেলে গিয়ে সে দেখল তার নামে একটা লম্বা খামের চিঠি এসেছে। উল্টেপাল্টে সে দেখল সেন্ট্রাল গর্ভমেন্টের। রেলওয়েজ। তাকে যত শীঘ্র সম্ভব দেখা করতে বলা হচ্ছে।

উজ্জয়িনী নার্স কথাটা কানে এলেই ধাক্কা খায়। সে সরে এসেছিল ওই কারণেই। মিঠু ক্লাস শেষ হতে বলল, 'উজ্জয়িনী তখন তুই চট করে চলে এলি, ইমন বোধ হয় কিছু মনে করল।' ইমনের সঙ্গে মিঠু অন্যদের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ। সে অনুভব করে ইমনের ভেতরে কোথাও ব্যথার জায়গা আছে। বাবা নেই, ভাইয়ের পোলিও, এই দুটো কথাতেই ইমনের দুর্ভাগ্যের একটা ছবি যেন কেউ কাঠকয়লা দিয়ে তার সামনে এঁকে দিয়েছিল।

উজ্জয়িনী অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'কে বললে?'

'কে আবার বলবে? আমার মনে হল।'

'আচ্ছা, আমি ইমনের সঙ্গে কথা বলব।'

'কী বলবি? দূর কিছু বলতে যাস নি।'

মিঠু মনে মনে দুঃখ পেল, উজ্জয়িনীকে সে এত ভালবাসে, কিন্তু ওর মধ্যে করুণা, ভালবাসা, এ জিনিসগুলো বোধ হয় কোনদিন আর জন্মাবে না। ইদানীং আবার সে যেন আগের চেয়েও খামখেয়ালি হয়ে উঠেছে। সে তবু বলল, 'ইমনের কী কষ্ট বল তো! বাবা মারা গেছেন। মাকে সব চালাতে হয়, ভাইটার আবার পোলিও। যত কষ্ট কি একজনকেই দিতে হবে?' হঠাৎ যেন উজ্জয়িনীর মুখের ওপর কে চাবুক মারল। অস্পষ্ট ভাবে সে বুঝতে পারল, ইমনের অনেক সমস্যা আছে। তার চেয়ে বেশি কী? সারা ক্লাস ধরে সে শুধু এই কথাই ভাবে। তার কষ্ট বেশি না ইমনের? ইমন কি কোনভাবে তার সমস্যার কাছাকাছিও আসতে পেরেছে? না, বোধ হয় না। পরক্ষণেই মনে হয়, তার জাগতিক সুখ সৌভাগ্য অনেক আছে, ইমনের সেসব নেই। তাহলে?

এইসব কথাই সে আজকাল ভাবে সবসময়। এইরকম ভাবতে ভাবতেই একদিন সে বাড়ি গিয়ে দেখল সামনে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে। সে ভেতরে ঢুকল, লিফ্‌টম্যান তার দিকে যেন কেমন করে তাকাল, দরজা খোলা, মা বসে আছে, সঙ্গে একগাদা আত্মীয়স্বজন, সবাইকার থমথমে মুখ। কী হল? যাক মা, মা অন্তত আছে। তার এক পিসতুতো দাদা তাকে কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'মামার প্লেন অ্যাকসিডেন্ট করেছে। বেশির ভাগই মৃত। মামা যুঝছে, এখনও কাউকে যেতে দিচ্ছে না।' উজ্জয়িনী দুহাতে মুখ ঢাকল। মা বলল, 'জুনি, আমার কাছে আয়।' সবাই পথ করে

দিচ্ছে। উজ্জয়িনীকে ধরে ধরে তার মার কাছে পৌছে দিল তার পিসতুতো দাদা। মা উজ্জয়িনীকে জড়িয়ে ধরে আছে। মা কি জানে উজ্জয়িনীর সেই স্বপ্নটার কথা ? বালিশ, বালিশটা সে বাবার মুখের ওপর প্রাণপণে চেপে ধরেছে। বাবা বড্ড বেশি ঘুমের ওষুধ খায়, ছটফট করছে বালিশের তলায় !

দুদিন পরে কলেজ গেল উজ্জয়িনী। সমস্ত বন্ধুরা উৎকণ্ঠিত মুখে সহানুভূতি জানাচ্ছে। কেমন আছেন ? কেমন আছেন ? উজ্জয়িনী শুকনো মুখে বলল, 'কিছু বলা যাচ্ছে না।'

তিন মাস পর ডক্টর মিত্র ফিরে এলেন। কথা বলতে পারেন না। হাত পা নাড়তে পারেন না। পোড়া ঘাগুলো শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু সারা শরীরে কষ্ট। নার্ভের চিকিৎসা হচ্ছে। কিন্তু ডাক্তাররা বিশেষ আশা দিতে পারছেন না। এইভাবেই যতদিন বাঁচেন। অমিতা একটি আয়া রাখলেন, পথ্য করা, খাওয়ানো, ওষুধপত্র দেওয়া তিনি নিজে হাতেই করেন। উজ্জয়িনীও কিছু কিছু করে।

দুপুর বেলা বাবা ঘুমোচ্ছেন। বা কোমার মধ্যে পড়ে আছেন। উজ্জয়িনী আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। বাবার টেবিলের ড্রয়ার থেকে চাবি বার করল। ড্রয়ারগুলো একটা একটা করে খুলে কাগজপত্রগুলো দেখে আর রেখে দেয়, অবশেষে একটা পুরনো ফাইলের মধ্যে সে তার অন্বিষ্ট কাগজের টুকরোটা পেল—এ ফিমেল চাইল্ড বর্ন টু মিস ডোরা ডিসুজা, অ্যাট টুয়েলভ নুন, দি টোয়েন্টি ফার্স্ট নভেম্বর, নাইনটিন সিক্সটি নাইন। কাগজটা তুলে নিল সে, তলায় একটা ডাইরি, তার পাতা খুলতেই একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি— ডলি ডলি মুখ একটি মেয়ে, বাইশ তেইশ বছর বয়স হবে। ছবির পেছনে লেখা 'টু রজত, মাই ডার্লিং— ডোরা।' ছবিটাও তুলে নিল উজ্জয়িনী। ড্রয়ার বন্ধ করে উঠে দাঁড়াতে দেখে বাবা চেয়ে আছে। কি রকম গোঁ গোঁ শব্দ করছে মুখে, সে একটু এগিয়ে গেল, বলল, 'আমার বার্থ সার্টিফিকেটটা আর ডোরার ছবিটা নিলাম।' রজত মিত্র কিছু বুঝলেন কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু আবার চোখ বুজে ফেললেন।

এইভাবেই তার টেস্ট হয়ে গেল। ছুটি পড়ার ঠিক আগে দীর্ঘ দীর্ঘকাল ভোগার পর ডক্টর মিত্র মারা গেলেন। উজ্জয়িনী তার বার্থ সার্টিফিকেট আর ডোরার ছবি দুটো চুপিচুপি গ্যাসের ওপর ধরে পুড়িয়ে ফেলল।

শেষদিন কলেজে গিয়ে শুনল খুব হইচই হচ্ছে। ইমন রেলে ভাল চাকরি পেয়েছে।

'কি রে ইমন ? তুই তাহলে কলেজ ছেড়ে দিবি ?'

'না, না। যত দিন না গ্র্যাজুয়েশন হচ্ছে ওরা বিবেচনা করবে। সকালবেলায় গিয়ে একবার শুধু সইটা করে আসতে হবে। তবে ওদের হয়ে সব টুর্নামেন্ট খেলতে হবে।

'এত ভাল চাকরি পেলি, আমাদের খাওয়াবি না ?'

'নিশ্চয়ই খাওয়াব। কী খাবে, কবে খাবে বলো।' ইমন সবসময়ে প্রস্তুত।

ভেঙ্কট বলল, 'না, না, ও খাওয়াবে না। আমি খাওয়াব, অনেকদিন ধরে ঠিক হয়ে আছে। এবার একটা দিন ঠিক করে ফেল সবাই।'

গৌতম বলল, 'সত্যিই, ভেঙ্কট কিন্তু সেই গত বছর থেকে এঁচে আছে, কবে ইমন ন্যাশন্যাল চ্যাম্পিয়ন হবে, ও খাওয়াবে।'

ইমন বলল, 'আমি তো পারি নি ভেঙ্কট, তাহলে তুমি কেন শুধু শুধু...'

ভেঙ্কট বলল, 'খেলার সেমি-ফাইন্যাল, ফাইন্যাল থাকবে, খাওয়ার থাকবে না ? এটা আমার খাওয়ানোর সেমি-ফাইনাল।'

'মানে তুমি যে কোন ছুতোয় খাওয়াবেই ?' ইমন হাসিমুখে বলল।

'যে কোনও ছুতোয় না, আই. মুখার্জিকে ছুতো করে অর্থাৎ কেন্দ্র করে।'

এই সময়ে লাল পাড় কোরা শাড়ি পরে রুক্ষ চুলে উজ্জয়িনী ঢোকে, যেন রুক্ষ, তপস্যাক্লিষ্ট অপর্ণা। প্রসাধন পারিপাট্যহীন উজ্জয়িনী যেন অন্য উজ্জয়িনী। তাদের চেনা নয়। সবাই চুপ করে যায়। সম্ভ্রমের স্তব্ধতা। একগুচ্ছ জীবনের মাঝখানে মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে। ইমন আস্তে আস্তে একটু ইতস্তত করে তার দিকে এগিয়ে যায়, বিষণ্ণ মুখে বলে, 'উজ্জয়িনী, আয়্যাম উইথ ইউ। আমিও তোমারই মতো শোকার্ত।' সবাই মুখ নিচু করল। উজ্জয়িনীর মাথার মধ্যে কী বিচিত্র সব ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। সে ভাবছে, সব মৃত্যুই কি এক ? বাইরে থেকে রুক্ষ মলিন বেশ, খালি পা, হবিষ্যান্ন, কিন্তু ভেতরে ? ইমনের বাবাকে সে ইমনের এখনকার মুখ-চোখের আর্ততার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তাঁর মৃত্যু একটা সর্বনাশ। কিন্তু রজত মিত্র যে সময়মতো মারা গিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন। কে যে এই টাইমিংগুলো করে!

সে মুখ নিচু করে বলল, 'থ্যাংকিউ।' উজ্জয়িনীর অশৌচ, তাই ভেঙ্কটের বাড়ির পার্টিটা পেছিয়ে যায়।

১৪

ঘরেও নহে, পারেও নহে

গৌতমের বাবা হরিসাধনবাবু স্থানীয় বয়েজ স্কুলের হেড মাস্টারমশাই। তাঁর প্রধান দুঃখ স্কুলের ছেলেগুলির মধ্যে থেকে দু-চার বছর অন্তর অন্তরই এক আধটা প্রথম দশের মধ্যে হয়। কিন্তু নিজের ছেলেদের মধ্যে কেউই সুবিধে করতে পারল না। বড়টি তো আবার এম. এসসি পড়তে পড়তেই বিয়ে করে ফেলেছে সহপাঠিনীকে। সে এক কাণ্ড, ভাবলেও এখন গায়ে কাঁটা দেয়। ও পাড়ার ছেলে এসে এ পাড়ায় শাসিয়ে যাচ্ছে, এ পাড়ার ছেলে যাচ্ছে ও পাড়ায় শাসাতে। মেয়েটি বাবা-মার কাছ থেকে পালিয়ে তাঁর বাড়িতে এসে আশ্রয় নিল, গিন্নি তাকে চুপি চুপি নিজের বাপের বাড়ি চালান করলেন। ওফ্। ছেলে বউ দুজনেই এখন স্কুলে কাজ করছে। সায়েন্সের কোচিং। দু হাতে টাকা রোজগার করছে। বরানগরের দিকে চমৎকার ফ্ল্যাট কিনেছে। যে কোনদিন উঠে যাবে। বড় মেয়েটি কিছুতেই বিয়ে-থা করল না। তার আবার কিছু গোপন কথা আছে কি না বুঝতে পারেন না হরিসাধনবাবু। কিন্তু ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে তার একদমই বনিবনা নেই। মেয়েও স্কুলে চাকরি করছে আজ অনেক বছর হল। ছেলে-বউ চলে গেলে সংসারে মুখ কমবে তিনটে কিন্তু টাকা কমে যাবে অনেকটা। আমোদ আহ্লাদের ভাগেও কমবে অনেক। নাতিটা চলে যাবে। ছেলে-বউ লোক খাওয়াতে ভালবাসত। সে-সব জিনিস আর থাকবে না বাড়িতে। তাঁর বয়স হয়েছে, এক্সটেনশন পিরিয়ড শেষ হয়ে এলো। এখন আর টুইশন করতে পারেন না। তাঁর আশা ছোট ছেলেটি শিগগির দাঁড়াবে। মেয়ের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিতে হলে তিনি মরমে মরে যাবেন।

তিনি গৌতমকে আজ ডেকে পাঠিয়েছেন। তার মা বোতাম বসাবার নাম করে ঘরের কোণে একগাদা পাঞ্জাবি, শার্ট, ছুঁচ, সুতো নিয়ে বসেছে। ছোট ছেলেকে কিচ্ছুটি বলবার জো নেই। গৌতম এসে দাঁড়িয়েছে।

'বাবা, ডাকছিলে ?'

'হ্যাঁ, মানে পড়াশোনা কি রকম হচ্ছে ? ফাইনাল তো এসে গেল।'

'হচ্ছে ভালোই !'

'বসতে তো দেখি না'।

'এ বাড়িতে বসবার জায়গাটা কোথায় ?'

ছেলের মা বললেন, 'ঠিক কথা। দু'খানা ঘর খোকন নিয়ে আছে। মিনু আর আমি একটাতে। এ ঘরে সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকা ওর পোষায় ? কারুর চোখের সামনে সদাসর্বদা পড়াশোনা হয় না বাপু। সে তুমি যা-ই বলো।'

'তাহলে পড়াশোনা তোমার একেবারেই হচ্ছে না ?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

'হবে না কেন ? কলেজে, লাইব্রেরিতে, বন্ধুর বাড়িতে।'

'বন্ধু, মানে ঘেঁটু ? ঘেঁটুদের বাড়ি তো একটা মেছোবাজার বিশেষ। সেখানে পড়া ?'

'মেছোবাজারের মধ্যেই নিরিবিলি আছে। ওর মেজদাদু ওকে দু'খানা ঘর দিয়েছেন।' শেষ কথাগুলো বেশ জোর দিয়ে বাবাকে শুনিয়ে বলল গৌতম।

'দু'খানা না হোক, একখানা ঘর তুমি শিগগিরই পেয়ে যাবে মনে হয়, খোকনরা বরানগরে চলে গেলে। তবে তোমার পরীক্ষার পড়া কি আর তদ্দিন বসে থাকবে !'

'তারপর ? কী করবে কিছু ভেবেছ ? এরপর পার্ট টু। তারপর ?'

'দেখি। এম. এ পড়ব, ঠিকঠাক রেজাল্ট হলে।'

'তার মানে আরও দু তিন বছর আমায় টানতে হবে। বি-এ-তেই আড়াইশ করে কোচিংয়ের জন্যে দিতে হচ্ছে, এম-এ-তে তো পাঁচশ নেবে। পাব কোথায় ?

'গৌতম বলল, 'দিতে হবে না।'

'কোত্থেকে পাবে, তবে ?'

'পাব না। এম. এ পড়ব না। এ পরীক্ষাটা দিয়েই মোটর-ড্রাইভিং-এ ট্রেনিং নেব ঠিক করেছি। ট্যাকসি ড্রাইভার হয়ে যাব।'

'তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ?' হরিসাধনবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন।

'তুমি ঠাট্টা করলে আমাকেও ঠাট্টা করতে হয়।'

'আমি ? আমি তোমার সঙ্গে... ?'

'পরীক্ষার আর ঠিক তিন মাস বাকি। এমনিতেই দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না। এখন ডেকে এইভাবে বিরক্ত করাটা ফ্রাসট্রেশন বাড়িয়ে দেওয়াটা একটা ক্রুয়েল ঠাট্টা ছাড়া কী ?' গৌতম উত্তেজিত না হয়েই কথাগুলো বলল।

গৌতমের মা বললেন, 'সত্যিই তো, এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। এত অসুবিধের মধ্যেও খোকা তো চুপচাপ নিজের কাজ করে যাচ্ছে। নিজে সারা জীবন ওদের কখনও পড়ালে না, শোনালে না। গণ্ডা-গণ্ডা পরের ছেলে মানুষ হয়ে গেল। এখন তেণ্ডাই-মেণ্ডাই করলে কী হবে ?'

'গণ্ডা গণ্ডা পরের ছেলে কি পড়িয়েছি সাধ করে ? তোমার সংসারটি চলেছে কিভাবে ?'

'অমনি সংসার আমার একলার হয়ে গেল ?' গৌতমের মা রাগ করে সেলাই নিয়ে উঠে গেলেন। গৌতম আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

দালানের ও প্রান্তে দাদাদের দুটো ঘর। একটাতে সারাক্ষণ কোচিং চলে। বউদির মর্নিং স্কুল। এগারোটায় বাড়ি এসে একটা অবধি জিরিয়ে নিয়ে পাঁচটা পর্যন্ত বউদি

ব্যাচকে ব্যাচ পড়ায়। দাদা শুরু করে ভোর সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। আবার ছটা থেকে নটা। নটার পর ঘরখানা খালি হয়। কিন্তু সারা দিনে একশ দেড়শ ছাত্র-ছাত্রীর চটি জুতোর নোংরায় অকথ্য হয়ে থাকে। এটাই ছিল আগে বৈঠকখানা। এখানে বাবাও একসময়ে ছাত্র পড়িয়েছেন, এখন যে দু'চারজনকে পড়ান, ভেতরের শোবার ঘরেই পড়ান। বাবার ঘরেই ভিন্ন তক্তপোশে শোয় গৌতম। বাড়িতে টেকাটাই তার কাছে একটা সমস্যা। তার আবার পড়া? সে আজকাল ভেঙ্কটের আস্তানায় জুটেছে। কিন্তু ভেঙ্কটের পড়াশোনা ছাড়া আর সব ব্যাপারে দুরন্ত উৎসাহ। পড়তে পড়তে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে যায় গৌতম।

'কী আকাশ-পাতাল ভাবছিস?' ভেঙ্কট একটা গদিমোড়া বাহারি আরাম কেদারায় শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে বলল।

গৌতম বলল, 'তোর আর কি?'

ভেঙ্কট তেমনি পা নাচাতে নাচাতেই বলল, 'জানিস তো বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। আর ম্যান ইজ দা আর্কিটেক্ট অফ হিজ ওন ফেট। নিজের ভাগ্য নিজেকে গড়ে নিতে হয়।'

'গড়তে হলেও কিছু একটা চাই তো! শূন্যের ওপর কি কিছু গড়া যায়?'

উঠে বসল ভেঙ্কট, বলল, 'দাঁড়া, রাবড়ি আর ওমলেট খা আগে, তবে বুদ্ধি খুলবে।'

সে তাড়াতাড়ি ঘরের কোণে হিটারে ওমলেট ভাজতে লেগে গেল। প্লেটে ওমলেট, আর পলিথিনের কাপে রাবড়ি। এগিয়ে দিয়ে, নিজে বেশ খানিকটা মুখে পুরে বলল, 'খা, তারপর কী বলবি বল!'

'আমি কিছুই বলব না। বলবার কিছু নেই।'

'এরকম স্যাঁতসেঁতে মেরে যাচ্ছিল কেন দিন কে দিন? প্রথম যখন কলেজ ভর্তি হলি কত ফুর্তিবাজ ছিলিস তখন!'

'কিছু হয়নি। কিছু হবে না। আমার মতো ছেলেদের জীবন একটা বিরাট নো।'

'পথে আয়। এই কথাই বলছিলি তো একটু আগে? শোন, তুই বলছিলি আমার পায়ের তলায় মাটি আছে। ছিল না, ছিল না গৌতম বিশ্বাস কর। জয়েন্টে চান্স না পেতে বাবা আর দাদা এমন করতে লাগল যেন আমি অচ্ছুৎ। আর কাজিনগুলো? মুখে একটা ব্যঙ্গের হাসি, কী, কেমন হল? এমনি ভাব। এইসব পুরনো কালের যৌথ পরিবার জানবি হিংসে, পরশ্রীকাতরতা আর স্বার্থপরতার এক একটি ডিপো। আমার কাজিন দাদাগুলো তো বেশির ভাগই এঞ্জিনিয়ার, ভালো চাকুরে, কিন্তু কী পরিমাণ মক্ষিচুষ তুই ধারণা করতে পারবি না, সেই সঙ্গে পিপুফিশু। আর দুটো বুড়ো আছে মেজদাদু আর ছোড়দাদু। মেজদাদু কাজ-কর্ম চাকরি-বাকরি কী করত জানি না, কিন্তু শেয়ারের ঘুণ, প্রচুর টাকা করেছে, ছেলে নেই একটাও। আমার মায়ের হাত তোলা সেবা নিতে বাধ্য হচ্ছে তাই। এত কঞ্জুষ বুড়ো উপুড় হস্ত হবে না কখনও। আর ছোড়দাদুটা হচ্ছে দুঁদে উকিল। দিদা নড়াচড়া করতে পারে না এমন আর্থরাইটিস। মেয়েদের দূরে দূরে বিয়ে হয়েছে। ছেলেদের একটাও কাছে থাকে না, ওই দিদার ভয়ে। বুড়ো-বুড়ি দুজনেই প্রচণ্ড সেকেলে, শুচিবেয়ে, আর প্রচণ্ড ফরমাশ করতে পারে। এই গৌতম, শুনছিস?'

গৌতম বলল, 'শুনছি। কিন্তু তোদের ফ্যামিলির কেচ্ছা শুনে আমার কী হবে। বল!'

'আঃ, শোনই না। কেচ্ছা করছি না। ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা বললুম। আমি কী করলুম জানিস তো! তোষণ নীতি নিলুম।'

'কী নীতি ?'

'তোষণ, তোষণ ! যার যা দরকার হচ্ছে। এ কাকিমার ঝুলঝাড়া দরকার, ও বউর্টা ফুলঝাঁটা পাচ্ছে না, এ দাদা সময় পাচ্ছে না বউদিকে ডাক্তার দেখিয়ে আনতে। ও জেঠি কল্পতরু উৎসবে যাবার ইচ্ছে , সব করতে লাগলুম। সব। স-ব। আর মেজদাদুর এইস সেবা লাগালুম না ! একেবারে তাক লেগে গেল। আর সমানে ছোড়দিদার পেছনে লেগে রইলুম। এ ডাক্তার আনি, ও মালিশ আনি, উপোস করে বারাসত থেকে কবরেজি ওষুধ, তার আচার-বিধি বলব কি গৌতম বছর খানেক প্রাণ একেবারে বেরিয়ে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে সব বেরুলো। সববাইকে এক ধার থেকে হাত করে নিয়েছি। মেজদাদু তো ঘেঁটু বলতে অজ্ঞান। আমিও তো এখন রীতিমতো শেয়ার খেলছি রে ! পারছি। লাভ হচ্ছে। তবে খুব খেয়াল রাখতে হয়। তবে মনে করিসনি আমি ভোগা দিচ্ছি। মেজদাদু আর ছোড়দিদা সত্যি অসহায় লোক। আমার বড্ড কষ্ট হত রে ওদের জন্যে। বাড়িখান কিরকম তাক লাগাবার মতো করে ফেলেছি দেখেছিস।'

'তা তো দেখছি। কিন্তু এ বাড়িটা। টাকা বার করবার মতো অতগুলো পকেট, অসহায় দাদু দিদা এগুলোও তো তোর ছিল, এগুলোই তো তোর ক্যাপিট্যাল।'

ভেঙ্কট গম্ভীর ভাবে বলল, 'মোটেই এসব ক্যাপিট্যাল নয়। আসল হল এই দিলটা। দিলটা কে এমন খুলে দিলে বল তো ! বলতে পারবি না তো ? রাজেশ্বরী।'

গৌতম হেসে ফেলে বলল, 'এখনও তুই রাজেশ্বরীর পেছনে সেঁটে আছিস।'

'তুই তাই দেখলি ? সেঁটে আছি ! মেয়েটাকে দেখে মাইরি আমার কেমন একটা মহাভাব হয়। বিরাট বিরাট স্কেলে চিন্তা করি। বিশাল বাড়ি, বিরাট গাড়ি, অজস্র টাকা, প্রচুর খরচ করার মতো দিল।'

'তুই কি বাড়িটাকে ওর উপযুক্ত করবার চেষ্টা করে যাচ্ছিস ? ভেঙ্কট বাড়ি, বংশ, টাকাকড়ি এই-ই সব নয়। ধর এসব সত্ত্বেও যদি ওর তোকে পছন্দ না হয় ?'

'আরে দূর। পছন্দ তো হবেই না, ওর থেকে তো আমি বেঁটে। আমিই বা কোন লজ্জায় একটা নিজের থেকে লম্বা মেয়ের পাণিপ্রার্থী হব বল ! চিরকাল পেছন পেছন হাঁটতে হবে।'

'তাহলে ?'

'আরে ও হচ্ছে আমার জীবনে প্রথম ইনসপিরেশন। ও অনেক উঁচুতে। দেবী। শী ইজ এ গডেস। সব কিছু ওর বড় মাপের। আমি যদি আর্টিস্ট হতুম তো ওর ছবি আঁকতুম, মূর্তি গড়তুম, লেখক হতুম তো কবিতা লিখতুম। তা এসব গুণ তো আমার কিছু নেই, আমি নিজের জীবনটাকেই বিরাট করে গড়ি। মানে,' একটা লজ্জা পেয়ে ভেঙ্কটেশ বলল, 'বিবেকানন্দ-টন্দর মতো বিরাট নয় এই আমি যা পারি, আমাকে যা মানায়···ধুর আমি ঠিক এক্সপ্লেন করতে পারছি না ইয়ার।'

গৌতম খানিকক্ষণ হাঁ করে ভেঙ্কটের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে গিয়ে ওর মাথাটা টিপেটুপে দেখতে লাগল।

'কী করছিস, এই কী করছিস ?'

'দেখছি শালা, তোর খোপরিটা নরম হয়ে গেছে কি না।'

'হ্যাঁ ঠিক ধরেছি। ব্রহ্মতালুর কাছটা বহুৎ নরম। তলতল করছে।'

'ভেঙ্কট বলল, 'ঠিক আছে তুই রাবড়িটা খেয়ে নিয়ে পড়। এই ভেঙ্কট থাকতে তুই ভবিষ্যতের কথা ভাবা ছেড়ে দে। মন দিয়ে পড় দিকিনি গৌতম !'

'আর তুই ? তুই পড়বি না ? তোর পরীক্ষাটা কি রাজেশ্বরী দিয়ে দেবে ?'

'আহা হা, যখন তখন কি দেবী-নাম করতে আছে ? পড়ব, পড়ব, এখন একটু দিবাস্বপ্ন দেখি।' বলে ভেঙ্কট আবার আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে আস্তে আস্তে পা নাচাতে লাগল।

কে জানে কেন গৌতমের মনের ভেতরের জমাট মেঘ, কুয়াশা সব একটু একটু করে কেটে যেতে লাগল। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশনের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল।

সন্ধে হলে পট পট করে আলোগুলো জ্বেলে দিল ভেঙ্কট। তারপর গৌতমের পাশে চেয়ার টেনে বসে পড়ে বলল, 'এই গৌতম, আর কতক্ষণ পড়বি। অল ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে ?'

গৌতম বই বন্ধ করে দিল। হাতের পেনসিলটা রেখে দিল। হতাশ গলায় বলল, 'নে, খেল, কি খেলবি।'

'খেলব না বলব। সোশ্যালটা কনডাক্ট করল কী রকম ? বক্তৃতা দিল কী ! দুর্দান্ত বল ? তারপর ডান্সড্রামা, নাটক সব ওর নিজের পরিচালনা। কিন্তু কিরকম সংযম দেখ ! অত ভালো গাইতে পারে, একটি গানও গায়নি। পরিচালনা করছে তো ! অন্যরা তো এটা ওটা করবার জন্যে ঠেলাঠেলি। হুড়োহুড়ি। ও দেখ কা-ম। অন্য মেয়েগুলো সোশ্যালে এসেছে প্রজাপতির মতো সেজে। ও দেখ, লাল পাড় গরদের শাড়ি। খোলা এত খানিক চুল। দুর্দান্ত, একেবারে দেবী দুর্গা।'

'লক্ষ্মী হলে তোর সুবিধে হত !'

'কেন ? ও। আরে তোকে তো আগেই বলেছি, আমি ও লাইনে নেই। ভোটে জিতে কিরকম রেজিগনেশন দিল ? বন্ধুর কষ্ট হল দেখে। জাস্ট এই। কী মহাপ্রাণ দেখ মেয়েটা। তারপর উজ্জয়িনীর বাড়ি গান গাইল ? আহা ক্যয়সে ভঁরু গা গরিয়া। মনে আছে গানটা ? আর পন ঘট পে নন্দ লালা, লতার গলায় শুনেছি একরকম। ওর গলায় গানটা যেন একেবারে অন্যরকম হয়ে এলো।'

'লতার চেয়ে ভালো ?'

'সত্যি বলব ? আমার কাছে লতার চেয়েও ভালো লেগেছে।. কী দরদ।'

গৌতম বলল, 'চল একটু রাস্তা থেকে ঘুরে আসি। ঘরটা ভ্যাপসা লাগছে।

হেদুয়া পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে, বেশ কয়েকটা পাক দিয়ে রাত আটটা বাজলে ফিরতে লাগল দুজনে। ভেঙ্কট বলল, 'তুই রাত্তিরটাও আমার বাড়ি থেকে যা না গৌতম। তড়কা রুটি কিনে আনব। খাওয়া হয়ে যাবে। ভোর বেলা উঠে পড়তে পারবি।'

'তুই তো সারা রাত রাজেশ্বরী রাজেশ্বরী করবি। ঘুমোব কী করে ?'

ভেঙ্কট বলল, 'এই দেখ, প্রমিস করছি প্রমিস। তুইও পড়বি। আমিও পড়ব। চল মাইরি চল।'

গৌতম বলল, 'না, আজ নয়। আরেক দিন। আরেক দিন।'

গৌতম বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। ভেঙ্কটও তারই মতো সাধারণ। তবু ভেঙ্কটের কত আছে। সবচেয়ে বড় কথা, স্বপ্ন আছে। গৌতমের তা-ও নেই। তবলটা ভালো খেলত হাতে। কিন্তু যেই একটু এদিক-ওদিক যেতে শুরু করেছে বাজাতে, বাড়িতে "নো" হয়ে গেল। সে ভেঙ্কটের মতো কিছু দিয়ে নিজেকে ভোলাতে পারে না। যতই দিন যাচ্ছে, কঠিন কঠোর বাস্তব তার চোখের সামনে, পায়ের তলায় কঠোরতর, রূঢ়তর হয়ে দেখা

দিচ্ছে। এই পৃথিবীতে, সরু গলির একতলার ঘরে, আইবুড়ো দিদি, নিজেদের স্বতন্ত্র আস্তানা করার সংকল্পে মুখে রক্ত উঠিয়ে খটিতে থাকা দাদা-বউদি, বুড়িয়ে যাওয়া বাবা-মা, আর উঠতি ইংলিশ-মিডিয়ামে পড়া পাকা ভাইপো নিয়ে সে গৌতম একদম একটা জেলখানায় বন্ধ হয়ে গেছে। সে এখানে থাকবে না। কোথাও চলে যাবে। কিন্তু বাবা-মার কী হবে ? মা, মা বেচারি বড় খোকা অন্ত প্রাণ, সব ঝড়-ঝাপটা থেকে খোকাকে বাঁচাতে মা এক পায়ে খাড়া। কী রকম বুড়িয়ে গেছে মা, যেন একতাল কাদা নিয়ে কে যেমন খুশি তেমন ভাবে থেঁতলে গেছে। ওই তো উজ্জয়িনীর মা-ও তো মা ! তার মায়ের থেকে এমন কিছু ছোট হবেন না। কিন্তু কী সতেজ, কথাবার্তা চলা-ফেরা স-বই আলাদা। তার মায়ের এক সময়ে সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল। এদেশে সবাই ফর্সা মেয়ে খোঁজে। হরিসাধন মাস্টারমশাইয়ের বাবা-মাও তাই খুঁজেছিলেন। মার অল্প বয়সের ছবি দেখলে এখনও বারবার খুলে দেখতে ইচ্ছে করে। বেশি কথা কি। সেই মায়ের স্মৃতি গৌতমের ছোটবেলার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু সেই মা যেন উজ্জয়িনীর মার কাছে হেরে গেছে। সুদ্ধু পয়সার অভাবে। কিভাবে উঠবে গৌতম ? কিভাবে ? মাথার ওপরে একটা বিরাট পাহাড়ের বোঝা, এই বোঝা নিয়ে কি গৌতম কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে ? তার মায়ের সঙ্গে যদি ডক্টর রজত মিত্রর বিয়ে হত, আর উজ্জয়িনীর মার সঙ্গে তার বাবার। তাহলে উজ্জয়িনীর জায়গায় আজ সে ! কে এই নির্বাচনগুলো করে, কিভাবে এগুলো হয়, কোনও নিয়ম মেনে, না একেবারে দৈবাৎ, সবই দৈব ! ভাগ্য !

একটু তাড়াতাড়িই গৌতম কোচিং-এ চলে গেল আজ। আজ ভেঙ্কটের বাড়ি যায়নি সে। সকালবেলা চান খাওয়া করতে দেরি হয়ে গেল। বাড়িতে প্রচণ্ড ঝগড়া। দাদা-বউদি বরানগরের ফ্ল্যাটে চলে যাবার কথা ঘোষণা করতেই দিদি ক্ষেপে লাল। এই বাড়িতে তাকে. ওই ঘরখানাকে এক্সপ্রপ্রয়েট করে সুখ কিনেছে দাদা-বউদি। ভাবতে গেলে কথাটা মিথ্যে নয়। বৈঠকখানা ঘরটাকে সকাল থেকে রাত্তির অবধি আটকে রেখেছে দাদা-বউদি। বাবা ক্রমশ ছাত্র কমিয়েছেন। শোবার ঘরে পড়ান। দিদি বলছে সে-ও তো কোচিং করে কিছু রোজগার করতে পারত, ঘরটা আগলে রেখে সে পথও বন্ধ রেখেছে দাদা-বউদি। বউদি বলেছে 'ভারি তো ইংলিশ। ও আজকাল আর কেউ পড়ে না, আর যায় কোথায় দিদি হেঁচে, কেশে, কেঁদে একসা। দিদিটা বরাবরই ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। ওইতেই ওর সব গেল। দিদির যে ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল অলকদা। খুব মজাদার লোক ছিলেন। একদিন দিদি ঘর থেকে বাইরে যাচ্ছে লম্বা আঁচলটা খাটের কোনায় আটকে গেছে, অলকদা বললেন, 'রিনি তোমার ল্যাজটা ফেলে যাচ্ছ কোথায়।' বাস দিদি সেই যে ঘরে দোর দিল, কিছুতেই অলকদাকে বিয়ে করল না। অনেক সাধ্য-সাধনা করে শেষ পর্যন্ত অলকদা কালো মুখে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, যাবার সময় গৌতমকে বললেন, 'সেন্স অফ হিউমার নেই এমন মেয়ের সঙ্গে কখনও ভাব করো না।' দিদির ওপর কথা বলবার সাহস তখন গৌতমের ছিল না। তার দাদা বলেছিল, 'রিনি, ভুগবি। শুধু শুধু অত ভালো ছেলেটাকে ফেরালি ?'

'অত ভালো ছেলে ?' দিদি ফোঁস করে উঠেছিল, 'আমার আঁচল একটু লম্বা পরার অভ্যেস, যখন-তখন বলবে বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি। এটা আমার হাইটের প্রতি কটাক্ষ না ?' দিদির চার ফুট দশ ইঞ্চি হাইট। মুখখানা অতি সুন্দর, মায়ের মতো। কিন্তু ওই হাইট নিয়ে কী কমপ্লেক্স। অলকদাও না বুঝে ওর দুর্বল জায়গাতেই আঘাত

দিলেন বারবার। এখন দিদির সেই সুন্দর মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। রঙ জ্বলে গেছে। মুখে হাসি দেখা যায় না। সারা দিন ঘরের কাজ করছে। মায়ের সঙ্গে। বউদি কোন কিছুতেই হাত লাগায় না। তার পর দুপুরে স্কুল করবে। দিদিটা সত্যিই বেচারি। বাবা-মার দায়িত্ব ছোট বোন আর ভাইয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে স্বার্থপরের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে দাদা—এই বলে দিদির কী চিৎকার! বাবা বললেন, 'আমাদের কাউকে দেখতে হবে না। নিজেদের দেখো।' মা বললে, 'বিয়ের সময়ে কি ভাবে তোমাকে এ-বাড়িতে গ্রহণ করা হয়েছিল সে কথা কী করে ভুলে গেলে বীথি।' দাদা বলল, 'মাসে মাসে তিনশ' করে দেব।' বউদি বলল, 'আমাকে কত দিতে হবে বলুন, বিয়ের সময়ে গ্রহণ করেছিলেন যখন…।' সে এক তুলকালাম কাণ্ড। মাথাটা গরম হয়ে গেছে। দিদি শেষকালে বলল, 'কী রে খোকা! তোর কবে পাখা গজাবে? তুই কবে পালাবি?' গৌতম বলেছিল, 'এত চেঁচামেচি করলে এক্ষুনি।'

হঠাৎ গৌতম দেখল সারের বাড়ি থেকে পুলক বেরিয়ে আসছে। গৌতমকে দেখে পুলক দাঁড়িয়ে গেল। গৌতম বলল, 'পুলক, তুমি এখানে?'

'আমি তো সারের কাছে টুইশন নিচ্ছি,' পুলক চোরের মতো হেসে বলল, তারপর যোগ করল, 'সার হেভি সেন্টিমেন্টাল বুঝলি? আমি তো পরদিনই গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। বাস তখন থেকেই পড়ান। আলাদা। কিন্তু কিছুতেই আর টাকা নেন না! কী লজ্জা বল তো! বলবেন, তোকে ভালোভাবে অনার্স পাইয়ে দেওয়াটা আমার চ্যালেঞ্জ। যদি টিচিং লাইনে যেতে পারিস, এই ঘটনাগুলো মনে রাখবি।' পুলক হাসল, 'একদম ফোকটিয়া, ওইরকম স্পেশ্যাল কোচিং…ভাবতে পারিস? তবে জানিস, আমারও একটা যেন ওবলিগেশন এসে গেছে। ভালো রেজাল্ট আমাকে করতেই হবে। নয়তো সারের কাছে মুখ থাকবে না।'

গৌতম শুধু বলতে পারল, 'তাজ্জব!'

'যা বলেছিস!' পুলক মন্তব্য করল।

হঠাৎ গৌতম অনুভব করল পুলকের মতো অভদ্র হতে পারাটাও একটা পারা। একদিনের দুর্ব্যবহারের সূত্র ধরে পুলক দিব্যি পৌঁছে গেল সারের অন্তঃপুরে। সেই শত্রুভাবে ঈশ্বরভজনার মতো। সে তা-ও পারেনি। সে ঘরেও নহে, পারেও নহে, তার কী ভবিষ্যৎ!

১৫

'একটু চলো না প্লিজ…'

পার্ট ওয়ান শেষ হতে না-হতে ঋতু সুটকেস গুছিয়ে তৈরি। দাঁতে নখ কাটতে কাটতে বলল, 'মিঠুকে ফোন করে দিয়েছি, কদিন মিঠুর বাড়ি থাকব।'

'সে কিরে?' অজিত দাশ অবাক হয়ে ঋতুর মুখের দিকে চাইলেন।

'আমার বোর লাগছে। এক ঘেঁয়ে একই জায়গা।'

সোমা কদিন ছিল বলল, 'মা, তুমি তো জানো ও আমাকে সহ্য করতে পারে না। কেন শুধু-শুধু জোর করে আমায় রাখছ!'

'ওর পছন্দ হচ্ছে না বলে তোকে আমি ছেড়ে দিতে পারি? তুইও আমার মেয়ে।

তোরও এ বাড়িতে সমান অধিকার ! ছি ছি, অ্যাত্তো অসভ্য !'

অজিত বললেন, 'আহা আগে থেকেই অসভ্য-অসভ্য করছ কেন ? ছেলেমানুষ, ইচ্ছে হয়েছে বন্ধুর বাড়ি ঘুরে আসতে গেছে। একটু ছুটিও তো দরকার।'

ক'দ্দিন ছেলেমানুষ থাকবে শুনি ? আমরা যখন সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে বাড়ি এলুম তখনও তো ও ওইরকম সুটকেস দুলিয়ে চলে গিয়েছিল ? যেন কিছুই না ! আমরাও যেন কেউ নই ! চমৎকার ! এরপর কোনদিন বলবে, মা, বাপী আসছি, এখানে আর ভালো লাগছে না, চললুম ফর গুড।'

অমিত বাইরে লিভিং রুমে বসেছিল। তার পারিবারিক কথাবার্তার মধ্যে থাকতে একটু অসোয়াস্তি হচ্ছিল। সে এই সময়ে উঠে বারান্দার দিকে গেল। অজিত বললেন, 'রিট্রীট করাই ভালো মনে হচ্ছে, কি বল সোমা !'

সোমা একটু ফিকে হাসল।

ঋতু প্রথমে ভেবেছিল উজ্জয়িনীদের বাড়িতে যাবে। কিন্তু ওর বাবার দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকার স্মৃতি যেন ও বাড়িতে গেলেই মনে পড়ে যায়। সে দেখে এসেছিল। উঃ কি বিশ্রী, মুখটা বেলুনের মতো ফুলে গেছিল, জায়গায় জায়গায় পোড়া দাগ। সাদা মুখটা ছাড়া আর সবই চাদর দিয়ে ঢাকা। সেই সুন্দর, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বটা নষ্ট হয়ে গেছে। একেবারে। ঋতুর কোনও ইচ্ছেই করত না আর ও ভদ্রলোককে দেখতে। কিন্তু উজ্জয়িনীদের ফ্ল্যাট দুটো এত বিশাল ! এত কম মানুষ থাকে। আর এত শৃঙ্খলা, যে গেলে বোঝাও যেত না ওখানে একজন শয্যাশায়ী মরণাপন্ন রোগী আছে। কিন্তু তবু কেমন একটা বিতৃষ্ণা, ভয়। সে যেতে পারল না। অগত্যা মিঠু।

মিঠু সিঁড়ি টপকে টপকে নামতে নামতে হাসি মুখে ওর সুটকেসটা নিল। বলল, 'এত কী এনেছিস রে ? বেশির ভাগই তো আমার ড্রেসেই চলে যেত !'

ঋতু বলল, 'আমি অন্য কারো জিনিস ব্যবহার করতে পারি না মিঠু, ঘেন্না করে।' মিঠু একটু আঘাত পেয়ে চুপ করে গেল। মিঠুর আলাদা ঘর। বেশ বড়। পড়ার টেবিল। ওয়ার্ডরোব। বইয়ের শেলফ। ঘরের দেয়ালে ওর মার আঁকা মিঠুর পোর্ট্রেট। বিভিন্ন বয়সের। একটা ফ্রেমের মধ্যে বাঁধানো। একটা ল্যান্ডসকেপ। খুব সুন্দর। খোলামেলা ঘরটা। ঋতুর ঘরটা যেন কেমন চারদিক থেকে বন্ধ। একদিকে শুধু জানলা, সেটা পশ্চিম। বিকেলের দিকে পড়ন্ত রোদ আসে।

মিঠু বলল, 'চল আমরা ছাতে যাই।'

মিঠুদের ছাত থেকে আমীর আলি অ্যাভিন্যু-এর অনেকটা দেখা যায়। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-প্রাইভেট গাড়ি চলছে। মিঠু খুব ছাতে পায়চারি করতে ভালোবাসে। সে ছাতেই কাটায় গ্রীষ্মের সন্ধেগুলো। পাঁচিলের কোণে কোণে কিছু ফুলগাছ আছে। ঋতু খানিকটা বেড়িয়ে বলল, 'তুই খালি বোঁ বোঁ করে ঘুরছিস কেন ? দাঁড়া না একটু।'

'তোর ভালো লাগে না ? দাঁড়া আমি চেয়ার বার করি।' ছাতের ঘর থেকে মিঠু দুটো বেতের ঝুড়ি-চেয়ার বার করল। যতই সন্ধে গাঢ় হয়, ততই তার মুড আসে। সে গান গাইতে থাকে একটার পর একটা। আজ বাবা মা কোনও বন্ধুর বাড়ি গেছেন। দাদা গেছে একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে ব্যাঙ্গালোর। ফ্রিজের মধ্যে রান্না করা খাবার আছে। সে শুধু দুজনের মতো রুটি করে নেবে। কিন্তু ঋতু সারাক্ষণ চুপ। ঋতুকে এত চুপচাপ থাকতে সে কখনও দেখেনি। অবশেষে সে বলল, 'ঋতু, কী হয়েছে রে ? কথা বলছিস না, হাসছিস না।'

'কি আবার হবে ?' ঋতু মৃদু স্বরে বলল।

'উজ্জয়িনীদের কী বিপদ হল বল তো !'

'বিপদের কী আছে ? এক হিসেবে ভালোই তো হল। স্ক্যান্ডাল-এ কান পাতা যেত না তো !'

'তাই বলে এরকম হবে ? উজ্জয়িনীটার মুখের দিকে তাকানো যায় না। কিরকম বদলে গেছে।'

'আমার তো মনে হয় ও সব ভান। মনে মনে খুশিই হয়েছে।'

'য্যাঃ, ওরকম বলতে আছে ! বাবা তো ! ওইসব রটনা সত্যি নাও তো হতে পারে।'

'সত্যি নয় ? তুই ওই আনন্দেই থাক। তবে হ্যাঁ, ভদ্রলোকের ক্ষমতা ছিল স্বীকার করতেই হবে। জীবনটাকে যেভাবে চেয়েছেন ভোগ করে গেছেন।'

একজনের বাবার সম্পর্কে এইরকম কথায় মিঠু একটু আহত হল। ঋতু মন্তব্য করল, তুই স্কুল-গার্ল আছিস এখনও। হয় সত্যি সত্যি ইম্যাচিওর, নয় ভান করিস।'

'ভান ? কী ভান করব ?'

'বাজে কথা বলিস না মিঠু তোর বয় ফ্রেন্ড কটা !'

'বন্ধুদের মধ্যে ছেলেও আছে, পাড়াতে, কলেজে, কিন্তু ঠিক বয়-ফ্রেন্ড বলতে যা বোঝায় তা তো এখনও...তোর ? তোর আছে ?'

'আমায় কেউ স্টিমুলেট করতেই পারে না। ভ্যাদভেদে, ম্যাদামারা সব।'

'তুই কি তার জন্যে খুব ওয়ারিড ? দেখ, আমাদের বন্ধুদের কারোই সে ভাবে বয়-ফ্রেন্ড নেই।'

'কেন, প্রিয়া ? ও তো ওই তন্ময় বলে চশমা-পরা ছেলেটার সঙ্গে অনেক দিন ঘুরছে।'

'ধ্যাঃ, ওদের মধ্যে কিছু নেই। জাস্ট ফ্রেন্ডস।'

'তোর খালি য্যাঃ আর ধ্যাঃ, বলছি ওরা স্টেডি যাচ্ছে, আর ইমনের তো এত বয়ফ্রেন্ড যে হাতে গোনা যায় না।'

'কী বলছিস ? ইমনের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা, কখনও বলে নি তো !'

'এসব আবার কেউ কাউকে বলে না কি ? চুপি চুপি চালায়।'

'বয়-ফ্রেন্ড থাকাটা কী খুব খারাপ তোর মনে হয় ? এতে অন্যায়ের কী আছে ?'

'ঋতু বলল, 'চল এবার নিচে যাই। খিদে পেয়ে গেছে।'

ওরা খাচ্ছে এমন সময় মিঠুর বাবা-মা ফিরলেন, সাদেক বললেন, 'কী ঋতু। কোনও অসুবিধে হয়নি তো !' ঋতু সজোরে মাথা নাড়ল'। মাসি মিষ্টি মশলা নিয়ে এসেছেন। বললেন, 'কাল সকাল থেকেই একজন খুব ইনট্‌রেস্টিং মানুষ আসছেন, সারা দিন থাকবেন।'

'কে মা ?' মিঠু বলল।

'কে, আন্দাজ কর।'

'আমি আন্দাজ করতে পারছি না। তুমি বলো।'

'আজ যেখানে গিয়েছিলুম শফিউলের বাড়ি। ওইখানেই দেখা হয়েছে।'

'তাহলে কি পার্থপ্রতিম ?

সাদেক বললেন, 'রাইট।'

অমিত য়ুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছে, পেছন থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এলো মিঠু,

'অমিত ! অমিত !'

অমিত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, 'কী ব্যাপার ?'

ঋতু আজকে একটা হালকা বেগনি রঙের শিফন শাড়ি পরেছে, তাতে বাদলার কাজ। মুখে চোখে প্রসাধন নেই। চুলটা একটা আলগা ঝুঁটি বাঁধা। সে দৌড়ে এসে অমিতের হাত ধরল। বলল, 'ভীষণ দরকার আছে। চলে কোথাও যাওয়া যাক।'

অমিত বলল, 'আমি বাড়ি ফিরছি ঋতু, দেরি হলে অনর্থক সবাই ভাববে।'

'তুমি কি ক্রীতদাস ? না জাস্ট একটা মেল ডল ?'

অমিত বলল, 'কোথায় যেতে চাও ?'

'ট্যাক্সি, ট্যাক্সি', ঋতু একটা ট্যাক্সি থামিয়ে ফেলল। নিজে উঠে পড়ে অমিতকে ডাকল, 'এসো।'

অমিত উঠে পড়তেই ঋতু বলল, 'পার্ক স্ট্রিট।'

'পার্ক স্ট্রিটে কোথায় যাচ্ছ ঋতু, আমার কাছে খুব বেশি টাকা নেই কিন্তু।'

'ঠিক আছে রাসেল স্ট্রিটে চলো, আইসক্রিম পার্লারে।'

দুজনে পিৎজা নিয়ে বসেছে। 'দাঁড়াও একটু আসছি' অমিত চলে গেল। একটু পরে এসে বসতে ঋতু বলল, 'কোথায় গিয়েছিলে ?'

'বাড়িতে ফোন করে দিলুম একটু দেরি হবে বলে।' ঋতুর মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করছে।

'বলো ? কী দরকার ?' অমিত জিজ্ঞেস করল।

ঋতু বলল, 'কিচ্ছু দরকার নেই। জাস্ট বোর লাগছিল তাই।'

'তাই ওরকম উন্মাদের মতো রাস্তা থেকে আমাকে ধরে নিয়ে এলে ?'

'তোমার আমাকে দেখতে ইচ্ছে করে না ! এতদিন বাড়ি নেই, খারাপ লাগে না।'

'খারাপ লাগলেই বা করছি কী ? মা বাবা সোমা সকলেই তো আপসেট !'

'অন্যদের কথা শুনতে চাই না। তোমার নিজের কথা বলো অমিত ! আমাদের সেই দিনগুলো কী সুন্দর কাটত, বলো, আড্ডা, সিনেমা, থিয়েটার, প্লিজ, আমার কোনও বন্ধু নেই আমাকে নিয়ে একটু নন্দনে চলো না অমিত কাল ! সতী এসেছে। একটু আমায় ফিল্ম দেখতে নিয়ে গেলে কী হয় ?'

অমিত ইতস্তত করে বলল, 'সোমাকে বলি, তিনজন যাব।'

'সোমার সঙ্গে আমি যাব না।' ক্রুদ্ধ স্বরে ঋতু বলল।

'সোমার সঙ্গে তোমার এত কিসের রেষারেষি ঋতু ? শী ইজ এ পার্ফেক্টলি আন্ডার স্ট্যান্ডিং অ্যান্ড অ্যাকমোডেটিং গার্ল !'

'শী ইজ এ পার্ফেক্ট বিচ্।'

'ঋতু !'

'হোয়াট রাইট ডিড শী হ্যাভ টু মীট য়ু ফার্স্ট !'

অমিত নিশ্চল হয়ে গেল।

'হোয়াই কান্ট আই হ্যাভ দা কম্প্যানি অফ দা ফ্রেন্ড আই লাইক বেস্ট !'

ঋতুর চোখ দিয়ে গরম জল পড়ছে।

'শোনো শোনো ঋতু' নরম গলায় অমিত বলল, 'বাড়ি ফিরে চলো। আমরা সবাই কত্ত মজা করব।'

'আই অ্যাম নট আ কিড', ঋতু বলল। সে রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া ঢুকছে, সঙ্গে আর একটি মেয়ে, দুটি যুবক। বিষ্ণুপ্রিয়া সেজেছে কিন্তু মুখট

শুকনো।
'হাই প্রিয়া, মীট মাই ফ্রেন্ড অমিত।' ঋতু বিষ্ণুপ্রিয়াকে টেনে এনে অমিতের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।
অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে আলাপ করল অমিত।
'প্রিয়া কে রে ওরা তোর সঙ্গে ?'
'আত্মীয়-স্বজন' বলে শুকনো মুখে বিষ্ণুপ্রিয়া ওদিকে চলে গেল।
অমিত তার আইসক্রিম পুরো শেষ না করেই উঠে পড়ল। 'ঋতু তুমি আসবে তো এসো। আমি কিন্তু চললুম।'
ঋতুকে মিঠুদের বাড়ি নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল অমিত।
ঋতু সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, পার্থপ্রতিম নামছেন। মাথায় এক রাশ বাদামি চুল। খোদাই করা মুখ। একটু ভারী ছেলেমানুষি ভরা টলটলে চোখ। চেহারাটা দোহারা। বাফতার পাঞ্জাবি গায়ে এই গরমেও।
'বাঃ, ভারি সুন্দর ফিগার তো তোমার ? মিঠুর বন্ধু না ?'
ঋতু জীবনেও কখনও এমন কথা শোনেনি। 'বেশ দেখাচ্ছে', 'ভারী মিষ্টি মুখ' এসব শোনা যায়। কিন্তু একজন বয়স্ক পুরুষ তার মতো একজন উদ্ভিন্নযৌবনাকে 'ভারি সুন্দর ফিগার' বলে অভ্যর্থনা করবেন। এরকমটা আগে কখনও তার অভিজ্ঞতায় হয়নি।
একটু লজ্জা পেয়ে, কোনও জবাব না দিয়েই সে ওপরে উঠতে লাগল।
পার্থপ্রতিম যেদিন এসেছিলেন সেদিন সে ব্রেকফাস্ট খেয়েই তার নাচ ক্লাসের এক বন্ধুর বাড়ি কাটিয়ে এসেছিল। একে অন্যের বাড়ি। তাতে অন্য একজন অতিথি, সর্বোপরি তার মেজাজ একেবারেই ঠিক নেই। ওপর থেকে মিঠু বলল, 'এর কথাই তোমায় বলছিলুম কাকু, আমাদের দুজনকেই নিয়ে যাবে ?'
ঋতু বলল, 'কোথায় ?'
'কাকু কলকাতা সিরিজ আঁকতে নানান জায়গায় যাবে। আমরাও যাব। কখনও কখনও মা-বাবাও যাবে। পিকনিক হবে, মজা হবে।'
পার্থপ্রতিম নামতে নামতে বললেন, 'শুধু গেলে হবে না, আমার কাজে সাহায্য করতে হবে। এই শর্ত।'
'তোমার শর্ত মানছি।' মিঠু চেঁচিয়ে বলল।
কিন্তু পার্থপ্রতিম পরদিনই কী জরুরি কাজে দিল্লি চলে গেলেন। সারা গ্রীষ্ম আর আসতে পারলেন না। বর্ষার মেঘ ঝমঝমালো, তখন কাদার কলকাতায় পার্থপ্রতিম আবার।
'অমিত, অমিত' ঋতু ছুটতে ছুটতে আসছে। সে বাড়ি ফিরে এসেছে। কতদিন আর বন্ধুর বাড়ি থাকা যায় ? বিশেষ করে ওইরকম স্কুলগার্ল মনোভাব-বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে ? কোনও ভাব-বিনিময়ই মিঠুর সঙ্গে হয় না, তার তার কথা শুনে শিউরে শিউরে ওঠে মিঠু। আরও যাতে শিউরোয় তাই আরও বৈপ্লবিক মতামত দেয় সে, মিঠু একেবারে চুপ হয়ে যায়।
বাড়ি এসে ঋতু মোটের ওপর স্বাভাবিক ব্যবহার করছে। মা আর সোমার শরীর খারাপ বলে কোথাও বেড়াতে যাওয়াও হল না। কিন্তু ঋতু সেটা মেনে নিয়েছে। সে খাওয়া-দাওয়া করে, নাচস্কুলে যায়, ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছে, এখন গুরুদেবের কাছে আলাদা করে শিখছে। লাইব্রেরি ওয়ার্ক করতেও সে আর্ধেক দিন বেরিয়ে যায়। কিন্তু

ভীষণ চুপচাপ। কারুর সঙ্গেই বিশেষ কথা বলে না। গত বছর মে মাসে সোমা একটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। নার্সিং হোম থেকে সে সোজা নিজের বাড়ি চলে যায়। হাজার অনুরোধেও মা-বাবার কাছে আসেনি। এখন সোমা আবার সন্তানসম্ভবা। কিন্তু দু চারদিন থেকে সে ফিরে গেছে। ঋতুদের বাড়ি ফাঁকা। সেই বাবা-মা মেয়ে। সারা গ্রীষ্ম ঋতু শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ে। মাঝে মাঝে মিঠুর ফোন আসে। উজ্জয়িনীকে সে নিজেই মাঝে মাঝে ফোন করে। বাস।

'অমিত, অমিত', 'ছুটতে ছুটতে আসছে ঋতু। আকাশে শেষ জুলাইয়ের নীল মেঘ। মুখ ভার করে আছে। ঋতু একটা পাতলা খাদির সালোয়ার কুর্তা পরেছে। তার উড়নিটা পেছন দিকে উড়ছে। ঋতুর মুখে প্রসাধন নেই। পাণ্ডুর একটা গোলাপি রং তার খুব প্রিয়, এই রঙের লিপস্টিক সে প্রায় সব সময়ে ব্যবহার করে। আজ ঠোঁট রং হীন। তাকে তাই খুব বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

'অমিত'—অমিত দাঁড়িয়ে পড়েছে আজকাল তার,য়ুনিভার্সিটি থেকে ফেরাবার সময় রোজই ভয় হয়। এক্ষুনি পেছন থেকে দৌড়ে এসে তাকে ধরবে ঋতু। ঋতুর এই ডাকের সঙ্গে, ঋতুর জেদের সঙ্গে, 'অমিত আমাকে নিয়ে একটু, রবীন্দ্রসদন চলো না, জাস্ট বেড়াব' এই প্রার্থনার সঙ্গে ক্রমশই জড়িয়ে পড়ছে অমিত। সে প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে অবাঞ্ছিত এই টান। কিন্তু ঋতু দয়াহীন, তাকে অনুসরণ করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে। দৌড়ে এসে তার কনুইয়ের কাছটা ধরেছে ঋতু, ফ্যাকাশে মুখ, 'অমিত আজকে আমরা কোথায় যাবো ?'

'কোথাও না, এখন বাড়ি যাব ঋতু', সামান্য কঠোর হতে চেষ্টা.করে অমিত।

'সোমার ফিরতে এখন অনেক দেরি। একটু চলো না প্লিজ।'

'ঋতু, ঋতু, সোজা হয়ে বসো, প্লিজ, আমার লাগছে।' অমিতের গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

ঋতু সোজা হয়ে বসল।

নন্দনের সামনে। ভেতর দিয়ে শিশির মঞ্চ, তথ্যকেন্দ্র, আবার ঘুরে নন্দন আর রবীন্দ্রসদনের মাঝখানে একটা জায়গা দেখে বসেছে ঋতু। অমিতকে টানছে বসবার জন্য। একটা সিগারেট ধরিয়েছে অমিত। সে বেশি খায় না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ন খেয়ে সে থাকতে পারছে না।

'ঋতু তুমি যা করছ ঠিক করছ না।'

'হু কেয়ার্স।'

'এর ফল খুব খারাপ হতে পারে ?'

'কার পক্ষে ?'

'কার ? আমার, তোমার, সোমার, সবার পক্ষে।'

'অমিত, তোমাকে ছাড়া আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না, বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। অমিত, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল অমিত। তারপর বলল, 'এর তো কোনও কিনারা নেই ঋতু। কোনও কূলকিনারা নেই। তুমি একটা বাচ্চা মেয়ে। সবে কলেজে পা দিয়েছ তোমার সামনে সমস্ত ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে। আর আমি একজন বিবাহিত ভদ্রলোক।'

'তুমি সোমাকে ডিভোর্স করতে পার না ?'

চমকে উঠল অমিত। বলল, 'না।'

'আমার জন্যে, আমি যে মরে যাচ্ছি, আমার জন্যেও পার না ! এই দেখ, আমার গায়ে

ত দিয়ে,' ঋতু অমিতের হাতটা তুলে নিয়ে নিজের গলায় বুলিয়ে দিল, বলল—'আমার াজ রাতে জ্বর আসে, আমি মরে যাচ্ছি অমিত। তুমি দেখতে পাচ্ছ না ?'

অমিত বলল, 'এবার ওঠা যাক ঋতু, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'আমি কি যথেষ্ট সুন্দর নই,' ঋতু বলে উঠল, 'সোমার চেয়ে সুন্দর ?'

'তুমি প্রলাপ বকছ ঋতু।' অমিত উঠে পড়ল।

'ঠিক আছে ডিভোর্স করতে হবে না, তুমি আরেকটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করো। সেখানে মি আর আমি থাকব।'

অমিত এবার ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'তুমি কি ক্ষেপে গেছ ঋতু ? ছিঃ।'

সে সজোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একবারও পেছন দিকে না তাকিয়ে গেটের দিকে গিয়ে গেল।

ঋতুর বুকের মধ্যেটা এত ভারী যেন বিশমণী পাথর কে বসিয়ে দিয়েছে সেখানে। সে ড়তে পারছে না, দম নিতে পারছে না, এত কষ্ট। তার বুকটা কি ফেটে যাবে ?

এই অবস্থায় এইখানেই তাকে আবিষ্কার করলেন পার্থপ্রতিম।

'তুমি মিঠুর সেই বন্ধু না ?'

'ঋতু মুখ তুলে তাকিয়ে দুটো পাজামা-পরা পা, পাঞ্জাবির প্রান্ত, একটা ঝোলার তলা ার তার ওপরে একটা ভারী মুখ, ছেলেমানুষি হাসিতে ভরা চোখ দেখতে পেল। সে কানও জবাব দিতে পারল না। পার্থপ্রতিম একটা হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আরে কতক্ষণ খানে বসে থাকবে ! ওঠো।' তিনি টেনে তুললেন ঋতুকে।

কোনমতে উঠল ঋতু, পার্থপ্রতিম তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। ঋতু একটা নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো পার্থপ্রতিমের গায়ে লেপ্টে থেকে চলছে।

'চলো কিছু খাওয়া যাক।' তিনি পেছন দিকে চায়ের স্টলে নিয়ে গেলেন। বিস্বাদ া-কেক, মুখে দিয়ে ঋতু মুখ বিকৃত করল। পার্থপ্রতিম বললেন, 'চলো, অ্যাকাডেমিতে কটা ভালো নাটক হচ্ছে, দেখি গে যাই।'

নাম করা নাটক। সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু পার্থপ্রতিমের কাছে এটা কানও সমস্যাই নয়। তিনি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। দুটো অতিরিক্ত চয়ার সামনের সারিতে দিয়ে তাঁদের বসিয়ে দেওয়া হল।

ভয়ের চোটে বাস স্টপ পর্যন্ত চলে গিয়ে অমিতের হঠাৎ খেয়াল হল কাজটা সে ভালো করেনি। ঋতু কী করছে, ওখানে ঋতু কী খুব নিরাপদ ? মাথাটা তো একদম খারাপ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। সে এক-পা দু'পা করে ফিরে গেল আবার, ঋতুর চিহ্নও নেই ওখানে। একটু এদিক-ওদিক খুঁজে সে তাড়াতাড়ি বাস ধরে বাড়ি ফিরে গেল। সোমা দেখা যাচ্ছে খুব সকাল-সকাল ফিরেছে আজ। অমিতকে দেখে সে খুব খুশি হয়ে উঠল। আগেকার দুর্ঘটনার জের সে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তার চেহারায় এখন অটল ব্যক্তিত্বর চেয়ে একটা করুণ মিষ্টতাই বেশি। একটু অভিমানী, আদুরেও হয়ে উঠেছে। কিন্তু অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে সে থমকে গেল। কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে তার সারা মুখে।

'কী হয়েছে অমিত ?'

অমিত ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'কিচ্ছু না।' তারপর সে কৌচের পিঠে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

সোমা এক গ্লাস জল নিয়ে এলো। 'খাও।' জলটা নিঃশেষে পান করে অমিত হঠাৎ

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সোমার কোমর জড়িয়ে ধরে মাথাটা তার ওপর রাখল। সোমা তার পাশে বসে ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, 'কী হয়েছে অমিত ? কী হয়েছে ? আমাকে বলবে না ?'

'অমিত বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না এখন কী করব।'

'আঃ, শিগগির বলো। ঋতুর ব্যাপারে কিছু ?'

কৃতজ্ঞ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল অমিত। তারপর একটু একটু করে এ ক মাসের ঘটনা। আজকের পরিস্থিতি সুদ্ধু বলে গেল। শুনতে শুনতে সোমার মুখের রং বদলাচ্ছিল। কিন্তু শেষটুকু শুনে সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। বলল এক্ষুনি চলো। শিগগির।'

ট্যাক্সি নিয়ে দুজনে রবীন্দ্রসদনের সমস্ত চত্বর ভালো করে খুঁজে দেখল। তারপর সেই ট্যাক্সি নিয়েই চলে গেল মা-বাবার কাছে, হিন্দুস্তান রোড। মা নিজেই দরজা খুলে দিল।

'আরে সোমা, অমিত, আয় আয়।'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সোমা বলল, 'ঋতুকে দেখছি না !'

'ঋতুর একটু দেরি হচ্ছে আজকে !' মীনাক্ষী বললেন।

'এরকমই ফেরে ?'

'না তো ! দিনের বেলায় কলেজ, লাইব্রেরি। নাচের জন্যে বুধ শুক্র সন্ধেবেলায় বেরোয়। আজকাল সাতটার মধ্যে ফিরে যায়। খুব দেরি হলে।'

মীনাক্ষী জামাই আর মেয়ের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সোমা বলল 'ঠিক আছে, রাত্তিরে খেয়ে যাব মা। যা হয়েছে তাতেই হয়ে যাবে আমাদের। ব্যস্ত হয়ো না।'

অজিত বললেন, 'অনেক দিন পরে এলি।'

সোমা ছটফট করছে। সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। অজিত জামাইয়ের সঙ্গে গল্প করে যাচ্ছেন। জ্যোতিবাবু, রাজীব-হত্যা, সোনিয়া গান্ধী আসবে কি না, বুশ···

মীনাক্ষী কিন্তু বুঝতে পেরেছেন কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। তিনি বারান্দায় মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'কী হয়েছে রে সোমা ?'

সোমা কী বলবে মায়ের প্রশ্নের উত্তরে ? সে কি বলবে ওর ছোট বোন তার বিশ্বাস ভালোবাসা আর প্রশ্রয়ের ঘরখানা টুকরো টুকরো করে ভাঙছে ? সে কি বোঝাতে পারবে ঋতুর প্রতি তার এই মুহূর্তে কী দুরন্ত ক্রোধ আর ঘৃণা ? সেই সঙ্গে ঋতুর জন্যে তার কী প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা ? রাগে যে এখন অমিতকে আঁচড়ে-কামড়ে একসা করে দিতে ইচ্ছে করছে, তাই বা সে কেমন করে প্রকাশ করবে ! অমিত কি ধরেই নিয়েছে তার সমস্ত দুর্বল আচরণ, তার সমস্ত অহেতুক গোপনতা সোমা ক্ষমা করবে ! প্রথম বাচ্চাটা গেল, সোমাকে তার জন্য অনর্থক কত কষ্ট পেতে হল, এতেও কি ওই বোকচন্দরটার কোনও চৈতন্য হয়নি ? সবটার জন্যেই ঋতু দায়ী, ঋতু এবং অমিতের অবিমৃষ্যকারিতা এখন আবার··· ।

সোমা বলল, 'কিছু হয়নি মা। আচ্ছা, ঋতুর বিয়ে দিলে হয় না ?'

'ঋতুর বিয়ে ? সবে তো কলেজে ঢুকেছে। তুই তো ডক্টরেট করে বিয়ে করেছিস।'

'সবাইকার ক্ষেত্রেই কি এক নিয়ম হবে ? আমি আলাদা, ঋতু আলাদা।' সোমার বলবার ভঙ্গি কেমন কাঠ-কাঠ।

'কী হয়েছে, আমায় বলবি ?' মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করলেন।

সোমা মাথা নাড়তে লাগল, 'কিছু না, কিছু না।' এ সমস্যার কী সমাধান ! সে তার

মাথার মধ্যে খুঁড়তে লাগল। কী করা যায়, কী করা যায়!

রাত্তির সাড়ে ন'টায় রাস্তার মোড়ে একটা ট্যাক্সি থেকে নামল ঋতু। ট্যাক্সিটা হুশ করে বেরিয়ে গেল। বোঝাই গেল কেউ রয়েছে ভেতরে। বারান্দায় চার জনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। ওদিকে দরজা খুলেই রেখেছে বাসন্তী। ঋতুর ঢোকবার শব্দ হল। হাই-হিলের খুটখুট। জুতো বদলে চটি পরতে সামান্য সময় নিল, তারপর নিজের ঘরে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনলো সবাই।

সারা পথ অমিতের সঙ্গে একটা কথাও বলল না সোমা। অমিতের মুখ শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে আছে। নিজেদের বাড়ি ঢুকে নিঃশব্দে জানলা খুলল, জল খেল, পোশাক বদলালো, তারপর শুয়ে পড়ল সোমা। অমিত বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল, 'সোমা, কথা বলবে না?'

সোমা বলল, 'আমি কালই একবার মোড়ের বাড়ির ওই অ্যাডভোকেট মৈত্রর কাছে যাব।'

অমিত অবাক হয়ে বলল 'কেন?'

'ডিভোর্স করতে হলে কী কী নিয়ম কানুন···'

অমিত ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, 'কে ডিভোর্স করবে? কেন? কোথায়?'

'আমি এবং তুমি পরস্পরকে করব। তারপর সময়মতো তুমি ঋতুকে বিয়ে করবে।'

'মানে?'

'মানে এই যে তোমার সায় না থাকলে তো জিনিসটা এত দূর গড়াতে পারত না, অমিত। জীবন নিয়ে ছেলেখেলা সাজে না। এখন এই দোটানা করতে গিয়ে ঋতুর আমার দুজনের জীবনই একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। এইবেলা, ফ্যামিলি বাড়েনি। এটাও যাক! শেষ হয়েই যাক!' সোমার গলা কঠোর।

'সোমা!' আর্ত গলায় অমিত বলল, 'কী বলছ যাতা? তোমার আর ঋতুর জীবন নষ্ট হয়ে যাবে? আর আমি? আমার জীবন? আমার কথা ভাবলে না?'

'ভাবলাম তো! ঋতুকে বিয়ে করে সুখী হও। সন্ধেবেলায় কলেজ থেকে ফিরে চিকেন-ওমলেট, অফ-ডেগুলোতে সারা দিন রাত সোহাগ আর ভি সি পি। এক দিন ছাড়া ছাড়াই—সিনেমা থিয়েটার গান নাচ দেখতে শুনতে যাবে—এই তো জীবন! আমি তোমার বা ঋতুর কারুর পথেই এক মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়াব না।'

'তাহলে শুনে রাখো।' অমিত ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'এই সামান্য কারণে তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যাও, আমি ইউনিভার্সিটির কাজ ছেড়ে দেব। আরামবাগে বাবা-মার কাছে গিয়ে জমিজমা দেখব, চাষ বাস,···'

সোমা বলল, 'আর ঋতু? ঋতুর কী হবে!'

'চুলোয় যাক তোমার ঋতু! একটা হেডলেস, খেয়ালি, স্পয়েল্ট অপদার্থ মেয়ে। কী শিখিয়েছ তোমরা ওকে? কিচ্ছু না! একটা···'

'খবর্দার অমিত। যা বলার বলেছ, আর কিচ্ছু বলবে না। ওর মাথায় এসব উদ্ভট খেয়াল চাপল কেন? তার দায়িত্ব তোমার।'

'দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেই দায়িত্ব আমি স্বীকার করব, ভেবেছ?' অমিত এখন ফুঁসছে। 'আমি সাধারণ ভদ্রতা করেছি। অনেক ছোট শালী, তাই তার আবদার রেখেছি কিছু। এই পর্যন্ত।'

সোমা বলল, 'তাহলে গোপন করেছিলে কেন এত দিন?'

'ওর সব কথাগুলো কি রিপিট করবার মতো? যতবার গিয়ে দেরি হবে মনে হয়েছে,

ফোন করে তোমায় জানিয়ে দিয়েছি না ?'

ভোরের দিকে দেখা গেল সোমা আর অমিত পরস্পরকে শিশুর মতো আঁকড়ে ধরে ঘুমোচ্ছে। মাঝখানে ঋতু নেই।

১৬

সে এইমাত্র জন্মাল...

'লেক যে এত যাচ্ছেতাই খারাপ জায়গা আমার ধারণা ছিল না', ক্ষুব্ধ মুখে বলল বিষ্ণুপ্রিয়া। তার মুখ রাগে লজ্জায় লালচে। তার পেছন পেছন তন্ময় বেরোচ্ছে। সে তার চশমার কাচ দুটো ভালো করে মুছছিল। বলল, 'আমারও ধারণা ছিল না। কিন্তু আমি তোমাকে এখানে আসতে বারণ করেছিলাম। করিনি ?'

'বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, 'কিন্তু আমার যে এখনও অনেক জরুরি কথা বলতে বাকি রয়ে গেল তন্ময়। কথা বলতে গেলেই যদি পয়সা খরচ করতে হয়...'

পাশ দিয়ে দুটি ওদেরই বয়সী ছেলেমেয়ে খুব হাত পা নেড়ে কথা বলতে বলতে চলে গেল। সেদিকে ঈর্ষারি দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, 'ওই তো ওরাও তো যাচ্ছে ওদের তো কেউ বিরক্ত করছে না।'

তন্ময় চিন্তিত মুখে বলল, 'আসলে এটা ওদের পাড়া। নিজস্ব এলাকা। চলো আমরা বরং সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ কফি হাউজে যাই।'

'আমি কখনও যাইনি। যদি কোনও চেনা লোক... ?' বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বরে প্রচুর দ্বিধা।

'চলোই না। চেনা লোক থাকলে এত ভয়ের কী আছে ?' তন্ময় সাহস করে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করালো।

বিষ্ণুপ্রিয়া এবার খুশি মনে ট্যাক্সিতে উঠল। তন্ময়ের মধ্যে কোন ব্যাপারে কোন উদ্যম দেখতে পেলে সে খুশি হয়। মনটা হালকা লাগে। সে একটা হাত তন্ময়ের হাতের ওপর রাখল। এ ব্যাপারেও সে তন্ময়কে আগুয়ান দেখলে খুশি হত। কিন্তু তন্ময় এতো দেরি করলে সে আর কী করতে পারে! সে বলল, 'তন্ময়, বাবা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন।'

তন্ময় চমকে বলল, 'সে কি ? এত তাড়াতাড়ি ? কেন ?' বিষ্ণুপ্রিয়া এখন তার হাত সরিয়ে নিয়েছে। তন্ময় পাশ ফিরে তার দিকে তাকিয়ে। ভীষণ বিস্ময় তার চোখে। আঘাত আছে কী ? আঘাত ?

'বাবা নিশ্চয় কিছুর গন্ধ পেয়েছে। আমরা কত জায়গায় যাই, কেউ হয়ত দেখেছে কিছু বলেছে।'

'কোথায় আর যাই আমরা ?' তন্ময় অবাক হয়ে বলল, 'কলেজ ক্যান্টিন, কফি হাউস ছাড়া ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে একটু, লেকে তো আজ প্রথম এসেই...'

'ওই হল। ওরই মধ্যে কেউ হয়ত দেখে থাকবে, নয়ত বাবা অত তাড়া করবে কেন কায়দা করে আমাকে দেখানো হয়ে গেছে। প্রথম ইনস্টলমেন্টে পাত্রের ভাই, দিদি আর মা। পাশ করেছি। পাত্র আসবেন ফিলাডেলফিয়া থেকে তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে ফেব্রুয়ারিতে, তখনই হবে ব্যাপারটা।'

'এপ্রিলে পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে ?'

'সেটাই তোমার আগে মনে হল ?' বিষ্ণুপ্রিয়ার গলা বুজে আসছে।

তন্ময় শুকনো মুখে বলল, 'সেটাই তো সবচেয়ে জরুরি, নয় ?'

বিষ্ণুপ্রিয়ার গলা ধরে গেছে। সে বলল, 'এর আগে অনেক কাটিয়ে দিয়েছি। সেগুলোর কথা তো জানো না ! তোমাকে বলিনি সব। মাঝে মাঝে হিন্ট দিয়েছি, কিন্তু তুমি বুঝতেই চাও না !'

তন্ময় একটু পরে বলল, 'বুঝেই বা সত্যি-সত্যি আমি কী করতে পারি। প্রিয়া ?'

'কিচ্ছু পার না ?'

'কী পারি, তুমিই বলো ! তোমাকে তো আমাদের বাড়ি নিয়ে গেছি, দেখেছ আমার মা বাবা কি রকম লিবার্যাল। আমাদের বন্ধুত্ব ? কোনও ব্যাপারই না ! কিন্তু তুমি এক দিনও পেরেছ আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে ? এই সামান্য ব্যাপারেই যখন এত বাধা, তখন আমি কী করব বলো ? গ্র্যাজুয়েটটা পর্যন্ত তো হইনি এখনও। একটু সময় তো আমাকে দেওয়া দরকার !'

'সময় দিতে পারলে তো ভালোই হত। আমিও তো তাই-ই চেয়েছিলাম। কিন্তু এটা একটা এমার্জেন্সি তন্ময়। এমার্জেন্সির সময়ে এমার্জেন্সির উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হয়।' বিষ্ণুপ্রিয়া বলল।

'কী ব্যবস্থা তুমি বলো ? এক, তুমি তোমার মনের কথা মা-বাবাকে পরিষ্কার করে খুলে বলতে পার। নিজেকে অ্যাসার্ট করতে পার।'

'বাঃ। যা করবার আমিই করব ? তোমার কিচ্ছু করার নেই ?'

'এই মুহূর্তে আমি ঠিক কী অধিকারে তোমার বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াব বলো ! কী আমার স্ট্যাটাস ! একটা আন্ডারগ্রাজুয়েট ছেলে যে এখনও পর্যন্ত জানেই না সে কী করবে, বা তার কী সম্ভাবনা আছে ভবিষ্যতে।'

বিষ্ণুপ্রিয়া হতাশ গলায় বলল, 'তোমার কোনও উদ্যম নেই তন্ময়, রোখ নেই কোনও। কেমন গা-ছাড়া। ডিফিটিস্ট। আমি যদি বলতে না পারি, তাহলে আমার বিয়ে হয়ে যাবে। তখন তোমার মনের অবস্থাটা কী হবে আমি জানতে চাই।'

'আমার মনের অবস্থা যা-ই হোক প্রিয়া, আমি সেটা প্রাণপণে ওভারকাম করার চেষ্টা করব।'

'অর্থাৎ তুমি মেনেই নিয়েছ, আগে থেকেই জানতে আমাদের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথাও পৌঁছবে না।' বিষ্ণুপ্রিয়া যেন ক্রমশই তন্ময়কে কোণঠাসা করে ফেলছে। তন্ময়ও ততই হৃদয়াবেগ ইত্যাদির ধারে কাছেও না গিয়ে যুক্তির আশ্রয় নিচ্ছে।

'দেখো, আমরা তো কোনও প্ল্যান করে মেলামেশা করতে শুরু করিনি।'

এই কথা শুনে বিষ্ণুপ্রিয়া ভীষণ রেগে গেল। বসে বলল, 'তা তো তুমি বলবেই। প্ল্যান। প্ল্যান করে আবার কে কী করে ? তোমরা ছেলেরা এরকমই। ফুলে ফুলে বিচরণ করবে, দায়িত্ব নিতে বললেই কেটে পড়বে। ছিঃ। ট্যাকসি থামাতে বল, আমি নেমে যাচ্ছি।'

'শোনো,' তন্ময় বলল, 'তুমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গেছ প্রিয়া। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবে।'

'পেরেছি। তুমি খুব অসহায়, তৈরি হওনি এখনও, মা-বাবার আঁচল-চাপা কচি ছেলে। এই যে শুনছেন, এসপ্ল্যানেডের মোড়ে আমায় একটু নামিয়ে দেবেন তো !'

তন্ময় হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'কী বলছ যা-তা ? বাবার আবার আঁচল হয় না কি ?

চলো কফি হাউজে চলো, একটা কিছু ভেবে ঠিক করা যাবে। আজে-বাজে জায়গায় নেমো না।'

কফির কাপে উত্তেজিতভাবে চুমুক দিচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া। তন্ময় বলল, 'এই কফি হাউজ সত্যজিৎ রায়, কমলকুমার মজুমদার—এঁদের আড্ডার জন্যে বিখ্যাত, জানো তো!'

বিষ্ণুপ্রিয়া সোজা তার চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'শুধু শুধু এতদিন আমায় কেন ঘোরালে?'

তন্ময় বলল, 'শোনো প্রিয়া, একটু সাহস খরচ করো। ব্যাপারটা অন্তত তিন বছরের জন্যে ঠেকাও। বাকিটুকু আমি করবো, কথা দিচ্ছি।'

'ছারপোকার গাল টিপে মুখ হাঁ করিয়ে দোব, তবে তুমি ওষুধ দিয়ে মারবে?' বিষ্ণুপ্রিয়া তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলল।

'তুমি যদি এভাবে ঝগড়া করে যাও, আমি কী করতে পারি?' তন্ময়েরও এখন একটু-একটু রাগ এসে যাচ্ছে।

'তোরা এখানে?' ওরা মুখ তুলে দেখল ঋতু আর মিঠু। সঙ্গে একজন পাজামা-পঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক। তন্ময় তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো। বিখ্যাত শিল্পী-নাট্যকার পার্থপ্রতিম। সে উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বলল, 'বসুন!'

প্রশ্নটা করেছিল মিঠু। উত্তর দিল ঋতু। সে কেমন এক রকম মুখভঙ্গি করে বলল 'আহা, তুই আসতে পারিস, আমি আসতে পারি, আর ওরা পারে না! কী বল প্রিয়া!' সে টানতে টানতে মিঠুকে অন্য টেবিলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল।

তন্ময় বলল, 'আলাপ করিয়ে দিবি না মিঠু!'

মিঠু বলল, 'নিশ্চয়ই! কাকু এ আমার ক্লাস ফেলো তন্ময় হালদার। খুব ব্রিলিয়ান্ট। ভালো আবৃত্তি করে। আর ও হল বিষ্ণুপ্রিয়া চক্রবর্তী। ও-ও আমাদের বন্ধু। স্কুল থেকে। আর ইনি হলেন—'

তন্ময় সামান্য হেসে বলল, 'ওঁকে চিনি। কে না চেনে?'

'চেনো? তবে এখানেই বসা যাক, ঋতু এদিকে এসো', পার্থপ্রতিম বসে পড়ে বললেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া তার ব্যাগ সমেত উঠে পড়ে বলল, 'আমার খুব দেরি হয়ে যাবে, আমি যাই।'

মিঠু বলল, 'সে কি? কাকুর সঙ্গে একটু আলাপ করে যা।'

'আমার খুব দেরি হয়ে যাবে,' বিষ্ণুপ্রিয়া একই কথা দুবার বলল, তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে চলে গেল।

পার্থপ্রতিম তন্ময়ের দিকে ফিরে বললেন 'আমরা বোধ হয় তোমাদের ডিসটার্ব করলুম।'

'না, না, মোটেই না।' তন্ময় খুব অপ্রতিভভাবে হাসল।

'ওই মেয়েটি কিন্তু খুব ডিসটার্বড হয়েছে। তোমার উচিত হবে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে ধরে ফেলা।'

তন্ময় কী করবে ঠিক করতে পারছিল না। সে পার্থপ্রতিমের ভীষণ ভক্ত। এমন সুযোগ! ওদিকে আবার বিষ্ণুপ্রিয়া ভীষণ রেগে আছে। পার্থপ্রতিম বললেন, 'আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তুমি মেয়েটিকে গিয়ে ধরো। কুইক!'

তন্ময় তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি পায়ে হেঁটে এসে দেখল বিষ্ণুপ্রিয়া গেটে

কাছেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছে। তন্ময়কে দেখেই সে ট্রাম গুমটির দিকে হাঁটতে লাগল। যত জোরে সম্ভব। ট্রাম নিল ওরা। নীরবে কেটে গেল সমস্ত রাস্তা। যদিও পাশাপাশি বসা যেত, তবুও বিষ্ণুপ্রিয়া লেডিজ সিটেই গিয়ে বসল, তন্ময় বাঁ দিকের প্রথম সিটটায়, জানলার ধারে। নিজের স্টপ আসতে বিষ্ণুপ্রিয়া হুড়মুড় করে নেমে গেল, তন্ময় লাফিয়ে, লোক টপকে নেমেও তাকে ধরতে পারল না। সে অগত্যা বাড়ির বাস ধরল।

বাড়ি ফিরে তন্ময় খুব গম্ভীর মুখে তার বই-পত্তর টেনে নিয়ে বসল। বেশ কিছুক্ষণ পর সে বুঝতে পারল সে এক বর্ণও পড়ছে না। স্রেফ তাকিয়ে আছে অক্ষরগুলোর দিকে। তার চোখের সামনে বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিমানী, বিষণ্ণ, কখনও ক্রুদ্ধ মুখ। তন্ময় বইপত্র গুটিয়ে রেখে দিল। দরজা খুলে বেরোচ্ছে, মা বলল, 'এই তো এলি ! আবার কোথায় বেরচ্ছিস !' ।'

'একটু রাস্তা থেকে ঘুরে আসছি।'

রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে একটা পার্কে গিয়ে বসল। কেউ নেই কোথাও। ঠাণ্ডা জলো হাওয়া দিচ্ছে। একটা পাতলা সুতির শার্ট তার গায়ে। ক্রমশই হঠাৎ বাদলের ঠাণ্ডা সেটাকে ভেদ করতে লাগল। সে এখন কী করবে ? বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তার ভাবটা তালে গোলে হয়ে গেছে ঠিকই। দুজনের এক বিষয়ে অনার্স। একই দিকে থাকে। অনেকটা পথ এক সঙ্গে আসতে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ আছে কি, যে তাদের বন্ধুত্বটা যথেষ্ট নিবিড় পর্যায়ে পৌঁছেছিল ! তন্ময় ঠিক রায় দিতে পারছে না। সে এ বিষয়ে আলাদা করে কিছু ভাবেনি। বিষ্ণুপ্রিয়া যেন চিরকাল এমনি ভাবে তার পাশে পাশে হেঁটে যাবে। খুব স্বস্তির ব্যাপারটা। বিষ্ণুপ্রিয়া কতবার তার বাড়িতে এসেছে। অন্য ছেলেবন্ধুরাও এসেছে কেউ কেউ। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার মতো কেউ নয়। তার বাড়িতেও এ নিয়ে কেউ আলাদা করে ভাবে না। ভাবেনি কখনও। তার সঙ্গে কোনও মেয়ের খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হলেই যে বিয়ের কথা ভাবতে হবে, এমন চিন্তায় সে বা তার বাড়ি অভ্যস্ত নয় মোটেই। বিষ্ণুপ্রিয়া যদি ইদানীং কোনও কোনও ইঙ্গিত না দিত, সে একথা ভাবত না। আবার তার মানেই এ নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে সে পড়াশোনা শেষ করে উপার্জন করতে আরম্ভ করলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করত না। তন্ময় কো-এডুকেশন স্কুলে পড়েছে। ক্লাস ফাইভ-সিক্স থেকেই সেখানে ছেলেরা খুব মেয়ে-সচেতন হয়ে উঠত। ছোটখাটো বাল্য প্রেম, রোম্যান্স যে হত না তা নয়। কিন্তু বেশির ভাগই বন্ধুত্ব। বিষ্ণুপ্রিয়া যে কেন এত তাড়াতাড়ি এসব কথা ভাবতে গেল ? অবশ্য ওর খুব একটা দোষ নেই। বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। চাপের মুখে পড়ে তারা দুজনেই বুঝতে পেরেছে তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে অন্য মাত্রা আছে। প্রিয়া আগেই বুঝেছে, তন্ময় আজ ভালো করে বুঝতে পারল। কিন্তু, পড়াশোনা শেষ না করে বিয়ে করব না—এটুকু জেদ ধরতে কী অসুবিধে প্রিয়ার ? তার পক্ষে, এখন, এই অবস্থায় প্রিয়ার বাবার কাছে পাণিপ্রার্থনা করতে যাওয়াটা খুব হাস্যকর হবে না ? যতই ভাবে, ততই তন্ময়ের ঠাণ্ডা মাথা গরম হয়ে যেতে থাকে। মেয়েটা রেগে গেল। তার চেয়েও বড় কথা দুঃখ পেল। তন্ময় নিজের ওপর, নিজের অল্প বয়সের ওপর, প্রিয়ার বাবার ওপর রেগে গেল এবার। ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। বেশ রেগে বাড়ি ফিরলে সে। ফিরে দেখল, বাবা, মা, বোন সবাই খেতে বসেছে। বোন চেঁচিয়ে বলল, 'দাদা আয়, খেতে দিচ্ছি।' সে কলঘরে ঢুকে যেতে যেতে বলল, 'আমি খাব না।'

হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে দেখে বাবা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করছে। বাবার চোখে মোটা কালো শেল-ফ্রেমের চশমা। পেছনে চোখ দুটোয় উৎকণ্ঠা।

'কী রে বুবুল, খাবি না কেন ? শরীর খারাপ ?'

'হ্যাঁ।'

'কী হল ?'

'বড্ড বেশি পড়ছিস। তার ওপরে খানিকটা ভিজে এলি। না খেলে দুর্বল হয়ে যাবি, যা হোক একটু খেয়ে নে।'

একবার আড়চোখে চেয়ে দেখল তন্ময় মা টেবিলে ফাইল খুলে বসেছে। কেমন রাগ বেড়ে গেল তার। বাবা নাছোড়বান্দা। বেশি কচলাকচলি করতে ভালো লাগল না। সে চুপচাপ টেবিলে গিয়ে খাবারগুলো উল্টে-পাল্টে দেখল। বোন চেঁচিয়ে বলল, 'দাদা খেয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করে দিস। আমি শুয়ে পড়ছি।' বাবা বলল, 'তুই খা, আমি পরিষ্কার করে দেব।'

দু-একখানা রুটি, দু-এক টুকরো মাংস নিয়ে নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল তন্ময়। আবার পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল। কখন মন লেগে গেছে, কখন হাতে পেনসিল তুলে নিয়ে দাগ দিতে শুরু করেছে, সে নিজেই বুঝতে পারেনি। চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেছে, সে খসখস করে লিখতে শুরু করেছে। তার মা পাশের ঘরে জরুরি কাগজপত্র দেখতে দেখতে, বারোটা বাজল দেখে ফাইল বন্ধ করলেন। যথেষ্ট হয়েছে, এর চেয়ে বেশি নয়। তিনি উঠে পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখলেন টেবল-ল্যাম্প জ্বলছে। আস্তে আস্তে পেছনে এসে দাঁড়ালেন ছেলের। বুবুল বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে লিখে যাচ্ছে। তিনি শব্দ না করে সরে এলেন। মাথা ধরেছিল ছেলেটার, ভালো করে খেলো না-- মেজাজটা একটু খারাপ সম্ভবত, যা ওর চট করে হয় না। তিনি খেয়াল করেছেন, কিন্তু সেটা জানতে দেননি। ছেলে-মেয়ে বড় হচ্ছে। তাদের ব্যাপারে সব সময়ে নাক গলানোর তিনি পক্ষপাতী নন। ওরা একটু স্বাধীন চিন্তা করতে শিখুক। নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান নিজেরা করুক। অন্তত চেষ্টা তো করুক। এই অখণ্ড মনোযোগ—এটাই বুবুলের প্রতিভা। অনেক রাত হল, শুয়ে পড়াই উচিত। কিন্তু ও যখন পড়ছে, তিনি ওকে পড়তেই দেবেন। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। তন্ময় পড়তে লাগল।

কিন্তু, বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিজ্ঞতা হল বড় অদ্ভুত। সে যখন বাড়ি ঢুকছিল মনে হচ্ছিল একটা অন্ধকার অজানা গুহার মধ্যে সে ঢুকে যাচ্ছে, তার কেউ কোথাও নেই। বাবা-মা এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয় যাঁরা বাড়িতেই থাকেন তাঁরা তার জীবনে অবান্তর। একমাত্র সত্য ছিল তন্ময়। তন্ময় আজকে যা করল তাকে বলে উদাসীনতা, তাকে বলে প্রত্যাখ্যান। সে-ও কি পরিকল্পনা করে তন্ময়ের সঙ্গে মিশেছিল ? মোটেও না। কিন্তু প্রথম দেখাতেই চশমা-পরা সিরিয়াস-চেহারার পাতলা ছেলেটিকে তার ভালো লেগেছিল। অনার্স-ক্লাসে সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর, চিন্তাশীলতার প্রমাণ, তার মধ্যে ওর প্রতি একটা সম্ভ্রমের সৃষ্টি করেছিল। মাঝে-মাঝেই ক্লাসের পর সে তন্ময়ের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিত। এইভাবে কলেজের মাঠে, ভিক্টোরিয়ার কোনও হঠাৎ-ক্লাস-না-হওয়া দিনে, কফি হাউজে তাদের আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তন্ময়ের লেখাপড়া ছাড়াও অন্য বিষয়ে আগ্রহ। তার আবৃত্তি, সাহিত্য-শিল্প-নাটক নিয়ে কৌতূহল, তার বাড়ির খোলামেলা আবহাওয়া সব মিলিয়ে তন্ময়কে তার খুব ভালো লাগত। বন্ধুরা যে তাদের ঘনিষ্ঠতাটাকে অন্য চোখে দেখছে এটা বুঝে সে প্রথম থেকেই সচেতন ছিল

তাদের বন্ধুত্বটা ভালোবাসায় পৌঁছতে পারে। বাড়ি থেকে ক্রমাগত বিয়ের তাগাদায় অস্থির হতে হতে সে অনুভব করে তন্ময়কে ছেড়ে থাকা অসম্ভব। এবং এটা সত্যিই ভালোবাসা। কিন্তু আজ তন্ময় যা করল তা থেকে বোঝা গেল তন্ময় জানে যে বিষ্ণুপ্রিয়া তাকে ভালোবাসে এবং তার কাছ থেকে একই অনুভূতি প্রত্যাশা করছে, তা সত্ত্বেও সে উদাসীন হয়ে রইল। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভেতরটা অপমানে, দুঃখে জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে। বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে অনেক গলার আওয়াজ পেলো। খুব আলো জ্বলছে ঘরে। যেন অনেকদিন পর খুব আড্ডা হচ্ছে।

ভেতর থেকে মায়ের গলা ভেসে এলো, 'বুড়ি ফিরলি ? এ ঘরে শোন একবার।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৈঠকখানায় ঢুকে বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বাবা, মা, কাকা, জ্যাঠা, কাকিমা, দুই দাদা, বউদিরা—এলাহি ব্যাপার। দুজন অভ্যাগত এসেছেন। রিমলেস চমশা পরা মধ্যবয়স্ক এক মহিলা হাসিতে মুখ ভরিয়ে খুব দরাজ গলায় বললেন, 'বুড়ি চিনতে পারছিস ?'

মা ইশারায় বলল প্রণাম করতে। বিষ্ণুপ্রিয়া অনেকের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। ভদ্রমহিলার উজ্জ্বল হাসি সংক্রামক। সে হাসিমুখে বলল, 'চেনা যায় না, তবু চিনতে পেরেছি, মৈত্রেয়ীদি না ?'

হাসিতে ফেটে পড়ে মৈত্রেয়ীদি বললেন, 'অ্যাই একদম নাম ধরবি না এখন, দিদিও বলবি না, কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে তাহলে।' সবাই কেন কে জানে অট্টহাস্য হাসছে। মৈত্রেয়ীদি পাশে ছাই-ছাই রঙের শার্ট আর কালো ট্রাইজার্স পরা এক যুবক। বলল, 'বুড়ি, চিনতে পারছ ?'

'তুই ওর পাশে গিয়ে বোস।' মৈত্রেয়ীদি পথ করে দিলেন। দিয়ে গল্পে মেতে গেলেন।

'তনু !' দ্বিধা মিশ্রিত স্বরে বিষ্ণুপ্রিয়া বলল। মৈত্রেয়ীদি তার পিসতুত দিদি নীপার বড় ননদ। নীপাদির বিয়েই হয়েছে অন্তত বছর বারো। তনু প্রথম এসেছিল নিতবর হয়ে। দিদির এ বাড়ি থেকেই বিয়ে হয়েছিল, বিয়ে, অষ্টমঙ্গলা সব। যতবার দিদি আসত, তনুও ততবার আসত। তার সঙ্গে খুব জমে গিয়েছিল। এই সেই তনু ? সেই প্যাংলা, দুষ্টু, টপাটপ রসোগোল্লা আর ট্যাংরা মাছ খাওয়া তনু ? ছাতের চিলে-কোঠা থেকে ইঁদুর খুঁজে এনে যে তার নাকের সামনে দুলিয়ে ভয় দেখাত ? কী তিলে বিচ্ছু ছিল ? এখন ভোল পাল্টে ভদ্র সভ্য মার্জিত। চকচকে চোখ, স্মিত মুখ ?

'চিনতে পারোনি প্রথমে, না ? আমি কিন্তু পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে তোমাকে দেখলে চিনে ফেলতুম।' তনু তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া দেখল সে ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। যতবার তাকাচ্ছে ওর দৃষ্টি তার অন্তর ভেদ করে গভীর একটা চোরা আলোর মতো তার চোখের ভেতর দিয়ে হৃদয়ের ভেতরে নেমে যাচ্ছে। এ কী রকম চাউনি ? যেন আর কোথাও কেউ নেই জগতে। শুধু ও আছে আর বিষ্ণুপ্রিয়া আছে ! দৃষ্টি দিয়ে ও যেন এসে তার হাত দুটো ধরেছে। কোথা থেকে ও এমন চাউনি পেলো ?

'কী মামিমা, রাজি তো ? আপনার মেয়ে রাজি তো ? বাব্বাঃ এতগুলো বছর নাকি ওর প্রতীক্ষাতেই ছিল। শবরীর প্রতীক্ষা ! ওমা, এ তো আবার শবর, বলুন !' নিজেই বলছেন, নিজেই এক গঙ্গা হেসে যাচ্ছেন নীপাদির ননদ, 'এই বুড়ি, বলে দে তো তোর পছন্দ হচ্ছে না, বল তুই এনগেজড, দেখ না মজাটা !'

মৈত্রেয়ীদির কথাবার্তা শুনে বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ির দারুণ রক্ষণশীল মেজাজের জ্যাঠা, কাকা, বাবা, দাদারা প্রাণখুলে হাসছে। কিমাশ্চর্যমতঃপরম!

'কী রে রাজি তো!' মৈত্রেয়ীদি বলছেন এবার। তনুর চাপা গলা শোনা গেল,

'আঃ মা, এরকম প্রেশার দিলে কিছু বলা যায় না কি?'

মা হঠাৎ বলল, 'তনু, তোমার মনে আছে আমাদের বাড়িটা? কত আসতে। সমানে একতলা-দোতলা ছোটাছুটি করতে। এখন এক্সটেনশন হয়েছে কিছুটা। বুড়ি ওকে দেখা না গিয়ে!'

তনু বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসতে পারি?'

আপনি কি তুমি বলবে বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝতে পারছে না। সে উঠে দাঁড়াল। মৈত্রেয়ীদি চোখ টিপছেন ছেলেকে। ছেলে মাকে পার হতে হতে খুব মৃদু গলায় ধমক দিল, 'আঃ, মা!'

তিনতলায় এখন আধখানা ছাত। বাকি আর্ধেকটায় একটা বাথরুম, তিনটে বড় বড় ঘর, তিন দাদার। সেগুলো দেখালো বিষ্ণুপ্রিয়া। ছাতে এসে দাঁড়াল. শীত করছে, জলো হাওয়া দিচ্ছে। তার গায়ে শাড়ির হালকা আঁচল হাওয়ায় উড়ছে। বিষ্ণুপ্রিয়া সেটা জড়িয়ে নিল। তনু বলল, 'বুড়ি তুমি রাজি হবে না, এ আমি ভাবতেও পারছি না। তবু তোমার কিছু বলবার থাকলে বলো!'

বিষ্ণুপ্রিয়া চুপ করে আছে। সে বেরিয়েছে শেষ দুপুরে। রাত্তির সাতটা পর্যন্ত অশান্ত-অস্থির ঘোরাঘুরি করে দারুণ মানসিক বিপর্যয় বয়ে বাড়ি এসেছে। তার মুখ শুকনো, করুণ। সেদিকে তাকিয়ে পরম মমতার সঙ্গে তনু বলল, 'পরীক্ষার জন্য খুব খাটছ, না? আমি আবার এর মধ্যে এসে উৎপাত করছি। বুড়ি, তবু আমাকে করতেই হবে এটা। শোনো, আমি গিলানি গ্রুপ্‌স-এ আছি। ওরা শিগগিরই স্টেট্‌স-এ পাঠাবে। এই রকমই কনট্র্যাক্ট। তুমি যদি রাজি থাকো দু-চারদিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রি করে নেব।'

বিষ্ণুপ্রিয়া শিউরে উঠল। তনু চোখে উদ্বেগ নিয়ে বলল, 'কী হল?'

'এতো তাড়ার কী?'

'তোমার ভিসার জন্যে। যত তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রি হয়। ততই ভালো। তোমার আপত্তি থাকলে হবে না বুড়ি,' তারপর একটু থেমে আস্তে বলল, 'আমাকে তোমার মনে নেই। না?'

বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুই বলতে পারল না।

তনু ধীরে ধীরে বলল, 'সত্যিই তুমি কী করে মনে রাখবে? সাত-আট বছরের খুকি ছিলে বোধ হয় তখন!' বলল বটে, কিন্তু তনুর গলায় হতাশা, সে বলল, 'আমার এখন তোমার সেই বাচ্চা চেহারাটা মনে আছে। ভয়ে মুখ সিঁটকে' প্রায় মূর্ছা গিয়েছিলে ইঁদুরটা দেখে ... তনু হাসতে লাগল।

বিষ্ণুপ্রিয়া আস্তে, খুব আস্তে বলল, 'এ রকম হয়?'

তনু তার দিকে আবার সেই আলোর মতো দৃষ্টি ফেলে বলল, 'হয়েছে তো দেখা যাচ্ছে। অন্তত আমার ক্ষেত্রে। বুঝতে পারছি তোমার হয়নি। বুড়ি, তুমি কি রাজি হবে না?' শেষ কথাগুলো বলার সময়ে তনুর মুখটা কী রকম যেন হয়ে যাচ্ছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া হঠাৎ যেন একটা উঁচু বেদীর ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। তার সামনে প্রার্থী। কী সুন্দর এই প্রার্থনা!

'তোমায় একটু ভাবতে সময় দিতে হবে, না? ঠিক আছে, তুমি জানিও। আমি

অপেক্ষা করব।'

বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝতে পারল তনুর ভেতরটা বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য। এই বিষণ্ণতাও কী সুন্দর! মানিকতলার পুরনো পাড়ার ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলোর দোতলার ছাত সব নিচে। বাদলের প্রত্যাশায় কেমন চুপচাপ, অথচ উন্মুখ হয়ে রয়েছে। দূরে দূরে গাছেদের মাথা। গাছগুলো একটু একটু দুলছে। এ দোলা দুলতে যেন ভারি আরাম, ভারি আনন্দ! বিষ্ণুপ্রিয়া বাড়িগুলোর ছাতের দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছে। তনু প্রথমে অনেক কথা দিয়ে আরম্ভ করেছিল। এখন সে চুপচাপ। হঠাৎই যেন কথা অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে। কথা বড় দীন, অক্ষম মনে হচ্ছে। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া আর তনুর মাঝখানে বহু শব্দগর্ভ নীরবতা।

মৈত্রেয়ীদির গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ওপরে উঠে আসছেন।

'এই তনু, তোরা আর কতক্ষণ প্রেম করবি? কী ভেবেছিস বল তো!'

তনু বলল, 'ওফ মা-টা যা চ্যাংড়া হয়েছে না, পেরে উঠছি না। বুড়ি, তুমি কিছু মনে করো না।'

বিষ্ণুপ্রিয়া খুব মৃদু স্বরে বলল—'আমি রাজি।'

'কী বললে?' তনু ঝুঁকে পড়েছে। জলভরা একটা দমকা হাওয়া ছাতে পৌঁছচ্ছে। পুবে হাওয়া। বিষ্ণুপ্রিয়ার খুব শীত করছে। তার যেন কোনও অতীত নেই। সে এইমাত্র জন্মাল। জন্মেছে একেবারে সৃষ্টিকর্তার নাভিকুণ্ড থেকে। তার মা নেই, বাবা নেই। ব্রহ্মকমলের ওপর তার অধিষ্ঠান। একেবারে তরুণী, সর্বালংকার ভূষিতা, দুকূলবসনা এক তরুণী। তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে দুঃখ সুখ। তার একটি কথার ওপরে নির্ভর করছে কত জনের আনন্দ।

সে আবারও আর একটু স্পষ্ট করে বলল, 'আমি রাজি।'

অমনি চারদিকে বহু মানুষের আনন্দের কলনাদ শ্রুত হল। শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠল, ধূপ ধুনো গুগগুলের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হতে লাগল চারিদিক। ঝাপটার পর ঝাপটা পুবে হাওয়ায় সেই ধূপ-ধুনোর সুঘ্রাণ নিতে নিতে তন্ময় হয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়া। বৃষ্টি নামল।

১৬

আমাদের ওপর স্যাক্রিফাইসের খাঁড়াটা না নামালেই হচ্ছে না।

'সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে আর তোরা এখানে গজল্লা করছিস?' ভেঙ্কট হাতের খাতা উঁচু করে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পর থেকে ওদের দেখাশোনা কমে গেছে। তবে ক্লাস আরম্ভ মোটামুটি একই সময়ে। তাই চোখের দেখা হয়। পাঁচ নম্বর ঘরে আজ ক্লাস হচ্ছিল না। ওরা অনেকেই বসে গল্প করছিল। হলে ঢুকেই দেখতে পেয়েছে ভেঙ্কট। ধেয়ে আসছে। দেখে উজ্জয়িনী বলল, 'দফা সারল।'

ভেঙ্কট ঢুকে দাঁড়িয়েছে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে। মিঠু বলল, 'আমরা মোটেই গজল্লা-মজল্লা করছি না। আমরা সিরিয়াস টক করছি।'

'তোরা? সিরিয়াস টক? সাহিত্যের ছাত্রীরা? হাঃ', ভেঙ্কট ডান হাতটা সামনে প্রসারিত করে দিল, 'তোরা প্রেম, মান-অভিমান, কি বড়জোর একটু রাগারাগির গল্প

করবি। বানানো সব গল্প। রিয়্যালিটির সঙ্গে তোদের সম্পর্ক কী রে?'

'ভালো হবে না ভেঙ্কট', মিঠু বলল, 'আমরা সাহিত্যের, তোরা তবে কিসের?'

'আমরা সায়েন্স। পলিটিক্যাল সায়েন্স', খুব গর্বের সঙ্গে বুক ঠুকে ভেঙ্কট বলল।

'আমাদের রিয়্যালিটির সঙ্গে সম্পর্ক নেই কে বললে?' উজ্জয়িনী গম্ভীর মুখে বলল।

'সম্পর্ক থাকলে ভাই হাহুতাশ করতে যে সেই গেল তো দুদিন আগে গেল না কেন সোভিয়েতটা, কনস্টিট্যুশনটা আর পড়তে হত না।'

গৌতম পেছনেই ছিল, বলল, 'তাহলে তো ভারতবর্ষটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলে আরও ভালো হয় রে! ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশনও পড়তে হয় না!'

মিঠু উৎসাহিত হয়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস। ঠিক বলেছিস। তবে কী জানিস। কত গোর্বাচভ যাবে। কত গোর্বাচভ্ আসবে, কত সোভিয়েত ভাঙবে, কত সোভিয়েত গড়বে কিন্তু মিলটন, সেক্সপীয়ার, ডান, এলিয়ট, এইসব রাইটাররা চিরকাল, চিরটা কাল থাকবে। তো আমরা তাদেরই স্টাডি করছি। তোদের সিলেবাসের অংশ চিরকালের মতো কালের অতলে হারিয়ে গেল। শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে, আমাদের সাহিত্য ঠিক কাজ করে যাচ্ছে।'

'তোরা তোদের এলিটিস্ট সাহিত্য নিয়ে থাক নাক-উঁচু করে, আমরা ভাঙা-গড়ায় মোর ইনটরেস্টেড', ভেঙ্কট বলল।

অণুকা বলল, 'এই ভেঙ্কট চুপ কর না, সন্তোষের বাবা আজ প্রায় এক বছর হতে চলল নিখোঁজ। জানিস? এই রিয়্যালিটিটা জানিস!'

'সে কী? কেন?' ভেঙ্কট মুখ হাঁ করে খাতা গুছিয়ে বসে পড়ল।

মিঠু বলল, 'ও তো গোড়ার দিকে সেই কয়েক মাস ক্লাস করেই অ্যাবসেন্ট হতে লাগল, মাঝে মাঝে যখন আসত, জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যেত। শরীর খারাপ, মায়ের শরীর খারাপ এই সব বলত। তারপর তো একেবারেই বন্ধ করে দিল আসা। আমাদেরই অন্যায়, খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল, পরীক্ষাতেও বসল না। কদিন আগে দেখি শুকনো মুখে কলেজে এসেছে, এবারে দেবে পরীক্ষা, খোঁজখবর করতে এসেছে। বলল, নাকি চাকরি করছে।'

গৌতম বলল, 'চাকরি? আন্ডার গ্র্যাজুয়েট একটা মেয়ে কী চাকরি পাবে? করছেই বা কেন! আগরওয়াল তো ওরা? টাকার গদীর ওপর বসে থাকে।'

'ওরকম বাইরে থেকে মনে হয়,' অণুকা বলে উঠল, 'ওরা এমন কিছু ওয়েল-অফ ছিল না। বাবা বিজনেস করতেন, বাবার ইনকামই সব।'

'হ্যাঁ। তো সেই বিজনেসের ইনকামটা কী কম?' গৌতম ঝাঁঝিয়ে উঠল।

মিঠু বলল, 'আসল কথাটা শোন না। আমরা যখন এইচ এস-এর ফাইন্যাল দিচ্ছি তখন সন্তোষের দিদি ভিজয়ের বিয়ে হল। ওদের জানিস তো, মেয়ের বিয়েতে সাংঘাতিক খরচ। লাখ-লাখ টাকা শুধু ডাউরি দিতে হয়। সন্তোষের বাবা বোধ হয় সবই দিয়েছিলেন খালি ওরা একটা ফ্ল্যাট চেয়েছিল অন্তত দেড় হাজার স্কোয়্যার ফুটের, তো সেইটে দোব দোব বলে দেননি। মানে দিতে পারেননি আর কি!'

ভেঙ্কট বলল, 'লাখ লাখ টাকা পণ, আবার ফ্ল্যাট? আই ব্বাপ। তো তারপর?'

মিঠু বলল, 'ভিজয়কে ওরা ভীষণ খোঁটা দিত, মারধর করত। ভিজয় আত্মহত্যা করে। তারপর ওর বাবা কেমন হয়ে যান। একদিন কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছেন। আজও হাজার থানা পুলিশ করেও ওরা কোনও খবর পায়নি। বিজনেস

গুটিয়ে ফেলেছে, অ্যাসেটস বিক্রি করে দিয়েছে। সন্তোষরা তো তিন বোন, সবচেয়ে ছোট ভাই। সন্তোষ তাই রিসেপসনিস্টের চাকরি নিয়েছে।'

ভেঙ্কট বলল, 'স্যাড। ভেরি স্যাড। আচ্ছা আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা একটা "সেল" করতে পারি না। যেখানেই ডাউরির ব্যাপার আছে খবর পেলেই চলে যাব, আর আচ্ছা করে প্যাঁদানি দোব!'

গৌতম বলল, 'হ্যাঁ তোর এবার ওইটেই বাকি আছে। সবার সব করছিস তো, এবার লার্জ-স্কেল সোশ্যাল-ওয়ার্কে নেমে পড়। পুলিশকে ছুটি দিয়ে দে। কোর্ট-ফোর্ট উকিল-ব্যারিস্টার এদেরও ছুটি করে দে।'

রাজেশ্বরী বোধ হয় অনেকের জটলা দেখেই পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। শেষ কথাগুলো তার কানে গিয়েছিল। সে বলে উঠল, 'তা যদি বলিস গৌতম আমাদের আত্মপ্রসাদের মোড়ক খুলে নিজেদের একটু বহির্বিশ্বে বার করে আনারও দরকার আছে। চতুর্দিকে করাপশন, ঘুষ-ঘাষ আর ব্ল্যাক-মানির ফোয়ারা ছুটছে, কেউ কাজ করে না, এদিকে আসামে, ত্রিপুরায়, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে কী হচ্ছে বল। সমস্ত দেশটা রক্তে স্নান করছে, আর আমরা বছরের পর বছর বইপত্তর ব্যাগে করে প্রাণপণে ইস্কুল করে যাচ্ছি। কানে গুঁজেছি তুলো আর পিঠে বেঁধেছি কুলো।'

'তাহলে কি করব বল?' গৌতম ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিছু মনে করিস না রাজেশ্বরী কিছু পলিটিক্যাল লোচ্চা নিজেদেরটা গুছিয়ে নেবার জন্যে খুনোখুনি মারামারিতে মাতিয়ে দিয়েছে দেশটাকে। সেই ফাঁদে পড়ে, আমরা নিজেদের কেরিয়ার-টেরিয়ার সব ফেলে গাধার মতো দৌড়ব দেশ সামলাতে?'

'রাজেশ্বরী বলল, 'তাই বলে এই রকম উদাসীন হব? জাস্ট আমাদের টাচ করছে না বলে ব্যাপারগুলো! পাঞ্জাবের পরিবারের পর পরিবার খতম হয়ে যাচ্ছে, কাশ্মীরে ...'

গৌতম উত্তেজিত হয়ে বলল, 'উদাসীন হব। হ্যাঁ হ্যাঁ, একশবার উদীসন হব। আমাদেরও বাবা মা-ভাই-বোন আছে। আমরা এই ইঁদুর-দৌড়ে জিততে না পারলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরো পরিবারগুলো ধসে পড়বে। বন্দুক ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে না। স্রেফ না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে শেষ হয়ে যাবে। হুঃ, পাঞ্জাবে সন্ত্রাস। ওসব বিপ্লবের বিলাস করার সময় যাদের আছে তারা করুক। স্বাধীনতার পর নেহরু-গর্ভমেন্টের মদতে গ্রীন রেভোল্যুশন কোথায় সম্ভব হয়েছিল রে? বিভক্ত বাংলায় নয়, বিভক্ত পাঞ্জাবে, মাথা-পিছু আয় পাঞ্জাবে সবচেয়ে বেশি। পাঞ্জাবের চাষী যে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং পেয়েছে ভারতবর্ষের কোথ্থাও কেউ পায়নি, এত কিসের রে? শুধু শুধু খলিস্তান-খলিস্তান করে ক্ষেপে উঠেছে!' রাজেশ্বরী লাল মুখে বলল, 'যতই যাই বলিস, আমরা ছাত্ররা ভয়ানক স্বার্থপর।'

'চেঞ্জ ফর দা বেটার', গৌতম হাঁকড়ালো, 'বারীন ঘোষ, উল্লাসকর, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী। ওই তোদের মাতঙ্গিনী হাজরা। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সূর্য সেন—সব কী পেয়েছে রে? কী পেয়েছে তাদের পরিবার, পরের জেনারেশন? বেরিড, বেরিড, এখন তো সবাই বলে মহাত্মা গান্ধী আর কংগ্রেসই স্বাধীনতা সম্ভব করেছে। বেরিড, বেরিড, দোস ব্রেভ সোল্‌স্ হ্যাভ বীন বেরিড ফর এভার অ্যান্ড এভার।'

রাজেশ্বরী বলল, 'একটা দেশকে শুধু সঠিক পথে চালনা করতে গেলেই কতজনের স্যাক্রিফাইস দরকার হয়, তার স্বাধীনতা!'

'তা স্যাক্রিফাইসটা এই পলিটিকসের লোকগুলো করুক না কেন? নেপোর দল যত

সব। সামনে পেছনে সানাইয়ের পোঁ অলা গাড়ি, লাখ লাখ টাকা ইলেকট্রিক আর টেলিফোনের বিল, গোষ্ঠীবর্গ নিয়ে যখন তখন সুসম্পর্ক রক্ষার্থে বিদেশ সফর। আত্মীয়-স্বজন যে-যেখানে সুনজরে আছে সাতপুরুষের বসে-বসে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া—এগুলো বাদ দিক, কি একটু কমাক। আমাদের ওপর স্যাক্রিফাইসের খাঁড়াটা না নামালেই হচ্ছে না ?'

'আচ্ছা বাবা আচ্ছা, করিসনি কিচ্ছু। তোকে কিছু করতে বলছি না। হাতজোড় করছি', রাজেশ্বরী রণে ভঙ্গ দিল।

গৌতম বলল, 'করব না নয়। করব। তোরা যতটা বিলাস-ব্যসনের পেছনে ছুটবি, বাজি রেখে বলতে পারি আমি তার চেয়ে কম ছুটব। যা সুযোগ, যেটুকু—আমার চারপাশে আছে, কেঅস, সবটাই কেঅস, এই কেঅস থেকে যদি নিজেকে একটা সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। সেটাই আমার দিক থেকে দেশকে দেওয়া হবে। একটা সৎ, বুদ্ধিমান, যুক্তিপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ নাগরিক। বল রেয়ার কিনা। তা সেই রেয়ার জিনিসটাই আমি আমার দেশকে দিতে চাই। মিছিল, স্লোগান, হঠাৎ হঠাৎ সব ঝটিকা প্রোগ্রাম, পদযাত্রা আর বড় বড় আলোচনা—এ সবেতে আমার ঘেন্না, ঘেন্না ধরে গেছে। কত বোকা এদেশের লোক তাই ভাবি যে দিনের পর দিন ধোঁকা খেয়ে যাচ্ছে।'

মিঠু এবার হাত নেড়ে বলল, 'তোরা চুপ করবি ? এই গৌতম, এই রাজেশ্বরী। এই অবস্থায় সন্তোষকে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি !' রাজেশ্বরী কিছু জানে না। সে মিঠুর কাছে গিয়ে বসে অবহিত হল। ভেঙ্কট বলল, 'সন্তোষের তো অনার্স নেই। সুদ্দু তিনটে পাস সাবজেক্ট। আমরা আমাদের নোটস ওকে সাপ্লাই দিতে পারি। সে ক্ষেত্রে ওর কলেজে আসার সময়টা বেঁচে যাবে। চাকরি করতে হচ্ছে যখন।'

মিঠু বলল, 'ঠিক বলেছিস। রাজেশ্বরী যাবি আজ সন্তোষদের বাড়ি ?'

রাজেশ্বরী বলল, 'আমার একটা মিটিং আছে। আচ্ছা চল। সন্তোষের বাড়ি থেকে সোজা চলে যাব। ক্লাসগুলো হয়ে যাক।'

যে যার ক্লাসের খোঁজে চলে গেল। রাজেশ্বরী একটু এগিয়ে গেছে ভেঙ্কটেশ গৌতমের কাঁধে চাপড় মেরে বলল, 'ব্রাভো গুরু, কী দিলে ?'

গৌতম বলল, 'এই পলিটিকস-করা ছেলেমেয়েগুলোর লম্বা লম্বা কথা শুনলে মাইরি আমার গা জ্বালা করে। স্যাক্রিফাইস ? থেকেছিস কখনও বাবা-মা-দিদির সঙ্গে এক ঘরে ? খেয়েছিস দিনের পর দিন মাছের বালাই শূন্য লাঞ্চ ডিনার ? পড়েছিস হাটের মাঝ-মধ্যিখানে ?'

ভেঙ্কটেশ বলল, 'গুরু তুমি জিতলে, দেখলুম। কিন্তু পরাজয়ও কী সুন্দর ! হেরে মেয়েটা তোমাকে ল্যাং মেরে বেরিয়ে গেল।'

গৌতম বলল, 'ভ্যাট ? আচ্ছা তো তুই ?'

'কুল'টা দেখলে ? কী কা-মা ! তুমি উত্তেজিত, কিন্তু ও ভাষা দিচ্ছে, আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করছে না, এমনকি জয়পত্রটা তুলে দিল তোমার হাতে কী গ্রেসফুলি !'

গৌতম হেসে ফেলে চড় তুলে বলল, 'মারেগা এক ...'

ভেঙ্কট দ্রুত তার নাগালের বাইরে চলে যেতে যেতে বলল, 'যতই মারো আর ধরো ইয়ার, রাজেশ্বরী ইজ রাজেশ্বরী। তুমি ওর নাগাল পাচ্ছ না।'

'নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করতে আমার বয়ে গেছে।'

'তাহলে তুমি অত বাতেল্লা দিচ্ছিলে কেন ? কোনদিন তো তোমায় অত একসাইটেড

হতে দেখিনি !'

'তুই কি ভাবছিলি আমি ওকে ইমপ্রেস করবার চেষ্টা করছিলুম ! ওঃ ভেঙ্কট তোর মাথাটা এক্কেবারে গেছে।'

ক্লাসে পৌঁছে ঠিক রাজেশ্বরী পেছনে বসে গৌতম সারাক্ষণ টিপ্পনি কাটতে থাকল, 'এই রাজেশ্বরী ভেঙ্কটরমণ তোর বক্তৃতায় মাত হয়ে গেছে।' রাজেশ্বরী মুখটা একটু কাত করে বলল, 'বক্তৃতা তো তুই দিলি, আমি আর কী দিলুম ?'—'ওইতেই মাত। এক্কেবারে মস্ত্ !' ভেঙ্কট চিমটি কাটছে, 'উঃ', গৌতম চাপা গলায় বলে উঠল, 'রাজেশ্বরী, সত্যি-কথা ফাঁস করে দিচ্ছি বলে ভেঙ্কট আমায় চিমটি কাটছে।' রাজেশ্বরী বলল, 'কী সত্যি কথা ?'—'ওই যে ভেঙ্কট মস্ত্ হয়ে আছে !' ভেঙ্কট আরেকটা চিমটি কাটতে গৌতম সরবে চেঁচিয়ে উঠল, 'উঃ।'

নন্দিতাদি লেকচার থামিয়ে বললেন, 'ওন্ট ইয়ু এভার বী সিরিয়াস ?'

গৌতম বলল, 'ম্যাডাম, রাম-চিমটি কেটেছে, রাম-চিমটির ইংরিজি কী আমি জানি না।'

নন্দিতাদি বললেন, 'ভেঙ্কট, অ্যায়াম সরি। বাট প্লিজ গেট আউট অফ দা ক্লাস।'

ভেঙ্কট হাত জোড়া করে উঠে দাঁড়াল, 'এবারের মতো মাফ করে দিন ম্যাডাম। বড্ড ক্ষতি হয়ে যাবে। ব-ড্ড ক্ষতি হয়ে যাবে।' ক্লাস-সুদ্ধ চাপা হাসি হাসছে তার রকম দেখে। নন্দিতাদি চেষ্টা করে হাসি চেপে বললেন, 'অল রাইট। সিট ডাউন প্লিজ অ্যান্ড ডোন্ট ডিসটার্ব দা ক্লাস।'

ক্লাসের শেষে রাজেশ্বরী হেসে বলল, 'উঃ ভেঙ্কট। তুমি হলে ক্লাসের প্রাণ, তন্ময় অবশ্য মাথা কিন্তু ডেফিনিটলি তুমি হচ্ছ প্রাণ।' সে বেরিয়ে যেতে ভেঙ্কট নিজের বুকে হাত রেখে বলল, 'আর তুমি ? তুমি হলে হৃদয়।'

তন্ময় পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। ভেঙ্কটের ফচকেমি আজকাল আর ভালো লাগে না তার। আরেকটা ক্লাস আছে এক পিরিয়ড পরে। সে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসল ডে-কার্ডে একটা গল্পের বই নিল। বাংলা গল্পের বই—কমলকুমার মজুমদার। অদ্ভুত ধরনের বাংলা লেখেন ভদ্রলোক। দুস্তর কিছু পার হবার একটা মজ্জাগত বাসনা আছে তন্ময়ের। সেইজন্য অন্যান্য সহজবোধ্য, সুখপাঠ্য বই ফেলে কমলকুমার নিয়ে বসেছে। আজকাল সহপাঠীদের সঙ্গ একেবারে ভালো লাগে না। বিষ্ণুপ্রিয়া থার্ড ইয়ারের ক্লাস আরম্ভ হয়ে থেকে আসছে না। ভর্তি হয়ে আছে কিন্তু আসছে না। তার সঙ্গে দেখা হবার উপায় নেই। কী এক মধ্যযুগীয় বাড়ি ! সহপাঠী সে পুংলিঙ্গ হলেই নো অ্যাডমিশন। এরকম আজকালকার দিনে শিক্ষিত পরিবারে হয় ? বিষ্ণুপ্রিয়া আসছে না, কিন্তু সে সযত্নে তার জন্য দরকারি ক্লাস নোটস জিরক্স করে রাখছে। কবে রেজাল্ট বেরোবে কে জানে ! ক্লাসের আরও কেউ-কেউ আসছে না। রেজাল্ট বার না হলে আসবে না বোধ হয়। তন্ময়ের পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। প্রিয়া কী রকম দিল কে জানে ? পরীক্ষার আগে দু-একদিন দেখা হয়েছে লাইব্রেরিতে। খুব ব্যস্ত হয়ে বই খুঁজতে লেগে গেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। আবার কখনও তাকিয়ে ফিকে হেসেছে,, 'ভালো আছ ?' ব্যাস। অ্যাতো রাগ ! তন্ময়ের এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার পাশে থাকাটা যে এখন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা একা-একা লাগে।

শেষ ক্লাসটা হয়ে যাবার পর সে হঠাৎ ঠিক করল বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি যাবে খোঁজ করতে। একজন বন্ধু আরেক জনের খোঁজ করছে। বিশেষ করে সে দীর্ঘদিন কলেজ

যাচ্ছে না বলে।

বাড়িটার সামনে এসে একবার ইতস্তত করে বেলটা বাজাল তন্ময়, ভেতরে ঝনঝন করে একটা রাক্ষুসে আওয়াজ হল, এত জোর যে বাইরে দাঁড়িয়েও তন্ময় চমকে গেল। দরজাটা খুলে গেল। কোমরে ধুতির খুঁট কষে বাঁধা একটি লোক, 'বিষ্ণুপ্রিয়া বাড়ি আছে ?'

'বিষ্ণুপ্রিয়া ? ও বুড়ি ? আপনি কে ?'

'কলেজ থেকে এসেছি। ও যায় না, প্রোফেসররা খোঁজ করছেন।' বয়স্ক কাজের লোকটিরও কেমন একটা দৃঢ়, রক্ষণশীল ব্যক্তিত্ব, অজান্তেই তন্ময়ের মুখ দিয়ে মিথ্যা কৈফিয়ত বেরিয়ে এলো।

লোকটি তাকে একটা বৈঠকখানা ঘরে এনে বসালো। পুরনো কালের তক্তাপোশের ওপর জাজিম বিছোনো। কিছু সোফা-কৌচ, গদি-দেওয়া কাঠের চেয়ার। শ্রীরামকৃষ্ণ আর সারদা দেবীর ছবি। শ্রীঅরবিন্দর ছবি-ওলা একটি ক্যালেন্ডার। মাথার ওপরে বিরাট হাতাঅলা আগেকার ডি সি ফ্যান।

'তুমি ?' দরজার সামনে বিষ্ণুপ্রিয়া এসে দাঁড়িয়েছে। একটা লম্বা চেক-চেক স্কার্ট। দুদিকে দুটো বেণী। বিষ্ণুপ্রিয়া যেন বাচ্চা স্কুলের মেয়ে।

'কী ব্যাপার তোমার ? কলেজে যাও না !' তন্ময় বলল কোনরকমে। বিষ্ণুপ্রিয়ার উপস্থিতিতে সে যেন হঠাৎ জমে গেছে। তার ভেতরে রক্তস্রোত সব কিসের প্রতীক্ষায় জমে অনড় হয়ে গেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া সামনের চেয়ারে বসল। বলল, 'রেজাল্ট না বেরোলে গিয়ে লাভ ? হয়ত অনার্স পাব না।

'ক্লাস কিন্তু ভালোই আরম্ভ হয়ে গেছে। তুমি মুশকিলে পড়বে। অনার্স পাবে না বলছ কেন ? ভালো হয়নি ?' থেমে থেমে তন্ময় বলল।

'ভালো মন্দ কিছু বুঝতে পারিনি। লেখার কথা লিখে দিয়ে এসেছি।'

'তার মানে ভালোই হয়েছে।—এত রাগ করে আছ কেন ?'

'রাগ ?' বিষ্ণুপ্রিয়া হঠাৎ ভীষণ অপ্রস্তুত মুখে তার দিকে চাইল। বলল, 'রাগ করে নেই তো !'

'প্রিয়া একদিন একটু এসো, অনেক কথা বলার ছিল। প্লিজ।'

বিষ্ণুপ্রিয়া হঠাৎ বলে উঠল, 'ও মা, এখনও তোমার চা আনল না।'

সে দৌড়ে ভেতরে গেল। সঙ্গে মাকে নিয়ে ঢুকল। তার হাতে একটা ট্রে। তার সামনে টেবিলের ওপর ট্রে-টা নামিয়ে রেখে বিষ্ণুপ্রিয়া হেসে বলল, 'সব খেতে হবে কিন্তু।'

'মা এ আমাদের কলেজের সবচেয়ে ভালো ছেলে। তন্ময় হালদার।'

বিষ্ণুপ্রিয়ার মা হঠাৎ অবাক হয়ে বললেন, 'ও মা !' তিনি মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি করে হাসলেন। বললেন, 'খাও বাবা।'

'আমি এত খাই না,' প্লেটের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে তন্ময় বলল।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, 'চালাকি করবে না, সব খেতে হবে। জানো মা, ও খুব ভালো রান্না করতে পারে। সব রকম !'

'ওমা', বিষ্ণুপ্রিয়ার মা বললেন। চা আনল প্রৌঢ় চাকরটি। বিষ্ণুপ্রিয়ার মা সামনে বসে খাওয়ালেন।, 'কী তোমার মতো হয়েছে ?' জিজ্ঞেস করলেন হেসে। তন্ময় বলল

এসব তো আমি পারি না, পাটিসাপটা, মাছের চপ এসব ? অসম্ভব !' সে চায়ে চুমুক দল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মা বললেন, 'ও মাঃ !' তিনি হেসে উঠলেন, যেন তন্ময় খুব হাসির কথা লেছে। তন্ময় বলল, 'তুমি কি কিছু নোট রাখবে বিষ্ণুপ্রিয়া ?'

'দাও।' বিষ্ণুপ্রিয়া হাত বাড়াল।

তন্ময় বলল, 'কিছু-কিছু জেরক্স করিয়ে রেখেছি। এটা কিন্তু নেই। সপ্তাহখানের মধ্যে দিতে পারবে তো ? না, ধরো দিন দশেক !'

'হ্যাঁ', বিষ্ণুপ্রিয়া মাথা হেলালো।

দিন চারেক পরে। বোন বলল, দাদা তোর একটা রেজিস্টার্ড পার্সেল এসেছে।

'রেজিস্টার্ড পার্সেল ? আমার ?' অবাক হয়ে পার্সেলের দড়িগুলো ছুরি দিয়ে কাটতে লাগল তন্ময়। ভেতরে সযত্নে প্যাক করা তার সেই নোটস। তন্ময় খুঁজতে লাগল কোথাও যদি আর একটাও কাগজ থাকে. ছোট্ট একটা চিরকুট। নাঃ। আর কিছু নেই। কিচ্ছু নেই।

নোটগুলো হাতে করে চুপচাপ নিজের পড়ার চেয়ারে বসে রইল তন্ময়। তার ভেতরটা যেন হঠাৎ কে কিসের কাঠি ছুঁইয়ে স্তব্ধ করে দিয়েছে। 'মানে কী ? কি মানে এর ? রাগ ? অভিমান ? না বিতৃষ্ণা ! ক্রমশই বইয়ের থাক, সব রকমের তত্ত্ব, মা-বাবা-বোনের কথাবার্তা, বন্ধুদের সংসর্গ সবই তন্ময়ের একদম অর্থহীন মনে হতে লাগল। নিজের ওপর তার একটা ভীষণ বিতৃষ্ণা বোধ হতে লাগল। এমন কী কঠিন অভিমান যা সে ভেদ করতে পারবে না ! কমলকুমারের বাংলার চেয়ে দুর্বোধ্য, দুঃসাধ্য হয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার মান ভাঙানো !

১৭

তারা যেন রূঢ় হাতে পর্দা সরিয়ে ওদের তিনজনের ...

সুহাস পুনেতে একটা খুব পছন্দসই কাজ পেয়েছে। এতদিন সে খালি ধরছিল আর এবার মনে হচ্ছে স্থিত হবে। 'এক্সপ্রেশনস' নামে এই প্রতিষ্ঠানটি সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে পাবলিক থিয়েটার, স্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষ, বাগান, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি বানাচ্ছে। খুব নাম করেছে শিল্পসম্মত কাজের জন্য। সুহাস এর আগে ওদের একটি 'লোগো' প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়। এবারে ওরা একটা আর্ট গ্যালারির লে-আউট চেয়েছিল অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে। স্কোয়্যার ফুটেজ, মোটামুটি ব্যয়ের একটা হিসেবও দিয়ে দিয়েছিল। তারই বিচারে সুহাস চাকরিটা পেয়েছে। এটা ছিল বলতে গেলে তার একটা স্বপ্নই। ও একটা ছোট বাংলো পাবে পুনের শহরতলিতে।

সুহাস বলল, 'মা, ধরো যদি একটা বিয়ে শাদি করি এবার।'

'বিয়ে তো একটাই করবি।' তার মা হাসি-হাসি মুখে জবাব দিলেন।

'তা নয়। আসলে, আমার একজনকে বিশেষ পছন্দ।'

'সে তো খুব ভালো কথা। নিয়ে আয় একদিন মেয়েটিকে, আলাপ করি।'

'চেনো তাকে, আসে মাঝে মধ্যে, মিঠুর বন্ধু।'

মিঠু ছিল। খুব উৎসাহিত হয়ে বলল, 'কে ? ঋতু ?' যদিও ঋতু দাদার বউ হবার

সম্ভাবনায় সে খুব খুশি নয়।

'উঁহু, ইমন।' সুহাস বলল। তার মুখে একটু একটু লজ্জার হাসি।

অনুরাধা অবাক হয়ে বললেন, 'ইমন ? কিন্তু ইমন তো একটা স্টার। ওকি এখন কিংবা তোকে বিয়ে করতে চাইবে ? বলেছিস ?'

'না মা। বলি টলিনি। তোমরা বলো, ইমনের মাকে জানাও।' সুহাস কেমন একট সহজাতবোধে বোঝে ইমনের মার ভীষণ গুরুত্ব।

'সুহাস, ওরা আবার তার ওপর মুখার্জি। মফস্বলের পরিবার। আমাদের বাড়ি ... রাজি না-ও হতে পারে। না হবার সম্ভাবনাই বেশি।' অনুরাধার মুখটা বলতে বলতে চুপসে যেতে থাকে।

সুহাস অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'ইমন খুব প্রোগ্রেসিভ মা।'

'ইমন হতে পারে। কিন্তু ওর মা না-ও হতে পারেন সুহাস। সে ক্ষেত্রে ... তা ছাড় ওর খেলা !'

'ও যাতে খেলার সুযোগ পায় সেটা আমি সব সময়েই দেখব। খেলা আর কতদিন ধরো দশ বছর ! তার পর টেবল-টেনিস প্লেয়ারের আর ধার থাকে না। ও যদি চালাতে পারে, নিশ্চয় চালাবে।'

মিঠু বলল, 'কিন্তু দাদা ওর যদি কাউকে পছন্দ থাকে !' সে ঋতুর কথাগুলো মনে করে বলল।

'না, সে রকম কিছু নেই।' সুহাস জোর দিয়ে বলল।

'তুই কী করে জানলি ? তুই তো ওর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলিসনি।'

সুহাস এবার একটু লাল হয়ে বলল, 'আমি ওসব খেলার জগতের খবরাখবর রাখি ইমনের তেমন কোনও বন্ধু নেই।'

মিঠু অনেকক্ষণ ধরেই আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। সে বলল; 'দাদা, তু এতদিনে একটা কাজের মতো কাজ করলি।'

অনুরাধা বললেন, 'বাজে কথা ছাড় তো ! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি ! ইমনকে অনেক দিন দেখি না। একদিন ডাক। এসে থাকুক কদিন। সেই সময়ে ওকে বলা হবে।'

মিঠু খবর নিয়ে এলো ইমন বাড়ি গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই। মিঠু ওর ঠিকানা নিয়ে ফিরেছে। ওরা তিনজন রানাঘাট যাবে। ওদের ইচ্ছে বাবাও যান। কিন্তু সাদেক কিছুতেই রাজি হলেন না। বললেন, 'কোনও সামাজিক ব্যাপারের শুরুতে তোমরা আমাকে নিয়ে যাবার কথা কী করে ভাবো ? দেখবে হয়ত আমার জন্যেই ব্যাপারটা আটকে যাবে।' ছেলে-মেয়ের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'কী আশ্চর্য বী প্র্যাকটিক্যাল।'

মিঠু চুপিচুপি দাদাকে বলল, 'আচ্ছা দাদা, ইমনের মা যদি খুব গোঁড়া হন, রাজি না হন তাহলে ?'

সুহাস বলল, 'ইমন নিজে যদি সংস্কার কাটাতে না পারে, তাহলে আর কী ! হবে না।' 'হবে না'টা সে খুব হতাশভাবে উচ্চারণ করল।

কৃষ্ণনগর লোক্যালে ওরা যখন রানাঘাটে পৌঁছল বারোটা বেজে গেছে। ইছাপু ছাড়িয়ে ট্রেন থেমে রইল বহুক্ষণ। হট্টগোল, মারামারি, কয়েক দফা নালিশ নিয়ে রেল রোকো আন্দোলন শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। উদ্বিগ্ন হয়ে কোনও লাভ নেই। এসব লাইনে

এইরকমই হচ্ছে আজকাল। দুটো সাইকেল রিকশা করে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছল ওরা সাড়ে বারো নাগাদ।

'জকপুর রোডের হাসপাতাল বলতে এটাই', রিকশাওয়ালা বললে, 'সব আছে, বাচ্চাদের, ছোঁয়াচে রোগের স-ব। টি. বি হাসপাতাল অন্য দিকে।'

'না না, এটাই আমাদের দরকার', অনুরাধা ঠিকানা-লেখা কাগজটার দিকে চোখ রেখে বললেন।

বিরাট চত্বর জুড়ে, ঘেরা পাঁচিলের মধ্যে হাসপাতাল। মেন বিল্ডিংটার দিকে যেতে যেতে অনুরাধা বললেন, 'হাসপাতালের ঠিকানা কেন রে মিঠু?' তাঁর হাসপাতাল একেবারে ভালো লাগে না।

সুহাস বলল, 'কত বড় জায়গা দেখছ না, এখানেই নিশ্চয়ই কোয়ার্টার্স। অফিস বলে মনে হল যে ঘরটাকে, সেটাতে ঢুকে সুহাস বলল, 'আচ্ছা, মিসেস শান্তি মুখার্জি নামে একজন সিসটারকে আমরা খুঁজছি...। ওঁর কোয়ার্টার্স... ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'দক্ষিণের বিল্ডিংটা দেখছেন, ওইখানে স্টাফ কোয়ার্টার্স, ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।'

পাশ থেকে আরেকজন বললেন, 'কী নাম বললেন—শান্তি মুখুজ্জে? আমাদের পরিতোষ মুখুজ্জ্যের স্ত্রী নাকি? কিন্তু নার্স তো নয়! এই মহাদেব! স্মৃতি আছে কি না দেখো তো!'

তিনি ওদের দিকে ফিরে সহানুভূতির সুরে বললেন, 'প্যারালিসিসের কেস নাকি? ট্রেইন্ড আয়া চাইলে কিন্তু শান্তি মুখুজ্জ্যেকে দিয়ে হবে না। ওর কোনও ট্রেনিং নেই।' অনুরাধা বা সুহাসের দিক থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে ভদ্রলোক দেশলাই কাঠির পেছন দিয়ে নিজের কান খোঁচাতে আরম্ভ করলেন।

কিছুক্ষণ পর নীল পাড় সাদা শাড়ি পরা একজন মহিলা এসে দাঁড়াতে ভদ্রলোক বললেন, 'শান্তি ডিউটিতে এসেছে নাকি স্মৃতি?'

স্মৃতি নামের মহিলা বললেন, 'শান্তিদি তো এক তলাতেই ৩ নম্বর কেবিনে ডিউটিতে রয়েছে? কেন?'

'এঁদের দরকার, একবারটি ডাকো দিকিনি!'

স্মৃতি বললেন, 'আপনারা বাইরে এসে দাঁড়ান, আমি ডেকে আনছি।'

বাইরে অপেক্ষা করতে করতেই ওরা দেখতে পেল, ভেতর দিক থেকে নীল পাড় সাদা শাড়ি পরা বিশুষ্ক চেহারার এক মহিলা স্মৃতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছেন, 'এঁরা।' ওদের দেখিয়ে স্মৃতি বললেন।

'তাড়াতাড়ি বলুন, পেশেন্ট বড় খিটখিটে, এক্ষুনি তেড়েমেড়ে উঠবে।'

'আমরা ইমনের খোঁজে এসেছি। এ ইমনের বন্ধু মিঠু,' মিঠুর পিঠে হাত রেখে অনুরাধা বললেন।

ভদ্রমহিলার মুখ লাল হয়ে গেল। তিনি মুখ নিচু করে আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে লাগলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

'আমরা আপনার বাড়ি যাব, যদি একটু দেখিয়ে দেন।'

শান্তি দৌড়ে গিয়ে স্মৃতি নামের সেই মহিলাকে কী বলে এলেন, তারপর অনুরাধার দিকে ফিরে, চোখ না তুলে বললেন, 'আসুন।'

হাসপাতালের গেট পেছনে ফেলে, জকপুর রোড পেছনে ফেলে একটা সরু রাস্তার

মধ্যে ঢুকলেন ইমনের মা। একটা ছাল-চামড়া ওঠা টালির চালের বাড়ি। ইট বার করা সিঁড়ি দিয়ে দাওয়ায় উঠল সবাই। কালো রঙের দরজাটা ঠেলে মহিলা খুব আস্তে গলায় ডাকলেন, 'ইমন।'

কালো চেক-চেক শাড়ি পরা হিলহিলে ইমন কোমর থেকে পায়ের পাতা অবধি ফ্রেম-আঁটা ভাইকে হাঁটাচ্ছে। সবে এসেছে এই ফ্রেম, জুতো। মুখ তুলেই সে ছবির মতো দাঁড়িয়ে গেল। তার মুখের সব রক্ত কে শুষে নিয়েছে।

একপাশে ইটের সারির ওপর বসানো তক্তাপোশ। তার ওপর চৌখুপি কাটা বেডকভার পাতা। তলায় হাঁড়িকুড়ি, শিলনোড়া, বাসনপত্র। কোণে স্টোভ। দেয়ালে দড়ি টাঙানো। তাতে শাড়ি, প্যান্ট, গামছা।

'তুই অনেক দিন যাসনি ইমন, তোকে অনেক দিন...' মিঠু কথা শেষ করতে পারল না। ইমনের মুখের সেই পরিচিত হাসি, অভ্যর্থনা এসব সে খুঁজে পাচ্ছে না। ইমন এখনও তাকে বসতে বলেনি। কোনও রকম আনন্দ প্রকাশ করেনি। ইমনের মা তক্তাপোশটা হাত দিয়ে ঝেড়ে বললেন, 'বসুন আপনারা, আমি যাই, ডিউটি ফেলে এসেছি।'

অনুরাধা সুহাসের দিকে একবার তাকিয়ে কী বুঝলেন তিনিই জানেন, হঠাৎ বললেন, 'আপনি একটু দাঁড়িয়ে যান মিসেস মুখার্জি। আপনার কাছে আমার একটা জরুরি আর্জি ছিল।'

মা মেয়ে দুজনেই তাকিয়ে তাঁর মুখের দিকে। অনুরাধা বললেন, 'আমাদের ইচ্ছে আপনার মেয়েটিকে আমাদের ঘরের মেয়ে করে নিই। এই যে আমাদের ছেলে সুহাস। পঁচিশ বছর বয়স ওর। আর্কিটেক্ট। পুনাতে চাকরি করছে। প্রস্তাবটা আজ রেখে গেলাম। আপনি... আপনারা বিবেচনা করে জবাব দেবেন।'

ইমনের মা হঠাৎ কেঁদে ফেলে মুখ ঢাকলেন, 'ওই মেয়েই সব, মেয়ে ছাড়া তো আমার কেউই নেই।' তারপর মুখ মুছে ফেলে অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পেশেন্ট খুব খিটখিটে। আমি যাই।' তিনি নিঃশব্দে দরজা দিয়ে বার হয়ে গেলেন।

অনুরাধা বললেন, 'ইমন, আমার সঙ্গে কথা বলবি না?'

ইমন জোর করে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'মাসি, আপনাদের জন্যে খিচুড়ি চাপিয়ে দিচ্ছি, এখুনি হয়ে যাবে। প্রেশার কুকার আছে। বসুন।'

'তুই অত ব্যস্ত হস নি। আমরা একেবারে না বলে-কয়ে হুট করে এসে পড়েছি। স্টেশনের কাছে অনেক হোটেল আছে। কোনও একটাতে খেয়ে নেবো। আমরা চলি রে!'

'না না, যাবেন না, আমি এখুনি রেডি করে দিতে পারব, সময় লাগবে না।'

মিঠু বলল, 'আমি ওকে হেল্প করি না মা, চট করে হয়ে যাবে।'

অনুরাধা কী ভেবে বললেন, 'ঠিক আছে কর। সুহাস আমরা বরং একটু ঘুরে আসি।' তিনি তাঁর ঝোলা থেকে কমলা, আপেল, আঙুর আর কলকাতার উৎকৃষ্ট সন্দেশের বাক্স বার করে ইমনের ভাইয়ের দিকে এগিয়ে দিলেন, হাসিমুখে বললেন, 'তোমার নাম কী?' ছেলেটি তাঁর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে জবাব দিল, 'কল্যাণ।'

সুহাসকে নিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। শীতকাল হলে কী হবে, এই ঘিঞ্জি মফঃস্বল টাউনে মাথার পর এখনও প্রখর রোদ। অনুরাধা শালটা মাথায় ঘোমটার মতো করে জড়িয়ে নিলেন। এলাকাটা নীরবে পার হলেন দুজনে। সুহাস বলল, 'মা কোথায়

যাবে ? একটা রিকশা নিই। না হলে চিনতে পারব না।'

রিকশায় উঠে অনুরাধা বললেন, 'কোনও একটা দোকান থেকে একটু ভাজা মাছটাছ যদি পাওয়া যায়।'

সুহাস বলল, 'ছাড় তো, এই রিকশা ভাই এখানে নদী আছে না একটা।'

'আছে বাবু।'

'ওইদিকে নিয়ে চলো তো, একটু ঘুরব।'

খানিকটা ঘুরিয়ে রিকশা-অলা বলল, 'ওই দেখুন বাবু, ওপারে কলাইঘাটা, রামকৃষ্ণ ঠাকুর এসেছিলেন। পালচৌধুরীদের বাড়ি দেখবেন ?'

সুহাস বলল, 'নাঃ। মা... এভাবে না বলেকয়ে আসাটা আমাদের খুব অন্যায় হয়ে গেছে।'

'অনুরাধা শুধু বললেন, 'হুঁ।'

একটু পরে সুহাস বলল, 'মা !'

'বল্।'

'তোমার কি আপত্তি হচ্ছে এখন ?'

'আমার ? আপত্তি ? সুহাস আমার আপত্তি নেই, আপত্তির কোনও অধিকার আছে বলেও আমি মনে করি না। কিন্তু ইমন কেন এমন ব্যবহার করল ? ওর যে সরল সহজ চেহারাটা আমার চেনা আছে সেটা যেন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে...' অনুরাধার মুখে বেদনার চিহ্ন, তিনি বললেন, 'ওর মায়ের তো খুব স্পষ্টই আপত্তি। শুনলি তো। মেয়েটা আসলে ওঁর একমাত্র অবলম্বন। সুহাস আমি বুঝতেই পারছি না তুই কী করে অ্যাট অল...'

দুজনে একটা রাস্তার ধারের দোকান থেকে অনেক কষ্টে কিছু মাছ ভাজিয়ে নিতে পারলেন, বাজার বন্ধ, তবু ধরাধরি করে এক গোছা কলাপাতা। ঘণ্টা দেড়েক পরে যখন ফিরলেন তখন তক্তাপোশের একপাশে শুয়ে ইমনের ভাইটি ঘুমিয়ে পড়েছে। তার অসহায় পা দুটোর ওপর কম্বল চাপা। ইমন ঘরের মেঝে ভালো করে মুছে ফেলেছে। খিচুড়ির গন্ধ বেরোচ্ছে।

মেঝেতে শতরঞ্চি বিছিয়ে, কলাপাতায় খিচুড়ি বেগুনভাজা আর মাছভাজা পরিবেশন করল মিঠু আর ইমন। অনুরাধা বললেন, 'ইমন তুমি বসবে না ? কল্যাণ বসবে না ?'

'আমাদের তো অনেকক্ষণ খাওয়া হয়ে গেছে মাসি !' এইবারে ইমন একটু লাজুক হাসল।

'ওমা, তাও তো বটে। বেলা তো অনেক। ইসস, এত মাছ ভাজাটাজা এ কি আমাদের জন্যে এনেছি নাকি ? রেখে দাও ইমন, রাতে খেও। খাবে কিন্তু ঠিক।'

খেয়ে-টেয়ে উঠে অনুরাধা বললেন, 'আমরা এগোই ইমন, যত তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরতে পারি ততই ভালো। তোমাকে খুব কষ্ট দিলুম। শুধু শুধু।" ইমন মুখ তুলে অনুরাধার দিকে চাইল। তার চোখ দুটো যেন কী বলতে চাইছে। ভীষণ দুরূহ কিছু। বলতে পারছে না।

মিঠু বলল, 'ফিরে আমাদের বাড়ি যাস। ওখান থেকেই পরীক্ষাটা দিলে খুব ভাল হবে। দুজনেরই সুবিধে হবে। যাস ইমন !' ইমন ম্লান হেসে মিঠুর হাতটা ধরল শুধু।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে তো ইমন মিঠুদের বাড়ি গেল না। হোস্টেল থেকেই পরীক্ষা দিল। তা দিক। কিন্তু গেল না তো একবারও। পরীক্ষার সময়ে একেবারে হলে দেখা হল। তখন মিঠুর নিজেরও মাথার মধ্যে গজগজ করছে পড়া, ইমনও একটা লম্বা খাতা

নিয়ে চুপচাপ। কেমন হচ্ছে, কীরকম প্রশ্ন এসেছে এই সবই কথা হল। শেষ পেপারটার পর মিঠু খুব তাড়াতাড়ি উজ্জয়িনীর সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেল। বেশ খানিকটা যাবার পর তার মনে হল, যাঃ ইমনের সঙ্গে তো দেখা করে আসা হল না! কিন্তু তখন আর ফেরবার সময় নেই।

পরীক্ষার পর মাথাটা অবকাশ পেয়েছে অনেকটা। এখন সামনে লম্বা ছুটির দিন। ওরা সবাই পুনে যাচ্ছে দাদার কোয়ার্টার্সে। লম্বা প্রোগ্রাম। মহাবালেশ্বর, গোয়া, কেরালার উপকূল। সুটকেস গোছাতে গোছাতে মিঠুর হাত দুটো হঠাৎ শ্লথ হয়ে যায়। ইমন কি খুব রাগ করেছে? কেন? তারা যেন রূঢ় হাতে পর্দা সরিয়ে ওদের তিনজনের ঘরে উঁকি দিয়েছে। ইমন যেন ক্ষুব্ধ, অপমানিত। সেদিন ওদের বাড়িতে মা আর দাদা চলে যাওয়ার পর মিঠু যতই সহজ হতে গেছে, ইমন হয়ে গেছে ততই আড়ষ্ট, অস্বচ্ছন্দ। কী এমন ঘটল! বিয়ের প্রস্তাবের জন্যেই কি ও লজ্জা পেল? না কি তাদের ওখানে যাওয়াটাই অনধিকার প্রবেশ! আসবার সময়ে ইমন জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলল, 'আচ্ছা।' শোনাই যায় না এমন। সে কারও দিকে তাকাল না। পরে মা দাদাকে বলল, 'তোর আগে মেয়েটার মন বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। দেখ তো কী বিশ্রী হল! এ কি ছেলেখেলা?'

১৮

'শুনুন— এইটা ঠিক আমি নই...'

তৃতীয় আর চতুর্থ গেমটার মাঝখানে মিঠুর দাদা সুহাসকে লক্ষ করেছিল ইমন। খেলার সময় সাধারণত তার কোনও দিকেই হুঁশ থাকে না। নেতাজি ইনডোরে হচ্ছে, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ। সুহাসকে দেখবার পর তার শিরদাঁড়া দিয়ে কিরকম একটা গরম স্রোত নামতে লাগল। এরকম স্নায়ু-বিপর্যয় ইমনের কখনও হয় না। প্রথম দিকে টুর্নামেন্ট খেলতে নামলেই কান গরম, শিরদাঁড়ায় লাভাস্রোত। সে সময়গুলাতে ইমন নিজেকে বলত, 'ছিঃ ইমন, তুমি না মানুষ! জানো কত মানুষ পৃথিবীর অজানা, রোমাঞ্চকর, বিপজ্জনক সব জায়গায় পৌঁছে গেছে। জানো না ক্যাপটেন স্কট, আমুন্ডসেনের কথা! শোনোনি এভারেস্ট জয়ের অবিশ্বাস্য ইতিহাস, কঙ্গো নদীর উৎসের খোঁজে লিভিংস্টোন, কিংবা ইউরি গ্যাগারিন, তেরিস কোভা, নীল আর্মস্ট্রং, এঁদের চেয়েও বাধা কী তোমার বেশি, বিপদ কি তোমার বেশি! কোন লজ্জায় তোমার কান লাল হয়, শিরদাঁড়া গরম হয়! দেখো ইমন দেখো, তুমি একজন প্রতিযোগী যে কোয়ার্টার ফাইন্যাল, সেমি ফাইন্যাল হয়ে ফাইন্যালে উঠে এসেছো, এখন তুমি আর ইমন নও, তুমি তোমার সমকক্ষ প্রতিযোগীদের সঙ্গে এক পর্যায়ে, এক উপত্যকায় অধিষ্ঠান করছ, যে সমস্ত দর্শক এসেছেন তাঁরা তোমার কুশলতা, তোমার স্টাইল দেখতে এসেছেন। তোমাকে নয়।' এইরকম একটা সংলাপে নিজের সঙ্গে মগ্ন হয়ে সে আস্তে আস্তে নিজেকে সমস্ত স্নায়ু-বিপর্যয়ের ওপরে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। সুহাসকে দেখে যখন তার আবার পিঠ গরম হতে শুরু করল, ইমন মনে মনে নিজেকে একটা কষে থাপ্পড় দিল। ওই ছেলেটি তোমার খেলা নষ্ট করে দেবে? এত ঠুনকো তোমার মনোযোগ ইমন? ছিঃ! মারো, তোমার অনবদ্য ফোরহ্যান্ডের মারগুলো দেখাও, স্ম্যাশ, স্কিল্! ইমন ডান পা

এগিয়ে তার কঞ্চির মতো শরীরটাকে অপরূপ স্টাইলে নুইয়ে প্রায় মাটি থেকে বল তুলল। মায়া আশা করেনি সে এটা তুলতে পারবে। একেবারে অপ্রস্তুত। পয়েন্ট ইমনের। মায়ার সার্ভিস আবার কোণে পড়েছে বাঁ কোণে, ইমনের এবার সমস্ত শরীর লাট্টুর মতো ঘুরে যায়, ব্যাকহ্যান্ডে স্ম্যাশ। ইমনের পয়েন্ট। এবার ইমনের সার্ভিস মায়ার চেয়ে দুর্বল ছিল, ও সার্ভিসে এই এক বছরে প্রচুর প্র্যাকটিস করেছে। দেখা যাক। ইমনের পয়েন্ট। মায়া সারাক্ষণ টুক টুক করে লাফায়, শরীরে ছন্দ রাখে, বেগ রাখে। ইমন খেলার এই প্রাথমিক নিয়ম খুব একটা মানে না। তার শরীর একটা দীর্ঘায়িত স্থির-বিদ্যুৎ, সমস্ত শক্তি সংহত এবং প্রস্তুত রেখে স্থির-অস্থির। লিকলিকে হাত, নমনীয় কবজি। মায়া শুধু লাফাচ্ছেই, ঘাবড়ে গিয়ে তার মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। জিত ইমনের। ঘামে-ভেজা ইমন তার ঠাণ্ডা ভিজে শামলা হাত দিয়ে মায়ার হাত ধরেছে। মায়ার চোখ চকচক করছে। গত দুবারের চ্যাম্পিয়ন সে। হেরে গেল।

কোচ অমলদা বললেন, 'আমি জানতাম ইমন এবার তোমার দিন।'

বেঙ্গলের খেলোয়াড়রা কুসুম ভার্গিজ, মিতা মির্ধা, অলককুসুম সান্যাল, আরও অনেকে খুব নাচানাচি করছে। ইমন তার পোশাক বদলে নিয়েছে। তাপ্পি দেওয়া ফেডেড জীনস, আলগা টপ। চুলগুলো একটু বেড়েছে। কাটেনি এখনও। একটা ব্যান্ড দিয়ে আটকানো ছিল এতক্ষণ। এখন খুলে ফেলেছে সেটা। খাওয়া-দাওয়া গল্প-স্বল্প শেষ হতে সাতটা। ইমন বেরিয়ে বড় বড় পায়ে হাঁটতে লাগল। গুমটি থেকে ট্রাম ধরাই তার পক্ষে সুবিধে। কার্জন পার্কের পেভমেন্টে উঠেছে, 'ইমন! একটু দাঁড়াবে!' সুহাস। ইমন দাঁড়িয়েছে। সুহাস বলল, 'তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হত।'

'বলুন।'

'এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হয়?'

ইমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সুহাস বলল, 'আজকের সন্ধেটা আমাকে না হয় দিলে।'

'হোস্টেলে ফিরতে হবে।'

'যত তাড়াতাড়ি আমাদের কথা শেষ হবে, ততই তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে।'

'কোথায় যাবেন?'

'কোনও একটা রেস্তোরাঁয়। যেখানে বসে একটু কথা বলা যায়।'

'আমি কিন্তু প্রচুর খেয়ে এসেছি।'

'ঠিক আছে, আইসক্রিম-টিম যা-হোক নেওয়া যাবে।'

'আইসক্রিম খাই না।'

'অন্য কিছু। ওটা কোনও সমস্যা নয়। ইমন, আমি একজন ভদ্র যুবক।'

'চলুন।'

সুহাস একটা ট্যাক্সি ডাকল। পার্ক স্ট্রিট। পার্ক হোটেল। ডিনারের জন্য টেবিল সাজানো হয়ে গেছে। কোণের একটা টেবিল কোনমতে পাওয়া গেল। সুহাস কিছু স্ন্যাক্স আর কফি অর্ডার দিতে সামান্য ভ্রূ কোঁচকালো বেয়ারার।

সুহাস বলল, 'আমার ওপর, আমাদের ওপর এত রাগ করেছ কেন ইমন?'

'রাগ? নাঃ!'

'আমার অভিনন্দন নেবে না?' সুহাস তার পকেট থেকে একটা ছোট বাক্স বার করল। তার ভেতরে একটা ঘড়ি, একেবারে হাল ফ্যাশনের, অতি সুন্দর অথচ

বাহুল্যবর্জিত একটি কোয়ার্টজ ঘড়ি। সুহাস হাত বাড়িয়েছে, কিন্তু ইমন হাত বাড়াচ্ছে না।

সুহাস ভীষণ আহত হয়ে বলল, 'আমার বা আমাদের বিরুদ্ধে তোমার কী কিছু বলার আছে ইমন ?'

ইমন বলল, 'আপনারা সেদিন যে প্রস্তাবটা নিয়ে গিয়েছিলেন সেটা তো আমরা গ্রহণ করিনি যে...'

সুহাসের মুখ-চোখ কালো হয়ে গেছে, রেস্তোরাঁর আধো অন্ধকারে সেটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। সে বলল, 'এ উপহারটা তোমার খেলার একজন ভক্ত হিসেবে দেওয়া। প্রস্তাবটার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রস্তাবটা কেন ফেরাচ্ছ আমি জানতে পারব না ? আমার অপরাধ কী ?'

শেষের কথাগুলোয় ইমনের মুখটা অনেক অনেক দিন পর আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ইমন বলল, 'আপনার কোনও অপরাধ নেই। আমি বিয়ে-টিয়ের কথা ভাবি না। হয়ত কোনদিনই বিয়ে করব না।'

'কেন কেন ?' সুহাস ঝুঁকে পড়েছে।

'আপনি বুদ্ধিমান ছেলে, সেদিন আমার পরিবারের অবস্থা দেখে এসেও কেন জিজ্ঞেস করছেন ? আমি চাকরি করছি, অপেক্ষা করছি আরও বেশি টাকার চাকরির জন্যে, বোধ হয় পেয়ে যাব। তখন আমার কাজ হবে মাকে ভাইকে শহরে নিয়ে এসে বাস করা। ভাইয়ের ঠিকমতো চিকিৎসা, পড়াশোনার ব্যবস্থা করা। ভাইকে তো সারা জীবনই দেখতে হবে আমায় !'

'এর সঙ্গে বিয়ের বিরোধ কোথায়, ইমন ? তুমি চাকরি করবে, একশবার মা-ভাইয়ের জন্যে খরচ করবে। ওঁদের দেখাশোনার দায়িত্বও নেবে।'

'তা হয় না, আমার থাকা দরকার, ওদের কাছে থাকা দরকার, বিয়ে করলে অসুবিধে হবে।'

'কিন্তু আমি... আমি তো তোমাকে ভালবাসি ইমন !'

ইমন অনেকক্ষণ পরে বলল, 'আপনি কোন্ ইমনকে ভালবাসেন ?'

'এই তো তুমি, তোমাকে, আমার সামনে যেভাবে বসে রয়েছ।'

'শুনুন, এইটা ঠিক আমি নই।' সে থেমে থেমে বলল। 'আমার চুলগুলো এভাবে কাটা কেন জানেন ? যে কোনও নাপিত, ইঁট-পেতে বসা নাপিত এই ছাঁটটা কেটে দিতে পারে বলে। ছোট্ট থেকে বাবা আমাকে ছেলের মতো মানুষ করেছেন। এই যে আজকের ফ্যাশনের জীন্স্ আমি পরি, সে ফ্যাশনের জন্যে নয়... ছোট থেকে ছেলেদের পোশাক পরা আমার অভ্যাস বলে, তাছাড়াও....' ইমন একটু থামল, তারপর বলল, 'তাছাড়াও এতে খরচা বাঁচে।'

'একটা আইসক্রিম নাও না ইমন, প্লিজ...'

'আইসক্রিম আমি খেতে পারি না সুহাসদা, ভাই ভীষণ ভালবাসে।'

সুহাস মাথা নিচু করল। একটু পরে বলল, 'আমি তো তোমাকে বলেই দিলাম, মা-ভাইকে তুমি সারা জীবনই দেখবে। আচ্ছা ধরো, বিয়ের পর যদি আমি তোমাদের পরিবারকে নিয়েই থাকি !'

'তা কি হয় ? তা ছাড়া আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনও মিল নেই। আমার মা ...

আমার মা দেখলেন তো হাসপাতালে আয়ার কাজ করেন, বাবা জীবিত থাকলে কাজ হয়ত করতেন না, কিন্তু বাবাও খুব সামান্য কাজ করতেন ওই হাসপাতালেই। এইসব দিয়ে একটা গন্ডি তৈরি হয়ে যায়।' ইমন খুব ধীরে ধীরে ভাবতে ভাবতে বলছিল, 'যায় না। এখন ধরুন আমি, খেলার ক্ষমতাটা আছে বলে আমি তো, এই গণ্ডিটার বাইরে আসতে পেরেছি, বাইরের জগৎটাকেও দেখি, কিন্তু সামাজিক ভাবে যখন মিশতে যাই, আমি কুঁকড়ে যাই। সত্যি বলছি আমি কুঁকড়ে যাই।' তার খোলা হাত দুটো জড়ো করে, ইমন কুঁকড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করল, 'ভাববেন না কোনও কমপ্লেক্স থেকে, একটু কমপ্লেক্স হয়ত আছেই, কিন্তু আমি দেখি এক সমাজের মধ্যে নানান সামাজিক গণ্ডি। শুধু হ্যাভস/ হ্যাভ-নটস্‌দের নয়। উচ্চশিক্ষিত, মধ্য শিক্ষিত, বড় চাকুরে, ছোট চাকুরে, সরকারি চাকুরে, কমার্শিয়াল ফার্মের চাকুরে, সব আলাদা আলাদা সামাজিক গণ্ডি। আমি আমার মাকে কোনরকম অসম্মানের মধ্যে ফেলতে চাই না। এমন কোনও পরিস্থিতি যাতে মা কুঁকড়ে যাবে, নিজেকে ছোট মনে করবে।'

'কিন্তু ইমন, আমি তো ছোট ভাবছি না! আর তোমাকেও তোমার সমস্তটা নিয়েই আমি ভালবাসি। তোমার এই ইমেজটা অবশ্যই আমার কাছে খুব, খুব প্রিয়। কিন্তু এর বাইরে যে অন্য ইমন আছে এটা তো আমি বুঝিই।'

'শুনুন,' ইমন বলল, 'বলা সহজ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে না-ভাবা সহজ নয়। আমার মা তো কখনও মাসির মতো করে কথা বলতে পারবেন না। মায়ের চিন্তাভাবনা-ব্যবহার সবই খুব গণ্ডিবদ্ধ। প্রতিদিন এই তফাতগুলো চোখে ঠেকবে। এনি ওয়ে, আমি বিয়ের কথা ভাবি না।' ইমন হঠাৎ যেন তার ভেতরটা অনেকটা দেখানো হয়ে গেছে মনে করে কপাট বন্ধ করে দিল।

সুহাস বলল, খুব কাতর গলায় বলল, 'আমি আর দিন সাতেকের মধ্যে পুনে চলে যাচ্ছি। ইমন আমি তোমায় চিঠি লিখব। ধরে নাও আমি তোমার বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। ইমনন্‌ন্। এই ঘড়িটা...'

ইমন দাঁড়িয়ে উঠেছে। সুহাস বলল, 'সামান্য উপহার, সমঝদারের কাছ থেকে, তুমি আরও কত পাবে, সেগুলো নেবে, আমারটা শুধু আমি বলেই...'

ইমন হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে ঘড়িটা নিল, নিজের ঘড়িটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে সুহাসেরটা পরল। স্মিত মুখে বলল, 'ঠিক আছে?'

দুজনে বেরিয়ে এলো। সুহাসের পেঁছে দেবার প্রস্তাব মৃদু হেসে উড়িয়ে দিল ইমন। 'আমাকে? আমাকে পৌঁছে দিতে লাগে?' সে তাড়াতাড়ি জেব্রা-ক্রসিংয়ের দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না সে ছেলে কি মেয়ে। এমন কি তার হাঁটার ভঙ্গির মধ্যেও একটা দুলকি চাল। সে যেন একটা কিশোর ঘোড়া। তারুণ্যের প্রান্তে এসে এবার গতি দ্রুততর করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অনেককে যেন তার অনেক অনেক কথা দেওয়া আছে। তাকে এখনও অনেক দূর যেতে হবে, অনেক অনেক দূর।

আপাতত খুব ক্লান্ত লাগছে। হোস্টেলে ফিরে সে দু-চার লাফে সিঁড়ি টপকে দোতলায় উঠে গেল। তার রুম মেট অজন্তা সরকার বেডটা খালি করে দিয়ে চলে গেছে। সে একা একা উপভোগ করছে এই রুম। হাত থেকে ঘড়িটা খোলবার সময়ে সে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে হাসল। মা যদি জানতে পারে এই ঘড়ি তার পাণিপ্রার্থী, সেই উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবিত্ত মহিলার, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, সুপাত্র যুবকের দেওয়া মা কেঁদেকেটে অনর্থ বাধাবে। ওরা তাদের বাড়ি যাবার পর থেকেই মা কারণে অকারণে ফোঁস ফোঁস করে

কাঁদে। শহরে থাকতে এসে, বড় খেলোয়াড় হয়ে, ইমন তো এমনিতেই অনেক দূর চলে গেছে বলে ভাবে মা। 'তারপর ওই সমস্ত মার ভাষায় 'সমন্ধ' ! ইমন তার কৃতিত্ব, তার সঞ্জীবনী দায়িত্বশীল উপস্থিতি, তার টাকা রোজগারের ক্ষমতা সমস্ত নিয়ে মা আর ভাইয়ের রুগ্ন অভাবী পৃথিবীটা থেকে হুশ করে একদম উঠে যাবে।

ইমন শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, 'এবার কী ? এর পর ? সেকি মাকে ওই গর্ত থেকে টেনে তুলতে পারবে কোনদিন ? আর্থিক দিক থেকে হয়তো পারল। কিন্তু সারা জীবৎকাল, বিশেষত বাবার মৃত্যুর পর থেকে যে লড়াই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অসম্মানের বিরুদ্ধে, ক্রমশ ক্রমশ বস্তিবাসীর জীবনের দিকে নেমে যাওয়ার বিরুদ্ধে এ সমস্ত তার ছাপ ফেলে গেছে মায়ের ওপর। মা কি নিজেকে কোনদিন রানাঘাট হাসপাতালের আনট্রেইন্ড আয়া ছাড়া আর কিছু, কিংবা আয়া হয়েও একজন সম্মানিত নাগরিক হিসেবে নিজেকে ভাবতে পারবে ? সম্ভব, মাকে মুক্তি দেওয়া ? মুক্তিটা একটা একদিনের ঘটনা তো নয়, একটা চালু পদ্ধতি। ইমন খেলতে খেলতে নানান মানুষের সংস্পর্শে এসে, কলকাতায় হোস্টেলে থাকার দরুন, ভাল কলেজে পড়াশুনোর সুযোগ পাওয়ার দরুন আস্তে আস্তে মুক্তি নামক বস্তুটার কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছে। তবুও তো তার লজ্জা পুরোপুরি যায়নি। সে নিজের সম্পর্কে নীরব থেকেছে বরাবর, বন্ধু করেনি কাউকেই, পরিচয় দিতে বাধ্য হলে বলেছে মা নার্স। এটাও তো সত্যকে লুকিয়ে যাওয়া লজ্জায়। এত সুযোগ পেয়েও ইমন যে মুক্তি পুরোপুরি পেল না, তার দুঃস্থ মা, অবিরাম ওই একই সঙ্গে বন্দী থেকে, কোনও সুযোগ না পেয়ে কী করে সামাজিক হীনম্মন্যতার এই গণ্ডি পেরোবে ? সে নিজের জন্য প্রতিজ্ঞা করতে পারে, এমন কি ভাইটিকেও সে বন্দিত্ব থেকে খালাস করে আনবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু মা ? মা যে তার পূর্ব-অভিজ্ঞতায় বদ্ধ, আপাদমস্তক জারিত, সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার বাবা জড়িত, মায়ের জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ জড়িত, সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কিন্তু মা কি পারবে ?

আরও কত দূর যেতে হবে তাকে, কত্ত কত দূর ! অনেক পাহাড় পার হয়েও সে যদি দেখে আরও পাহাড়, আরও পথ ! সেসব পার হয়েও, যদি থাকে আরো আরো ! এই সময়ে, ঘুমোবার ঠিক আগের মুহূর্তে ইমনের হঠাৎ ভগবানের কথা মনে পড়ল। এটা তার ছোটবেলার অভ্যাস। এখন মনে হল ভগবান ? ভগবান কেন বলে সে ? বাবার যখন করোনারি থ্রম্বোসিস হল, সে বলেছিল ভগবান ! ভগবান ! বাঁচাও ! যখন টুর্নামেন্ট খেলতে যায়। বলে ভগবান, হে ভগবান ! যেন... পরীক্ষার পড়া এবারে ভাল তৈরি ছিল না, সে মনে মনে ভগবানকে ডেকে পরীক্ষা দিতে গেছে। প্রশ্নপত্র পাবার আগেও ভগবান !! এ কিন্তু মায়ের কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মী নয়, তাদের হোস্টেলে ক্রুসবিদ্ধ যিশু নয়, কি মিঠুদের বাড়িতে রামকৃষ্ণের ভাস্কর্য নয়। অন্য কিছু ? কে এ ? কিছু পাওয়ার জন্যে, বিপদের সময়ে একে ডাকা। সব সময়ে সে ডাক শোনা হয় তার প্রমাণ নেই। বাবা যেমন মারা গেল, আগের বারে ন্যাশন্যাল চ্যাম্পিয়নশিপটা যেমন সে জিততে পারেনি, এবারে পারল। তবু এখন নিশ্বাস যখন গাঢ় হয়ে আসছে, নিজের একটা ব্যবচ্ছেদ করবার পর, দারুণ কঠিন মনঃসংযোগ ও কুশলতার খেলায় জেতবার পর, নিজের ভেতরের কথাগুলো জীবনে সর্বপ্রথম দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করবার পর, এখন ঘুমের মুহূর্তে তার প্রতিটি নিশ্বাস ছন্দে ছন্দে কেন যে বলতে লাগল ভগবান, ভগবান। এটা একটা রহস্য, এটার কিনারা সে করতে পারবে না। কোন দূর অতীতের অভ্যাসের সঙ্গে এই সব আবছা ভাবে বুঝি জড়িত, এটা বুঝতে বুঝতেই ইমন ঘুমিয়ে পড়ল।

কে জানত পথে পড়বে হুতোশের খাল ?'

জুন মাসের এক দারুণ গরম দুপুরে ভেঙ্কট তার কলেজি বন্ধুবান্ধবদের নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে। তার 'পার্টি'টা পেছোতে পেছোতে শেষ পর্যন্ত জুন। পরীক্ষার পর। ভেঙ্কট আর গৌতম দৌড়ে দৌড়ে বন্ধুদের ধরেছে। কারণ মেয়েদের সীট তো আলাদা জায়গায় পড়েছে। পড়ি-মরি করে দৌড়েও কয়েকজনকে ওরা ধরতে পারল না, বিদ্যাসাগর থেকে বেথুন। বেথুন কলেজের গেটের সামনে তখন উজ্জয়িনী, মিঠু, অণুকা, রাজেশ্বরী।

ভেঙ্কটের কথা শুনে উজ্জয়িনী বলল, 'গেট-টুগেদার-এর আর টাইম পেলি না ! জুন মানে জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমোটে ?'

ভেঙ্কট বললে, 'এসোই না গুরু একবার। কবে থেকেই তো বলছি, কাটিয়ে দিচ্ছ সবাই। গরিবের কুঁড়েঘরে একদিন না হয় পা রাখলেই। মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে ?'

উজ্জয়িনী বলল, 'দেখছিস, দেখছিস, কিরকম ডায়ালগ দিতে শুরু করল। একবারও বলেছি যাব না !'

'কিন্তু দু'একজন যেন মিসিং ! বিষ্ণুপ্রিয়া, ঋতু !'

'ঋতুকে আমি খবর দিয়ে দেব', মিঠু বলল।

'আর বিষ্ণুপ্রিয়া ?'

'ওকে তো তন্ময়ই খবর দিতে পারে', উজ্জয়িনী বলল, 'প্রিয়ার খুব সম্ভব ফোন নেই। থাকলে আমরা জানতে পারতাম।'

গৌতম বলল, 'ঠিক আছে, ভেঙ্কট তুই তন্ময়কে বলে দিস।'

'ঠিক হ্যায়।' ভেঙ্কট বলল।

তন্ময়ের ফোন বাজছে, পরীক্ষা শেষ। দারুণ গরম। শ্রান্তিতে, এতদিনের নিবিড় মনোযোগের শ্রান্তিতে তন্ময় ঘড়ির কাঁটা চারটের দিকে এগোচ্ছে দেখেও শুয়েই ছিল। ফোন বাজছে। মা নেই, বাবা তো নেই-ই। বোন গেছে মামার বাড়ি। তন্ময় কেন কে জানে, বড় আশায় ফোনটা ধরল।

'আমি ভেঙ্কট বলছি রে !'

তন্ময় মনে মনে বলল ধ্যাত্তেরিকা, নিকুচি করেছে। মুখে বলল, 'বলো।'

'কী হল তোমার গুরু ? এমন দূরে ঠেলে রেখে কথা বলছ !'

'কী বলছিস বল্।'

'এই তো পথে এসেছ। আগামি শনিবারে দুপুর এগারোটা নাগাদ আমার বাড়ি চলে এসো।'

'কেন ?'

'কেন ? আরে হল্লাগুল্লা হবে। আর কদিন পরেই কে কোথায় ভেসে পড়ব কে জানে ! তার আগে একবার সব মিলে নিই !'

'ভেঙ্কট প্লিজ এক্সকিউজ মী।'

'এক্সকিউজ কি রে, তুই তো আসছিসই ! বিষ্ণুপ্রিয়াকে খবর দেবার ভারও তোর।'

'পারব না, মাফ করতে হল।'

'কি হল ইয়ার ? গলাটা কেমন যেন শোনাচ্ছে !'

প্রচণ্ড রাগে তন্ময় রিসিভারটা দুম করে নামিয়ে রাখল। তারপর ছোট্ট বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়াল। বারান্দাটা এত ছোট যে এখানে চেয়ার পাতা যায় না, বড় জোর একটা মোড়া। কিন্তু দাঁড়ালেই ভাল লাগে। চতুর্দিকে ঝকঝকে সবুজ, আলোয় সাঁতার কাটছে সব। বিকেলের দিকের আলো। তাত মরে এসেছে। ঠিক চোখ-রাঙানি রোদ আর নেই, এ যেন রাগ-পড়ে-যাওয়া কিন্তু এখনও সে রাগের রেশ-রয়ে- যাওয়া চোখ। তবু, এই আলো, এই সবুজ, এই খোলামেলা দূষণহীন বিকেল যা লবণ হ্রদেরই বৈশিষ্ট্য, তন্ময় যার প্রচণ্ড ভক্ত, আজ ঠিক সেই জিনিসই তার অসহ্য মনে হল। বড্ড খোলা, যেন উদোম, চোখ মেলে চাইতে পারছে না তন্ময় প্রকৃতির দিকে, তার যেন চোখে জয়-বাংলা হয়েছে। চোখের ওপর হাত দিয়ে সে ঘরের ভিতরের আপেক্ষিক অন্ধকারে সরে এলো।

টেবিলে বইগুলো থাক থাক করে সরানো। এক একটা পেপার হয়ে গেছে আর সেই পেপারের বই খাতাগুলো একদিকে ঠেলে সরিয়ে রেখেছে তন্ময়। হঠাৎ তার মনে হল পরীক্ষার কদিন সে বেশ ছিল। একদম অন্য একটা তন্ময়। সে ছিল ধ্যানমৌন কোনও পাহাড়ের গুহায়, একদম একা, নিশ্চল, প্রয়োজন বলতে কিচ্ছু ছিল না, যেটুকু প্রয়োজন তা কে বা কারা যেন অলক্ষ্যে থেকে মিটিয়ে দিয়ে গেছে। সেই সুন্দর ঠাণ্ডা গুহার ভেতর থেকে এখন তাকে টেনে এনে একটা যান্ত্রিক, আত্মাহীন শহরের উলঙ্গ রাজপথে ঘাড় ধরে একা দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তন্ময়ের এই গুহা আগেও ছিল, ছিল এই দাঁত-কিড়মিড় শব্দ রাক্ষসে ভর্তি বড় রাস্তাও। দুটোকেই সে মেলাতে পারত, কষ্ট হত না। তার ভেতরে কোনও এক সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুর দৌলতেই হোক, কোনও অনাল গ্রন্থির সময়োচিত নিঃসরণের কারণেই হোক এই সেতু তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল। কেমন করে কে জানে সেটা ছিড়ে গেছে, বা শুকিয়ে গেছে। সে পারছে না।

এই তৃতীয় তন্ময়কে, গুহাবাসী তন্ময়, রাজপথে বিপন্ন তন্ময় প্রাণপণে মনে মনে ডাকতে থাকে 'তন্ময় ! ত-ন্ময় !'

শোনো আমি বড্ডই বিপন্ন,
কে জানত পথে পড়বে হুতোশের খাল,
কালাপানি শুষে নেবে প্রতিবিম্ব
কে জানত এদিকেই তেষ্টামারির মাঠ
নিশি ডাকে, নিশি ডাকছে কবন্ধ...
বড্ডই বিপন্ন হে, বড্ডই...

তন্ময় ঘরে এসে নোট-বুকে তার মনের কথাগুলো টুকে রাখল, তারপর দু' হাতে মাথাটা আঁকড়ে বসে রইল। আবারও খটাস করে ডট খুলল :

এরকম গনগনে সবুজ চোখে সয় না
এমন টকটকে আকাশ
হাটাও এই তড়বড়ে রোদ।
অশ্লীল, উলঙ্গ উচ্ছ্বাস ! ছিঃ !
একটু ফিকে হও তো, ফিকে !
একটু ছায়া-ছায়া
একটু আস্তে, ধীরে-সুস্থে
নইলে সয় না।
পাতা -উল্টে গেল তন্ময়।

পেছন থেকে টুঁটি টিপে ধরছ কে ? কে রে ?
ঝিমন্ত বেলায় দ্বারপাল এখন ছাউনিতে
আসতে দাও ! তাকে আসতে দাও !
পাকা বাঁশের লাঠি আর গাদা বন্দুক আছে।
সেগুলো কাজে লাগুক বা না লাগুক
অন্তত একটা ঝটাপটির সুযোগ...

কিংবা যে এসেছ, এসো সম্মুখে আমার
খোলা চোখে দেখতে দাও ক্রোধ-ঘৃণা-দম্ভের বাহার
পারলে ঘোরাও চক্র উল্লম্ব তর্জনী সংকেতে
কে বলতে পারে যদি তেমনি করে পার
বদ্ধপাণি, ত্যক্তরথ, হয়ত দণ্ড নেবো শির পেতে।

অনেকক্ষণ এক ভাবে, একই ভাবে বসে রইল তন্ময়। হাতে খোলা ডট। টেবিলে ডায়েরির খোলা পাতা। তার বাঁ হাত মাথায় ডান হাত কলমসুদ্ধ টেবিলের ওপর পড়ে আছে। টেলিফোনটা আবার বাজল। একটু বাজতে দিল তন্ময়। তারপর খুব নাছোড়বান্দা দেখে উঠে পড়ল।

'হ্যালো।'

'কে তন্ময় ?' মেয়ে-গলা, 'আমি মিঠু বলছি, উজ্জয়িনীর বাড়ি থেকে।'

'কী ব্যাপার ?'

'পরীক্ষা কেমন হলো ?'

'ভাল।'

'ফার্স্টক্লাস হচ্ছে ?'

'এগজামিনার জানে।'

'শনিবারে ভেঙ্কটরমণের বাড়ি যাচ্ছিস তো ?'

'দেখি !'

'দেখি আবার কি ? এই হয়ত শেষ ! এরপর কি আর আমাদের গ্রুপটা এইরকম থাকবে ? এক একজন একেক দিকে চলে যাব, তন্ময় প্লিজ আসিস !'

'আচ্ছা !'

'আমাদের মানে আমার আর উজ্জয়িনীর কিরকম পরীক্ষা হল। জিজ্ঞেস করলি না তো ?'

'ভালোই হয়েছে নিশ্চয়ই, জিজ্ঞেস করলেই তো বলবি একরকম।'

'এটা ঠিকই বলেছিস। সত্যি রে, নিজেই বুঝতে পারি না। ভালো দিয়েছি কি মন্দ দিয়েছি। যে পেপারটা বানিয়ে লিখলুম পার্ট ওয়ানে, সেটাতে হায়েস্ট পেলুম। যেটা প্রায় আগাগোড়া তৈরি ছিল সেটায় যা-তা। এরপর আর দুরকম বলার সাহস থাকে ? যাকগে, আসছিস তো ?'

'আসছি।'

'থ্যাংকিউ। ছাড়ি ?'

'ঠিক আছে।'

ফোনটা ছেড়ে দিতে উজ্জয়িনী বলল, 'কিছু বুঝলি ?'

মিঠু বলল, 'গোড়ায় যেন একটু স্টিফ ছিল, কথা বলতে বলতে শেষের দিকটা তো স্বাভাবিকই মনে হল।'

'তবে ভেঙ্কট কী বুঝল?' উজ্জয়িনী আপন মনেই বলল।

মিঠু বলল, 'উজ্জয়িনী, আমি কিন্তু প্রিয়ার নাম করিনি একবারও। হয়ত সেইজন্যেই!'

'আমি তো তোকে কোন কালেই বলেছি প্রিয়ার সঙ্গে ওর একটা গণ্ডগোল চলছে, তুই তো প্রেমটা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চাস না।' উজ্জয়িনী মুখের একটা ভঙ্গি করে বলল।

'আমি...মানে..ক্লাস ফেলো তো...একই অনার্স আর...'

'তা তোর ক্লাস ফেলোর সঙ্গে প্রেম হয়নি বলে আর কারো হবে না? ভেঙ্কট বা গৌতমেরও তো পল সায়েন্স, কই ওদের সঙ্গে তো ওরকম দিবারাত্র ঘুরত না প্রিয়াটা!'

মিঠু হেসে ফেলে বলল, 'দূর, ভেঙ্কটটা যা ফাজিল, ওর সঙ্গে যে কারুর প্রেম-ট্রেম হতে পারে তাই বিশ্বাস হয় না। দেখ ও হয়ত বিয়ের সময়েও বউকে বলবে, কী গুরু! কী খবর!'

হাসতে হাতে উজ্জয়িনী বলল, 'যা বলেছিস। তবে কি জানিস প্রিয়াটা বরাবর কি রকম বাগানে টাইপের ছিল। মনে আছে? তুই কী লিখেছিস। তুই কী লিখেছিস বলে কতবার যে আমার খাতা নিয়ে দৌড় মেরেছে! তন্ময়টা ব্রাইট বলেই বেছে বেছে ওর সঙ্গে প্রেম করেছে। এখন বোধ হয় নোট-টোট সব বাগানো হয়ে গেছে।'

'তাই ওকে জিল্ট করেছে বলছিস?' মিঠু অবিশ্বাসের চোখে তাকাল।

'প্রমাণ ছাড়া তো এসব কথা বলার কোনও মানে হয় না। তবে তন্ময়টা ওরকম করবে কেন?'

মিঠু বলল, 'যাক আমাদের কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে। এখন প্রিয়াকে কোথায় পাই। উঃ, বাড়িতে একটা ফোন রাখতে কী হয়! আর তো কটা দিন বাদেই শনিবার। চলি রে জুন।'

মিঠু চলে গেল।

মায়ের এখনও ফিরতে দেরি আছে। উজ্জয়িনী যমুনাকে ডেকে বলল সে বাবার চেম্বারে যাচ্ছে। মা এলে যেন বলে দেয়। পরীক্ষাটা শেষ হয়ে খুব একটা মুক্ত-স্বাধীন লাগছে। কিন্তু এতদিনের ঘুম, ক্লান্তি সব কোথায় উবে গেছে। মনে হচ্ছে এখন সে অনেক কাজ করতে পারে। বাবার ঘরে গিয়ে সে জানলাগুলো হাট করে খুলে দিল। ঝড়ের মতো দক্ষিণে হাওয়া এসে ঘরময় তাণ্ডব শুরু করে দিল। ভাগ্যিস খুচরো কিছু নেই। বাবার ড্রয়ারগুলো আজ পরিষ্কার করতে হবে, অনেক দিন থেকে বলছে মা। টেবিলটা একেবারে খালি করে দিতে হবে। এ সব ঘরের আসবাবপত্র সবই বিক্রি হয়ে যাবে।

মা সবটা বলে না উজ্জয়িনীকে, কিন্তু খুব সম্ভব বাবার মৃত্যুর পর ওয়েল্থ্ ট্যাক্সফ্যাক্স দিতে অনেকটাই চলে গেছে। এদিকের ফ্ল্যাটটাও বিক্রি হয়ে যাবে। তাদের নিজেদের ফ্ল্যাট আর এই ফ্ল্যাট বিক্রির টাকা এর চেয়ে বেশি হয়ত তাদের কিছু আর থাকবে না। বাবার অ্যামবাসাডরটা বিক্রি হয়ে গেছে। তাদের মারুতিটাও মা বিক্রি করতে চাইছিল, উজ্জয়িনী কিছুতেই করতে দেয়নি। মায়ের কষ্ট হবে। শুধু শারীরিক কষ্ট নয়, মনে মনেও মা বড্ড কষ্ট পাবে। কত রকমের কষ্ট পেল মা, প্রৌঢ় বয়সে এটুকু না হয় না-ই পেল আর। টাকা এবং স্বামীর পদমর্যাদা দিয়েই তো মান, সে স্বামী চরিত্রহীন লম্পট হলেও। ডক্টর রজত মিত্র-র স্ত্রী হিসেবেই মা 'জাগৃতি', 'নবনীড়', 'মাদার্স সেন্টার' ইত্যাদি

নানা সমিতির কোথাও সেক্রেটারি, কোথাও প্রেসিডেন্ট। এতদিন তিনি ঘোরাফেরা করেছেন গাড়িতে, আজ হঠাৎ ট্রাম বাস থেকে নামলে, বা রিকশা ঠুংঠুং করে গিয়ে উপস্থিত হলে ওই সমস্ত ফ্যাশনদুরস্ত করুণাময়ী মহিলাদের কাছ থেকে মা ঠিক কী ধরনের আপ্যায়ন পাবে, জানা নেই। মায়ের ওপর দিয়ে এই বয়সে, এই গবেষণাটা হোক উজ্জয়িনীর সেটা ইচ্ছে নয়। সে ড্রয়ারগুলো এক এক করে খুলতে লাগল, বাবার স্কুলজীবন থেকে শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত অজস্র সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি। কী সাঙ্ঘাতিক কেরিয়ার। একবারও বাবা ভুল করেও দ্বিতীয় হয়নি কোথাও। সযত্নে সব ফাইলবন্দী করা রয়েছে। কী লাভ! বাবার বাবা-মার না-জানি কী আনন্দ, কী গর্বই হয়েছিল। বংশের নাম রাখা, মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করা ছেলে। স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি বোধ হয় ওই ছেলে কী দাঁড়াবে। ভাগ্যিস, দাদু দিদা আগেই মারা গেছে। দিদা তো কবেই। দাদু বোধ হয় বাবার কিছু-কিছু কীর্তি-কাহিনী জেনেই গেছে। তখনও তাদের এই ফ্ল্যাট হয়নি। চেতলায় বিরাট যৌথ বাড়ির এক অংশে তারা থাকত। পিসিমা কিছু কিছু জানেন বোধ হয়, দিল্লি থাকেন। আসেন খুব কম। একটা অ্যালবাম। ভীষণ কৌতূহলে অ্যালবামটা তুলে নিল উজ্জয়িনী। বাবার ছবি, নানা বয়সের। কী সুন্দর হাসছে শিশু, দু ফোঁটা নাল গড়িয়ে ঠোঁটের তলায় থেমে গেছে। অবোধ নিষ্পাপ হাসি। বাবার এত ছোটবেলার ছবি সে দেখেনি কখনও। ক্রিকেট-ব্যাট হাতে নিয়ে বাবা। ক্রিজে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ দুটো ঈষৎ কুঁচকে আছে, মুখটা উদ্বিগ্ন। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধে হাত দিয়ে বাবা, এত সুন্দর তরুণ আর কখনও কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না উজ্জয়িনী। এই তো মাথায় হুড, গায়ে কালো গাউন, হাতে পাকানো দলিল, বাবার এম-বি, বি-এস ডিগ্রি পাওয়ার ছবি। যেন শাহজাদা। পাতা উল্টোতে লাগল উজ্জয়িনী। মায়ের ছবি, অমিতা মিত্র। মায়ের এ ছবি উজ্জয়িনী আগে কখনও দেখেনি। দুটো বিনুনি দুদিকে। ঘাম চকচকে ছাত্রী-ছাত্রী মুখ। ঠোঁটে বিপন্ন হাসি। দু-চারগাছা চুল উড়ে পড়েছে কপালে। এই অমিতা মিত্রর সঙ্গে আজকের মার কোনও মিল নেই। কোথায় লুকিয়ে গেছে এইসব লাজুক লাজুক চাউনি, খুশির হাসি, নির্মল ছেলেমানুষি। মা কি তখন লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার সঙ্গে প্রেম করত? আহা, বেচারি অমিতা কি তখন ভেবেছিল মেডিক্যাল কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র রজত, তার রজত এমনি হবে? বাচ্চা মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে উজ্জয়িনীর দু চোখ ভরে জল এলো। ছবিটা সে খুলে নিজের অ্যালবামে রাখবে। তার পরের পাতায় একটা অদ্ভুত দেখতে মেয়ের ছবি, অনেকগুলো, নানা সময়ে, নানান কোণ থেকে তোলা। নিগ্রোদের মতো কুঁচি-কুঁচি চুল। মাথার চার পাশে ফেঁপে আছে, একটা টানা রেখার মতো ঠোঁট। চোখ দুটো যেন হীরের কুচির মতো জ্বলছে। গালের হাড় উঁচু। প্রথম ছবিটা উল্টে নিয়ে দেখল উজ্জয়িনী, লিপস্টিক মাখা লম্বা ঠোঁটের দাগ। তলায় ইংরেজিতে লেখা ইন্দু ব্র্যাকেটের মধ্যে রামস্বামী। তাড়াতাড়ি পাতাগুলো উল্টে গেল উজ্জয়িনী। ডোরার ছবি, ডোরা ডিসুজা, উজ্জয়িনীর দিকে তাকিয়ে হাসছে। তিন-চারটে ছবি। একটা বাবার সঙ্গে। 'ডোরা, ডোরা' ফিসফিস করে বলল উজ্জয়িনী, 'তোমাকে আমি পুড়িয়ে ফেলেছি, তবু তুমি আবার এসেছ?' কী দীর্ঘপক্ষ্ম ভালবাসা ভরা চাউনি, ছোট্ট নাক, ফুলো ফুলো ঠোঁট, রাশি রাশি চুল, কার্ল করা। হঠাৎ উজ্জয়িনী একটা ছবি তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল। তার বুকটা যেন আবেগে ফেটে যাবে। সে আস্তে আস্তে ছবিটাকে মুখের কাছে তুলে আনল, তারপর গরম ঠোঁট রাখল ছবিটার ওপর। ছোট্ট একটা চুমুর শব্দ 'হুম'। সে

মনে মনে বলল, 'ডোরা, এত হাসি হাসছ কেন ? তোমায় কেউ কিছু দেয়নি, তোমার কোনও স্মৃতি নেই, অস্তিত্ব নেই, তোমার মেয়ে তোমার নয়, তোমার পরিচয় সে একেবারে মুছে ফেলেছে। কোন অখ্যাত হাসপাতালে তুমি আত্মীয়-বান্ধবহীন একলা-একলা মরে গেছ।' এইভাবে বলতে বলতে উজ্জয়িনী যেন আস্তে আস্তে ডোরা ডিসুজার কানীন কন্যা হয়ে যেতে লাগল। গ্লোব সিনেমার কাছে একটা বিরাট ভাঙাচোরা বাড়ি, তার দোতলায় উঠে একটা ঘর, বিরাট বিরাট জানলায় বেঁটে বেঁটে সাদা পর্দা দেওয়া। সে পুরনো বেতের সোফায় ডোরার মুখোমুখি বসল। ট্রেতে চায়ের জিনিস নিয়ে এক বৃদ্ধা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা ঢুকলেন, 'খাবে না ? খাও না ? কুকীজ ! অল রাইট চা খেয়ো না, দুধ খাও। কী ফ্লেভার পছন্দ করো : সে কী এই বাড়িতে কোনদিন গিয়েছিল ? ডোরাকে তো সে দেখতেই পারে না। সে এলো বলে ডোরাকে চলে যেতে হল। তাহলে ? তার স্মৃতিতে ওই ঘর, ওই বৃদ্ধা কে ? অনেকক্ষণ ভাবতে ভাবতে হঠাৎই ভদ্রমহিলাকে চিনতে পেরে গেল সে। উনি তো মিসেস রডরিগস্ ! নার্সারি কে· জি-তে তাদের সঙ্গে পড়ত কিম রডরিগস্, তার দিদিমা। একদিন ওদের বাড়িতে গিয়েছিল সে। ডোরা কোথাও আর নেই। সে উজ্জয়িনী তার শেষ চিহ্ন। অবশেষ। কোথাও ডোরাকে রাখতেই হবে তাকে। কেমন করে, সেটা ভাবতে হবে। কিন্তু রাখা দরকার। উঠে আলোগুলো জ্বালিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল উজ্জয়িনী। পাতা উল্টোলো। দারুণ সুন্দরী এক মহিলা মুখে গর্বিত হাসি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। এনলার্জড ছবি, পাতা জুড়ে। ইনি কি কোনও অ্যাকট্রেস ? সেই রকমই দেখতে। ছবিটার ওপর দিয়েই নাম সই করা, বাঁকা করে, পুষ্পা হন্সরাজ। পরের পাতাটা খালি। তার পরে বাবার সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাপসী নন্দী ! একে খুব ভালো করেই চেনে উজ্জয়িনী। হঠাৎ উজ্জয়িনী চমকে উঠল। একটার পর একটা সে নানান মেয়ের ছবি দেখে যাচ্ছে। অমিতা মিত্রকে দিয়ে আরম্ভ। সে তবে বাবার হারেমে উঁকি মেরেছে। এই সমস্ত মহিলা কোন না কোন সময়ে ডক্টর রজত মিত্রকে সঙ্গদান করেছেন।

উজ্জয়িনী সহসাই বুঝতে পারল বাবা সম্পর্কে অন্তত এই রজত মিত্র সম্পর্কে তার আর কোনও অনুভূতি নেই। যে ভীষণ ঘৃণা, ক্ষোভ তার মধ্যে ছিল সে সব মুছে গেছে। উনি যেন তার কেউই নয়। আবার উল্টেপাল্টে অ্যালবামটা দেখে বাইরে একপাশে রেখে দিল সে। বাবার একার ছবিগুলো আর মায়ের ছবিটা সে খুলে নেবে। ডোরার ছবিগুলো, একটা গোপন খামে, গোপন তাকে থাকবে, বাকি অ্যালবামটা সে জ্বালিয়ে দেবে, এই সব সার্টিফিকেট, ডিগ্রি ইত্যাদির সঙ্গে। এগুলোই বা রেখে কী হবে ?

আরও ড্রয়ার বোঝাই ইলেকট্রিকের বিল, ট্যাক্সের রসিদ। নানান রকম ওষুধ কোম্পানির ব্রোশিওর। সর্বশেষ ড্রয়ারটাতে একটা বহু প্রাচীন, হলুদ হয়ে যাওয়া প্যাকেটে কতকগুলো চিঠি পেল উজ্জয়িনী।

পাতলা কাগজে গোটা গোটা তার মায়ের লেখা চিনতে পারল উজ্জয়িনী। আগেকার লেখা, অনেক কাঁচা, তবু মায়েরই।

রন্টু দা,

তুমি আর অমনি করবে না কথা দাও। তবে, আমি আর যাবো না। মা জানতে পারলে আমাকে মেরে পাট করে দেবেন। বাবা কী করবেন ভাবতেও সাহস হয় না। আর তোমার বন্ধু ? দাদা যদি জানতে পারে তো আমায় চিলে কোঠার ঘরে বন্ধ করে রাখবে। রন্টুদা, রন্টু তুমি কবে আসবে ? তোমায় না দেখলে আমি থাকতে পারি না।

আমার খুব কষ্ট হয়।
বলোতো কে ?
তলায় মন্তব্য, চুলবুলের প্রথম চিঠি। আমার প্রথম চুমু। খুব ভয়ে ভয়ে দ্বিতীয় চিঠিটা খুলল উজ্জয়িনী। আর কোনও সম্বোধন নেই।
'আমাকে নিশ্চয়ই ভুলে গেছ। এগারো দিন হল দার্জিলিং এসেছি। এগারো দিন তোমায় দেখিনি। সারা দিন সারা রাত দার্জিলিং কেঁদে যায়। ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে সব। কী হাওয়া দেয়। ঝড়ের মতো। ঝড় যদি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে তোমার কাছে ফেলত ! কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাইনি। একদিনও না। কেমন করে পাব ? আমি একলা একলা কোনও সুন্দর যে দেখতে পাই না। কবে দেখব তোমাকে ? কবে দেখব ? কত দূরে তুমি ? কত দূর ?
—জানোই তো— কে।
এর তলাতেও পুরুষালি হাতের লেখার মন্তব্য 'তুমি আমারই। যত দূরেই যাও।'
চিঠিটা মুড়ে যথাস্থানে রেখে চুপচাপ বসে রইল উজ্জয়িনী। তার বুকের মধ্যে কিসের ব্যাকুলতা, অসহ্য এক আনন্দে শিরায় শিরায় টান ধরেছে। আমি একলা-একলা কোনও সুন্দর যে দেখতে পাই না ! কত দূরে, তুমি কত দূরে ! খুব লোভ হচ্ছিল সব চিঠিগুলো পড়তে। কিন্তু ভয়ও করছিল। লজ্জা। লজ্জাও সেইসঙ্গে। অ্যালবাম থেকে সে ক্ষিপ্রহাতে মায়ের ছবিটা খুলে নিল। চিঠির প্যাকেটটার মধ্যে রেখে দিল। তারপর আর সব জিনিস ভেতরে রেখে চাবি দিয়ে দিল। এখন সে জানে এই টেবিলের সব ড্রয়ারে কী আছে না-আছে। সময় মতো ছেঁড়ার কাজ, পোড়ানোর কাজ করলেই হবে। আপাতত এই ছাইগাদা খুঁজতে খুঁজতে সে দামী কিছু পেয়ে গেছে।
রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর মায়ের ঘরে গিয়ে সে বলল, 'মা দ্যাখো তোমার ছবি।'
ছবিটা হাতে নিয়ে মা বলল, 'কোথায় পেলি ? এ তো আমার অনেক দিনের···' মা নিবিষ্ট হয়ে দেখছে।
উজ্জয়িনী বলল, 'বাবার ড্রয়ারে ছিল, আর এই চিঠিগুলো।'
'দেখি দেখি' চিঠির তাড়াটা তাড়াতাড়ি হাতে নিয়ে অমিতা লালচে হয়ে গেলেন। মেয়ের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই পড়েছিস ?'
বা রে ! না পড়লে কি করে বুঝব তোমার চিঠি ? একটাই পড়েছি মা, জাস্ট একটা।'
'ঠিক বলছিস ?'
'জাস্ট দুটো মা। অন গড। চিঠিগুলো আর ছবিটা একসঙ্গে ছিল,' বলে উজ্জয়িনী আর দাঁড়াল না। পায়ে পায়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। এখন সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। তার মনের মধ্যে বসে কিশোরী চুলবুল অদ্ভুত অদ্ভুত কথা উচ্চারণ করছে। অনেক সাহিত্য পড়লেও এমন ঘোর-লাগা কথা সে কখনও, কোথাও পড়েনি। 'একলা-একলা আমি কোনও সুন্দর যে দেখতে পাই না।' মানে কী ? এর মানে কী ? একজন না থাকলে আরেক জনের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায় ? নাকি নিসর্গ-সৌন্দর্যের মতো একটা বাইরের জিনিসও দেখতে সুন্দর লাগে না। না, দেখতে ইচ্ছে করে না ? 'তুমি আমারই। যত দূরেই যাও।' চুলবুল তার জায়গায় এখনও বসে আছে, রজত মিত্র কত দূরে চলে গেছে। সেখানে পাপপুণ্য নেই। উজ্জয়িনীর মনে হয় সেখানকার ধর্ম ভালোবাসা। এখন রজত মিত্র ওইখানে বসে শান্ত, সমাহিত, কলুষমুক্ত চোখ মেলে দেখছে এই পৃথিবীর দিকে, বলছে, 'তুমি আমারই। যত দূরেই যাই।' কথাগুলোর আঘ্রাণ

নিতে নিতে উজ্জয়িনী বহুদিন পর একটা নিবিড় ঘুম ঘুমোলো। নিশ্চয়ই সুখ-স্বপ্নে ভরা, অথবা সুষুপ্তি, কেন না পরদিন সকালে তার মুখের যেসব কঠিন রেখা সে তার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, সে-সব কোমল হয়েছিল। যেন ফাঁকা ফাঁকা স্কেচের ওপর কেউ এইমাত্র নরম, নিটোল রঙ চাপালো।

২০

নেবার জন্যে কি কেউই নেই ?

রাজেশ্বরী বড্ড জড়িয়ে পড়ছে। জড়িয়ে পড়তে তার আপত্তি ছিল না, যদি সত্যিকার কাজের কাজ কিছু হত। কিন্তু এখন তার ধারণা হয়েছে সে ভিড়ের একজন। মিছিল মিটিং যখন হোক, যেখানে হোক— শামিল হতে হবে। বন্ধ স্থির হোক, যে কোনও কারণে, কারণটা যথেষ্ট মনে না হলেও তার সপক্ষে—ভাষণ দিতে হবে। এই সব কারণেই তার আজকাল সুকান্তদার সঙ্গে লেগে যাচ্ছে :

'তোরা আসলে কি জানিস তো ! ইনকরিজিবলি রোমান্টিক। মাটিতে পা দিয়ে কক্ষনো হাঁটবি না।' সুকান্তদা কথাগুলো বলে মনোযোগ দিয়ে সিগারেট ধরালো।

'বেশ তো, রোমান্টিক হওয়াটা খারাপ কিসে বুঝিয়ে দাও। রোম্যান্টিসিজম থেকে এত কাব্য-কলা, এত বড় বড় থিয়োরি, এত মহৎ মানুষ, আনন্দ, আত্মত্যাগ...' রাজেশ্বরী থেমে গেল।

'বলে যা বলে যা, থামলি কেন ?' সুকান্তদা নিজের ধোঁয়ায় নিজেই আচ্ছন্ন হয়ে বলছে।

'লিস্ট বাড়িয়ে তো লাভ নেই।' রাজেশ্বরীর মুখ ব্যাজার।

'না। আনন্দ আবেগ কাব্য কী সব বলছিলি না ? তা ওগুলো দিয়ে পেট ভরবে ? দিনমজুর, খেতমজুর, ফুটপাতে আশ্রয় নেওয়া মানুষ, ভরবে এদের পেট ? জুটবে বস্তর ?'

'এসব, অর্থাৎ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা কিভাবে মেটানো যায়, এ নিয়ে যাঁরা চিন্তা করে এসেছেন তাঁরাও তো ভিশনারি, ড্রীমার, সুকান্তদা। বেশি কথা কী ! মার্কস নিজেই তো রোমান্টিক।'

'শোন রাজেশ্বরী, ভিশনারি হতে পারেন। কিন্তু জাস্ট ড্রীমার এঁরা নন। মার্কস-এর মধ্যে যদি বা একটু থেকে থাকে, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও, হো-চি-মিন— এঁরা কেউ রোমান্টিক নন। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, স্ট্যাটিসটিকস পরিস্থিতি এসবই এঁদের কাজের ভিত। প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড কান্ট্রি ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের অবস্থাই এঙ্গেলসের লেখার ভিত।'

'তো তাতে পেট ভরেছে ? বস্ত্র জুটেছে।'

'সোভিয়েত রাশিয়ায় ভরেছিল, জুটেছিল। বিলাসদ্রব্য পাওয়া যেত না। হোর্ড করতে পারত না। অতিরিক্তের লোভ সবাইকেই সংবরণ করতে হত। ইমপোর্টেড কার ক্যাবারে, ডিসকোথেক ছিল না। কিন্তু বলশয় ব্যালে ছিল, এমন কি বিবেকানন্দ অনুবাদ হচ্ছিল। আরেকটু স্বাচ্ছন্দ্য জুটত না এইজন্যে যে সারা পৃথিবী ওদের দিকে মিসাইল উঁচিয়ে ছিল। ডিফেন্স বাবদ ওদের একটা প্রচণ্ড খরচ করতেই হত। টিকে থাকার প্রশ্ন ছিল এটা। তাই মোটা ভাত-কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত।'

'ওদের আর্থিক ব্যবস্থা যে একেবারে বেহাল হয়ে গেছিল সেটা কিন্তু স্বীকার করছ না একবারও। সন্তুষ্টও তো থাকল না শেষ পর্যন্ত। এখন তো ম্যাকডোনাল্ডের হ্যামবার্গার নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে।'

'হ্যাঁ। স্কুলের বাচ্চা মেয়েরাও রোজগারের ধান্দায় বেরিয়ে পড়েছে কলগার্ল হয়ে। দারুণ অভাব, দারুণতর লোভ। হাজির হচ্ছে পশ্চিমি দুনিয়ার পুরো কনজিউমার মার্কেট। এতদিন সুষম বণ্টনের যে ব্যবস্থাটা কাজ করছিল, সেটা দুম করে ভেঙে দিয়েছে গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ত্রৈকা দিয়ে। নাও, এখন ঠ্যালা সামলাও।'

'তুমি বলছ তাহলে জোর করে প্রকৃতিবিরুদ্ধ সংযম মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়াই ঠিক! যত বজ্র আঁটুনি, তত ফস্কা গেরো, কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে দিল।'

'কিছু মনে করিসনি রাজেশ্বরী মানুষ তো আসলে একটা জন্তুই। দীর্ঘদিন ধরে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে নিয়ে না গেলে, যেখানে জাবনা, যেখানে ক্ষেতখামার দেখবে মুখ দেবেই!'

'বাঃ, মানুষ সম্পর্কে তোমার এই ধারণা, তোমার রাজনীতির দাদারা জানেন?'

'আরে বাবা, মানুষেকে শিক্ষিত করে তোলা, সমষ্টির মুখ চেয়ে আত্মসংযম করতে শেখানো, এইসবই তো আমাদের কাজ। শোধরাবে মানুষ। আস্তে আস্তে। সময় লাগবে।'

'চুয়াত্তর বছরেও শোধরালো না? কোন সোস্যালিস্ট দেশটাতে মানুষ খেয়ে-পরে, চিন্তা করে সুখে আছে বলো। চিন? —নেই— প্রমাণ তিয়েনানমেন স্কোয়ার। রুমানিয়া? চাওসেস্কু। চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, ইস্ট জার্মানি কোথায় শান্তি ছিল? চিন টিকে আছে, ধীরে ধীরে মডেল পাল্টাচ্ছে বলে। যাই বলো, সোশ্যালিজ্‌ম্ হ্যাজ রিয়ালি ফেইল্‌ড্।'

সুকান্ত প্রথম সিগারেটের নিবন্ত আগুন থেকে দ্বিতীয় সিগারেটটা আস্তে আস্তে ধরিয়ে নিল, সে গম্ভীর মুখে বলল, 'রামমোহন বিদ্যাসাগর বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ বন্ধ করে বিধবাবিবাহ চালু করার জন্যে আন্দোলন করেছিলেন, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন, নারীজাগরণ চেয়েছিলেন। তা দেখা যাচ্ছে এখনও কোথাও কোথাও সতীদাহ হচ্ছে। ছোটলোক যাদের বলিস তাদের কথা তো ছেড়েই দে। বহু ভদ্দরলোকের একাধিক সংসার আছে, বহুবিবাহ জিনিসটা অন্য ফর্মে চলছে। ডাউরি ডেথ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, শুধু শ্বশুর-ভাসুর নয়, ননদ-শাশুড়ি পর্যন্ত যেভাবে পিটিয়ে বউ খুন করতে লেগেছে, তাতে আর যাই বলিস নারী-জাগরণ হয়েছে বলতে পারিস না। পারিস?'

'কী বলতে চাইছ? শেষ করো কথাটা।'

'বলতে চাইছি, এখন কি বলবি বিদ্যাসাগর, রামমোহন অ্যান্ড দা লট হ্যাভ ফেইলড? গান্ধিজী-বিবেকানন্দ জাতপাত তুলে দিতে চেয়েছিলেন, তা এখনও মধ্য প্রদেশ, বিহার, উত্তর প্রদেশে হরিজন হত্যা হয়। জাস্ট হরিজন বলেই। সদগতি দেখেছিস তো! ইট ইজ ফ্যাক্ট। এখন কি বলবি গান্ধিজী বিবেকানন্দ ওয়্যাব রং?...'

কফির কাপটা নামিয়ে রেখে রাজেশ্বরী তড়বড় করে বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও সুকান্তদা, মোটেই আমি এ ধরনের কথা বলিনি। আমি একবারও লক্ষ্যের কথা বলিনি। মেথড, মেথডের কথা বলেছি। জোর করে মানুষের মুখ বন্ধ করে সব কিছু রাষ্ট্রের অধীনে আনা, সাহিত্যিক-শিল্পী-বিজ্ঞানীদের ডিকটেট করা, স্বাধীন চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করা...এইটার সম্পর্কে

সংশয় প্রকাশ করেছি।'

এই সময়ে পুলক এসে ঢুকল। সুকান্তদা হাত উঁচু করে ডাকল, 'পুলক এদিকে...এইদিকে।'

পুলক বসে পড়ে বলল, 'কী খাওয়াবে ?'

'পাঁচ ছটাকার মধ্যে যা খাবি।'

'ধুস। পাঁচ-ছ টাকায় কিছু হয় আজকাল ?'

'এই তো কেন্দ্র এবার ওপন ডোর পলিসি নিচ্ছে। কেমন ফুসমন্তরে সব সস্তা হয়ে যাবে দেখবি। তখন ভালো করে খাস।'

রাজেশ্বরী বলল, 'আমি খাওয়াচ্ছি।' বেয়ারাকে হাত নেড়ে ডাকতে ডাকতে পুলক বলল, 'একটা মোগলাই পরোটা আর একটা চিকেন বল, সুকান্তদার মতো চিপ্পুসগিরি করিসনি, কাঁহা কাঁহা জায়গা থেকে ঘুরে এলুম। এত্তো খিদে পেয়েছে !'

'এই না হলে মেয়ে ? সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা একেবারে।' পুলক বলল।

'অন্নপূর্ণা-টুর্ণা বললে খাওয়াচ্ছি না পুলক।'

'কেন ? কেন ? কমপ্লিমেন্ট দিলুম তো :'

'কমপ্লিমেন্ট', রাগের সুরে রাজেশ্বরী বলল, 'এইসব তথাকথিত কমপ্লিমেন্টগুলো দিয়ে দিয়েই তো চিরদিন আমাদের এক্সপ্লয়েট করে এসেছিস। মুখে বলিস অন্নপূর্ণা, ব্যবহার করিস ক্রীতদাসীর মতো। খবর্দার, অন্নপূর্ণা তো বলবিই না, মেয়েটেয়েও বলবি না।'

'মেয়েও বলব না।' পুলক হাঁ করে রইল।

'না বলবি না। এই তো জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই করছিস। এদিকে মজ্জায় মজ্জায় জাতিভেদ। পুরুষজাতি, নারীজাতি। কিছুতেই তফাতটা ভুলতে পারিস না, না, যখন অত্যাচার করিস তখনও ভুলিস না, যখন খোসামোদ করিস তখনও ভুলিস না।'

'যা বাব্বা, ছিলি সোস্যালিস্ট। হয়ে গেলি ফেমিনিস্ট !' পুলক বলল।

'বাজে কথা না বলে খা পুলক। পৃথিবীর যেখানে যত চিন্তানায়ক, বড় বড় মানুষ সব্বাই ফেমিনিস্ট। আমি তো কোন ছার !'

'কী ব্যাপার সুকান্তদা, আজ থার্মোমিটার ফাটবে মনে হচ্ছে ?' পুলক চিন্তিত চোখে সুকান্তদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল।

'সোস্যালিজ্‌ম্ ব্যর্থ হয়ে গেছে বলে রাজেশ্বরীর মন খারাপ।' সুকান্তদা বলল।

'হবেই।' পুলক ছুরি-কাঁটা দিয়ে মোগলাই পরোটাটাকে খণ্ড খণ্ড করতে করতে বলল পরম সন্তোষের সঙ্গে, 'সিনসিয়ার ওয়ার্কার তো ! তাছাড়া মেয়েরা', বলেই অ্যাল্‌ল্ করে এত্ত বড় একটা জিভ কাটল পুলক।

রাজেশ্বরী বলল, 'পুলক তুই আগে একটা অ্যাংরি ইয়াংম্যান ছিলি। তোর সে ইমেজটাই আমার বেশি ভালো মনে হয়। এখন অবিকল ভেঙ্কটের মতো ফক্কড় হয়ে যাচ্ছিস।'

'আগে ছিলুম অ্যাংরি, এখন আপাতত হাংরি। এতে দোষের কী দেখলি ? আর ভেঙ্কট ? ভেঙ্কট হচ্ছে যাকে বলে একটি মচৎকার চ্যাপ। দেলখোশ, দিলরুবা।'

সুকান্তদা বলল, 'বাজে বকবক বন্ধ কর তো !·ওকে বোঝা কেন সোস্যালিজ্‌ম্ ছাড়া পথ নেই।'

'খুব সিধে করে বুঝিয়ে দিচ্ছি রাজেশ্বরী, কান খোলকে শুন লে। সোস্যালিজমের উল্টো দিকে কী ? ক্যাপিটালিজ্‌ম্ তো ! ক্যাপিটালিজ্‌ম্-এর লক্ষ্য কী বল তো। সকল

ন-সম্পদ ধনিকদের করায়ত্ত রাখা। হল ? ওরা কী চায় ? পৃথিবী জুড়ে বাজার, কিন্তু নাফা আসবে ওদের হাতে। মজদুরকে ওরা কী দেবে ? যতটুকু না দিলেই নয়, ঠিক তটুকু। অর্থাৎ কী হচ্ছে ? রেস্ট অফ দা ওয়ার্ল্ড ওদের স্লেভ। ওরা যা কিনতে বলছে চনে যাচ্ছে, রাইট অ্যান্ড লেফ্‌ট। প্রফিট, জাস্ট প্রফিট। এখন স্টেটের হাতে যদি ন্টনের ভার থাকে, ব্যবসা থাকে, তার মানেই জনগণের জন্যেই রইল। মুনাফাবাজি ন্ধ।'

রাজেশ্বরী বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুই চুপ কর পুলক। সুকান্তদা, মার্কসের যুগের ্যাপিটালিজম্‌ তো আজ আর নেই। ইউনিয়ন আন্দোলনের চাপে পড়েও বটে, সাস্যালিজমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেও বটে ক্যাপিটালিজম্‌ এখন উদার হয়ে গেছে। ার্কস ভেবেছিলেন রাষ্ট্র-মালিকানার পরের স্টেপই নো স্টেট। কিন্তু তিনি ইতিহাস দখতে পাননি। ক্যাপিটালিজম্‌ হারিয়ে দিয়েছে তাঁকে। এখন তো সবাই প্রকারান্তরে মনে নিচ্ছে যে আমেরিকাই ঠিক পথে চলেছে। যাই হোক, এসব আমার চিন্তা নয়, ামার চিন্তা—আমাদের কী হবে ?'

'তোর হাই-সেকেন্ড ক্লাস কেউ মারতে পারবে না।' একমুখ খাবার নিয়ে পুলক লল।

'আঃ, আমি পরীক্ষার কথা বলছি না, আমাদের, মানে এই দেশের কী হবে ?'

'পঞ্চায়েত হয়েছে, অপারেশন বর্গা হয়েছে, লিট্‌র‍্যাসি প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। ক্রেশ্বর হবে, মাস এডুকেশন, মাস হেল্‌থ্‌ সব হবে। আফটার অল পুরো দেশটা তো ার আমাদের হাতে আসেনি। জগাখিচুড়ি চলছে। তো তার মধ্যে থেকেও এত য়েছে। আরও হবে। যথেষ্ট দিন টিকে থাকা চাই।'

'কত দিন ? চুয়াত্তর বছর ?' রাজেশ্বরী হেসে বলল।

সুকান্তদা এলিয়ে ছিল, উঠে বসে বলল, 'দিস আই কান্ট টেক রাজেশ্বরী। দিস ইজ হটিং বিলো দা বেল্ট। চেষ্টা করা হচ্ছে, প্রচুর প্রচুর সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ, এগোনো চ্ছে আবার পিছিয়ে আসতে হচ্ছে। কিছু ভড়ং আছে। নেতাদের সবাই ধোয়া তুলসী াতা এমন ক্লেইমও আমি করব না। বাট দিস ইজ ফার ফার বেটার দ্যান বফর্স অ্যান্ড শেয়ার স্ক্যাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই সিনসিয়ার। এখন তুমি নর্থ আর সেন্ট্রাল ক্যালকাটার মেয়ে-কলেজগুলোর ভার নেবে কি না বলো। তর্কাতর্কি অনেক হয়েছে। ওয়ার্ডস, ওয়ার্ডস, ওয়ার্ডস। দে অ্যাকমপ্লিশ নাথ্‌থিং। আমরা কেউ ঘাসে মুখ দিয়ে চলি া ভাই। একটা রাজ্য, অন্তত পক্ষে একটা রাজ্যও যদি এককাট্টা হয়ে একটা গণমুখী শাসনতন্ত্র গড়ে তুলতে পারে, এইটুকুই, জাস্ট এইটুকুই এখন আমাদের সামনে লক্ষ্য। এখন বলো !'

রাজেশ্বরী দ্বিধাগ্রস্ত মুখে বলল, 'সুকান্তদা, আমি এ ক'বছর কাজ কর্মের সূত্রে কলেজ-টলেজ অনেক দেখলুম। আমার ক্লান্ত লাগে। একই কথা, একই কাজ। একটুও গভীরে পৌঁছনো যায় না, ব্যক্তিগত ঝগড়ার পর্যায়ে সবকিছু নেমে আসে কখনো কখনো। তুমি আমায় তৃণমূল স্তরে কাজ করার সুযোগ দাও প্লিজ। আমি জানতে চাই। বুঝতে চাই।'

'কিন্তু তুই এত ভালো বলতে পারিস। ক্যারিশ্‌মা আছে। ছাত্র-ফ্রন্টে আমাদের এরকম লোক যে বড্ড দরকার।'

'কিন্তু আমার বলার ক্ষমতা কোন কাজে আসবে বলো, যদি ভেতরের বিশ্বাস থেকে

বলতে না পারি ! শেখানো বুলি কপচানোর কাজে আমি একেবারে অচল। কিন্তু তা:
মানে এই নয় যে আমি কাজ করতে চাই না।'

'তুই তো পলিটিক্‌স্ থেকে সোস্যাল ওয়ার্কের দিকে চলে যেতে চাইছিস।'

'সোস্যাল ওয়ার্কটাই কিন্তু বেশি জরুরি, তা যদি বল।'

'কোনটাই বেশি জরুরি, কম জরুরি নয়, রাজেশ্বরী। কার কোন দিকে ট্যালেন্ট বুঝে আমাদের কাজ করতে হয়। ঠিক আছে আমি তোকে একটা সংস্থার ঠিকানা দিচ্ছি,দেখ কর। কিন্তু য়ুনিভার্সিটিটায় অন্তত আমার কথা রাখিস।'

রাজেশ্বরী ঠিকানাটা নিল। দুজনের মুখের দিকে তাকিয়েই হাসল। বলল, 'চলি। পুলক তখন আরামে কফিতে চুমুক দিচ্ছে, সে বলল, 'আয়। কাউন্টারে দামটা জমা দিে যাস। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।'

রাজেশ্বরী এখন এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যে বছর তিনেক আগেকার দিনগুলো কথা ভাবলে তার সেটাকে পুতুলখেলা-বাল্যকাল বলে মনে হয়। সেখানে সে আর ফিে যাবার কথা ভাবতে পারে না। কিন্তু এখন সে দেখতে পায় কী জটিল বিন্যাস এ আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর। এবং প্রতি পদক্ষেপ এখানে মাড়িয়ে যেতে হয় কত সঙ্কী স্বার্থ, লোভ, উপকারের ছদ্মবেশে কত দলীয় হিংসা। সে যেন একটা তরুণী নদী সাগরে বদলে পৌঁছেছে এসে অন্তহীন এক জলাভূমিতে। যেখানে প্রতি ইঙ্গিতে মাটির চরিত্র জলের চরিত্র প্রবঞ্চক। তার ঠাকুর্দা পলিটিক্যাল সাফারার। পুরো যৌবনকালটাই জেলে কেটেছে। কিন্তু সরকারি পেনশন নেন না। বলেন, 'আমার পুরো যৌবনটার মূল নির্ধারণ হল ওই কয়েকশো টাকা ! ছিঃ ! তাছাড়া আমার তো পৈতৃক সম্পত্তি রয়েছে, শু শুধু আমি সরকারি খয়রাতি নিতে যাব কেন ! যাদের প্রয়োজন আছে তারা নিক।' দাদু বাড়িতে একমাত্র মানুষ যাঁর সঙ্গে রাজেশ্বরীর বনে। ছোট থেকেই সে খুব যুক্তিবাদী কোন জিনিস না বুঝে মেনে নেয় না। এর ফলে আগে আগে সে খুব তর্ক করত একদিন এমনি বাদানুবাদ চলাকালীন মা বলে উঠল, 'উঃ রাজি, কি তর্কই করতে পারিস এত তার্কিক মেয়ের বিয়ে দেব কি করে তাই ভাবছি। কে বিয়ে করবে একে?' দা ছিলেন। দাদু বললেন, 'ও কি কথা বউমা ! আমাদের দেশে পুরুষ আর কতকাল গণ্ডমূ যুক্তিভীরু হয়ে থাকবে, যে ন্যায়সিদ্ধ কন্যা বিয়ে করতে চাইবে না ! না জুটুক বর, তোম ওর জিভ কেটে নিও না।'

রাজেশ্বরীর কাঠামো খুব লম্বা-চওড়া। টকটকে রঙ। মুখ-চোখে বরাবরই একটা দৃ ভাব। এ কারণেও মা বলে থাকে, 'তোর সঙ্গে একটা পাঠান-টাঠান দেখে বিয়ে দিতে হে দেখছি।'

দাদু বলেন, 'দিতে যদি পার সাহস করে তোমায় আমি বাহবা দেব বউমা। জাত-ধর্মে বাঁদরামি ঘোচাবার এমন উপায় কমই আছে। তবে পাঠানের কাঠামো দেখেই শুধু ভুলে না, নাতনির হৃদয়ের মাপটাও নিও।'

এইসব হাসি-ঠাট্টায় দাদু খুব দড়।

রাজেশ্বরীর কলেজ-রাজনীতি যে আজকাল কলেজে সীমাবদ্ধ থাকছে না, বাড়ি ফেরা সময় তার অনিয়মিত, সে যে ক্রমশই আরো সাহসী, আরো স্বনির্ভর হয়ে উঠছে লোকের কথায় কান দেয় না, এ সবেতে তার বাবা-মা দুজনেই অসন্তুষ্ট, চিন্তিত। বা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন, নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি পুরোপুরি খাটিয়ে এখন একজন সফ মানুষ। দাদাও শিগগির বিদেশে যাবে। কিন্তু, বাবা তাঁর ছেলে-মেয়েদের জীবনে কোন

ঝামেলা চান না। তারা যত তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়, সুখী হয়, ততই তিনি খুশি। রাজেশ্বরীর জন্যে এখনই দুজন পাত্র আনা হয়ে গেছে, একজন ডেন্টিস্ট। এখনই খুব পসার। আরেকজন বিদেশে বসবাসরত এঞ্জিনিয়ার। বাবা-মার ইচ্ছা সে এদেরই একজনকে বিয়ে করে সংসারী হয়ে যায়। রাজেশ্বরী হেসে উড়িয়ে দিয়েছে প্রস্তাবগুলো।

দাদু বারান্দায় বসে পাশের বাড়ির বাচ্চার বইয়ে মলাট দিয়ে দিচ্ছিলেন। রাজেশ্বরীকে আসতে দেখে বললেন, 'কী দিদি, দেশ উদ্ধার করে এলে ?' এ কথাটা দাদুদের সময়ের। সেই সময়ে তাঁরা এটা ব্যঙ্গ হিসেবে শুনেছেন। রাজেশ্বরী দাদুর পাশে টুল টেনে বসে পড়ে বলল, 'দাদু, তুমি তো এককালে চেষ্টা করেছিলে, দেশ উদ্ধার করা যায় ?'

দাদু বললেন, 'আমাদের লক্ষ্য অনেক সরল ছিল দিদি, ইংরেজ-তাড়ানো। তা অত সরল কাজটাও ঠিকমতো করে উঠতে পারিনি। আর তোমাদের দেশ উদ্ধার ? সে তো সত্যিকারের অষ্টাদশ-পর্ব ভাই। কী করে আর সোজাসুজি হ্যাঁ পারা যায় বলি।'

হতাশ গলায় রাজেশ্বরী বলল, 'তাহলে চতুর্দিকে এই ব্যর্থতা সব কিছুতেই উৎসাহ নিয়ে আরম্ভ, প্রাণপণ কাজ, তারপর ব্যর্থতা—এটাই সত্যি ? এটাই নিয়তি ? যদিও নিয়তি আমি মানি না।'

দাদু বললেন, 'সে কী ? পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যেতে দেখছ সব ? যতটা চেষ্টা, যতটা আশা ততটা হচ্ছে না। হয়ত এক কি দুই শতাংশ হচ্ছে। জীবন্ত মানুষ নিয়ে তো কারবার—তাই অঙ্ক মেলে না।'

'তাই বলে এইভাবে স-ব বানচাল হয়ে যাবে ?'

'তুমি কি রাশিয়া আর পূর্ব-ইউরোপের কথা ভেবে বলছ ?'

'কতকটা তো তাই-ই। সারা পৃথিবীর মানুষ কি আশা আর বিশ্বাস নিয়ে চেয়েছিল না ওই দিকে ? ভাবেনি এইভাবে মানুষের বেশির ভাগ মৌলিক সমস্যার একটা সমাধান শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল ? এখন আমাদের কী হবে ?'

রাজেশ্বরীর গলা দিয়ে উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ছে।

দাদু বললে, 'দেখ দিদি, আমাদের এখানে তো এরা পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি মেনে নিয়েছে আগেই। মেনে নিয়েছে মাল্টি-পার্টি সিস্টেম। আলাদা মডেলে কাজ হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ার ভাগ্য পরিবর্তনে আমাদের তো সত্যিকার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হওয়ার কথা নয় ?'

'দাদু, পার্লামেন্টোরি ডেমোক্র্যাসি মেনে নিয়েছে বাধ্য হয়ে, কেন্দ্রে ক্ষমতা পায়নি বলে। কিন্তু ঝোঁকটা তো বরাবরই লেনিনিজমের দিকে ! আমরা তো লেনিনিস্ট আদর্শের কথাই সর্বত্র বক্তৃতায় বলে বেড়াই, এখন সেই আদর্শটা মার খেয়ে গেলেও আমরা যদি একই কথা বলতে থাকি, কে শুনবে ? কে বিশ্বাস করবে ? এখনও কি আমরা এই ব্যর্থ তত্ত্বটাই আঁকড়ে থাকব ?'

দাদুর হাতের কাজ থামিয়ে বললেন, 'রাজি, পূর্ব ইউরোপের যদি এ অবস্থা না-ও হত তা হলেও ভারতে কখনও সোভিয়েত মডেল ব্যবহার করা যেত না। কাজে নামলেই পাল্টে যেত মত ও ব্যবস্থা। এত ভাষা, এত ধর্ম, আচার-বিচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, লোকসংস্কৃতি ! চিন, ইউরোপ, এমন কি সোভিয়েত রাশিয়াতেও এমনটা নেই। এতো সব স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই এক খোঁয়াড়ে ভরা যেত না। জলে নামলে তখন বোঝা যায় কত ঢেউ, কত ডুবো পাহাড়, কত চোরা স্রোত। অ্যাবস্ট্রাক্ট ফিলসফির কম্মো নয়।'

রাজেশ্বরী বলল, 'সত্যিই বলছি দাদু আমি কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমার

সামনে টোট্যালিট্যারিয়ান স্টেট যেমন কাঠগড়ায়, গণতন্ত্রও তেমনি কাঠগড়ায়। এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত বিরাট দেশে গণতন্ত্র তো পরিহাস! আবার ডিক্টেটরশিপকেও প্রাণ ধরে রাশ ছেড়ে দেওয়া যায় না। এখানে সমষ্টি যেমন অশিক্ষিত, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিও যে ঠিক সেই অনুপাতেই দাম্ভিক, ক্ষমতালিপ্সু। সুকান্তদা ঠিকই বলেছে। বোধ হয়। তখন খুব খারাপ লেগেছিল, এখন মনে হচ্ছে ঠিকই।'

'কী বলেছে তোর সুকান্তদা?'

'বলছিল মানুষ আসলে জন্তু। মানে জানোয়ার।'

দাদু চিন্তিত স্বরে বললেন, 'মানুষ তো আসলে জন্তুই। সেটা ঠিক আছে। কিন্তু জানোয়ার কী? খুবই চেঞ্জফুল, অনেকটাই পরিবেশ, শিক্ষা, সংস্কারের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু রাজি আমরা যখন কাজ করতুম, মানুষকে জানোয়ার দেখিনি ভাই। অনেকগুলো বছর হয়ে গেল। এখন···কী জানি! ভাবের কথা বলছি না, সত্যিই মানুষকে জানোয়ার দেখিনি···।'

রাজেশ্বরী হঠাৎ বুঝতে পারল— তার বাবা-মার সঙ্গে তার জেনারেশন গ্যাপ। এমন কি তার নিজের সমসাময়িকদের সঙ্গেও। দাদুই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর সঙ্গে তার কোনও জেনারেশন গ্যাপ নেই। তারা দুজনেই এক মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে পুব দিকে মুখ করে, হাত ভর্তি আশা, উৎসাহ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, কর্মৈষণা? হায়! নেবার জন্যে কি কেউই নেই?

২১

জ্বলন্ত রোদের মধ্যে

মিঠু রিহার্স্যাল থেকে বাড়ি ফিরছে। একা একা। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে তাদের প্রথম কয়েকটা শো হয়ে গেছে। কিন্তু প্রায় প্রতিদিন এখনও মহলায় যেতে হয়। আরও ভালো, আরও নিখুঁত— পার্থপ্রতিমের দাবি এই। সাধনা এই। প্রথম প্রথম সে আর ঋতু একসঙ্গে ফিরত। কিন্তু গত ক'দিনই তাকে একলা ফিরতে হচ্ছে। ঋতু এমন করে যেন সে অবাঞ্ছিত উপস্থিতি একটা। যত তাড়াতাড়ি চলে যায় ততই মঙ্গল। পুরনো কলকাতার পটভূমিতে নাটক 'কল্লোলিনী উনিশশ'। ঋতু তার কত্থক নাচে পারদর্শিতার জন্যেই সেজেছে বাইজি। নিকি বাইজি। খুব ভালো করছে। মিঠুর ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সে এক ধনী সম্ভ্রান্ত ঘরের নিঃসন্তান বধূ। একলা। পর্দানশীন। কিন্তু সে নিধুবাবুর, দাশরথি রায়ের, রামপ্রসাদের গান গায়, তার এই গানে, একাকিত্বে তার চরিত্রের রহস্যময়তায় তাদের অভিজাত পরিবারেরই কোনও কোনও পুরুষ মুগ্ধ। একজন উদীয়মান কবির কাছে সে মূর্তিমতী প্রেরণা। ইতিহাস এবং কল্পনাকে খুব সূক্ষ্মভাবে মিশিয়ে নাটকটি তৈরি করেছেন পার্থপ্রতিম। এখানে নায়ক আর কেউ নয়—কলকাতা স্বয়ং। সে ক্রমাগত অর্থহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে নিকি বাইজি আর কাদম্বিনীর জগতের মাঝখানে। এক জায়গায় শিল্প পণ্য হয়ে গেছে, রিপু বিকারের দাসত্ব করছে। আরেক জায়গায় শিল্প চিক আর মখমলের পর্দার আড়ালে অসূর্যম্পশ্যা। উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া কলকাতা। রক্ষণশীল, অত্যাচারী কুসংস্কারাচ্ছন্ন কলকাতা। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে চমৎকার নাটক। ঋতুর কোনও জড়তাই নেই। মিঠুর একটু দেখা গিয়েছিল। কিন্তু

পার্থপ্রতিম বলেছেন ওটা তার চরিত্রের সঙ্গে খুব সুন্দর মানিয়ে গেছে। পার্থপ্রতিম নিজে আছেন রামমোহনের ভূমিকায়। পরিচালনাও তাঁরই।

মিঠু বাড়ি ঢুকে মাকে খুঁজতে লাগল। খুব সঙ্কটের সময়ে তার মাকে দরকার হয়। মা ছাতে। পাঁচিলের কাছে গালে হাত দিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধের অন্ধকারে এটুকুই বোঝা যাচ্ছে। মিঠু পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মা!' চমকে পাশ ফিরলেন অনুরাধা, 'এসেছিস? আজ তো খুব দেরি হল, ঋতুর সঙ্গে এলি?'

'না। কেন আমি একা আসতে পারি না?'

—'তা পারবি না কেন? কিন্তু তুই-ই তো দেখি একলা একলা যাওয়া-আসা করতে পছন্দ করিস না। খাবি এখন কিছু?'

'উঁহু। বাবা আসুক। একসঙ্গে খাব।'

কিছুক্ষণ পর মিঠু বলল, 'মা...পার্থপ্রতিম তোমার কি রকম বন্ধু?'

'কি রকম বন্ধু? মানে? দুজনে আর্ট কলেজে এক সঙ্গে পড়েছি...।'

'খুব বন্ধু? উনি কি রকম লোক, সত্যি?' মিঠুর মুখ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।

'এতদিন পর একথা জিজ্ঞেস করছিস? পার্থপ্রতিম তো তোদের খুব ছোট থেকেই এ বাড়িতে আসছে!' অনুরাধা অবাক হয়ে বললেন।

মিঠু একদম চুপ করে গেল। বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তার মুখ কালো হয়ে আছে। সে ভীষণ ক্ষুব্ধ, অশান্ত।

অনুরাধা বললেন, 'কী হয়েছে রে?'

মিঠু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ঋতুর সঙ্গে উনি এমন ভাবে মেশেন যে আমি...আমি মানতে পারি না।'

অনুরাধা কিছু বললেন না। তিনি চাইছেন মিঠু আরেকটু বলুক।

'মা, আর্টিস্ট বলে কি তাদের কাছে আমাদের প্রাইভেসি থাকবে না? ঋতুর ওসব পেশোয়াজ টাজ, কস্টুম পরা যথেষ্ট অভ্যাস আছে, নাচ ও আজ করছে না, উনি কেন পরাতে আসছেন? মেকাপের লোক উনি?'

অনুরাধা বললেন, 'আর্টিস্টরা একটু পার্ফেকশন খ্যাপা হয়।'

'না, তা নয় মা। জানো আজকাল রিহার্স্যালের পর ঋতু কেন আমার সঙ্গে বাড়ি ফেরে না! ওঁর গলফ-গ্রীনের ডেরায় যায়। উনি ঋতুকে মডেল করে ছবি আঁকছেন। বেশির ভাগই নাচের ছবি। কিন্তু নুডও আছে।' অন্ধকারে মিঠু মুখ বিকৃত করল বিতৃষ্ণায়, 'ও কী মডেল যে...'

অনুরাধা বললেন, 'ও যদি রাজি হয়ে থাকে তো—'

'মা অত লাইটলি নিও না ব্যাপারটা। ও বাড়িতে বলে রেখেছে রাত্তিরে না ফিরলে বুঝতে হবে আমাদের বাড়ি থেকে গেছে। অর্ধেক দিনই ও বাড়ি ফিরছে না।'

অনুরাধার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। মিঠু বলল— 'সবার সামনেই ঋতু ওঁর সঙ্গে যা করে না, আমার তো কষে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করে। উনিও তো প্রশ্রয় দেন! ছিঃ।'...এখন আমি কী করব মা?'

'কি বিষয়ে?'

'নাটকটা। নাটকটা করতে আমার খুব ভালো লাগছে। কিন্তু ওই ব্যাপারটা...আমার ঘেন্না করছে।'

'কটা শো আছে?'

'চার পাঁচটা এ দফায়।'

'এগুলো করে নে। তারপর আর যাস না।'

মিঠুর চোখ ছলছল করছে। সে ঢোঁক গিলছে। অভিনয়ে তার নেশা লেগে গেছে এখন। একটু পরে সে বলল, 'মাসিদের, মানে ঋতুর মা বাবাকে আমি কী বলব!'

'কেন? তোর সামনেই কি তোর বাড়ি থাকার কথা বলেছে?'

'একদম প্রথম দিনেই বলল তো। তখন তো আমি জানি না ও এ রকম করবে। এখন তো আমিও ওর সঙ্গে মিথ্যের জালে জড়িয়ে পড়ছি।'

একটু ভেবে অনুরাধা বললেন, 'ঠিক আছে। আমি ভেবে দেখছি কী করতে পারি। তুই যা, জামা-কাপড় পাল্টে নে। হাত-মুখ পর্যন্ত ধুসনি মনে হচ্ছে!'

মিঠু আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেল। খাবার সময়ে দেখল মা ভীষণ গম্ভীর, অন্যমনস্ক। বাবা এক সময়ে বলল, 'কী ব্যাপার রাধা? আজ যেন তোমায় কেমন দেখাচ্ছে!'

'এমনি. শরীরটা ভালো লাগছে না।'

বাবা উদ্বিগ্ন মুখে তাকাল। মা বলল, 'তেমন কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে।' মিঠু মনে মনে ভাবল কথাগুলো সে মাকে না বললেও পারত। সে শিগগিরই অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাবে। ক্ল্যাসিক গল্প, উপন্যাস, নাটকের মেয়েদের থেকে সে বয়সে বড়। মাকে না ভাবিয়ে এই সমস্যাটার সমাধান সে করতে পারত না! একটু ভাবতে হত। সাহসের দরকার হত। আসলে ছোটবেলায় কিছু হলেই যেমন সে মায়ের কাছে ছুটে যেত, এখনও তাই-ই যাচ্ছে। মা তার খুব বন্ধু সন্দেহ নেই। কিন্তু মা অনেক সময়েই তাকে নিজস্ব বুদ্ধিতে চলার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। ঠিকই করে।

পরদিন সকাল এগারোটা নাগাদ সে ঋতুকে ফোন করল। ভেঙ্কটের বাড়ি থেকে গৌতম ফোন করেছিল ওদের গেট টুগেদারটা হচ্ছে না। ভেঙ্কটের টাইফয়েড। খবরটা সে ঋতুকে রিহার্স্যালে দেয়নি। সুতরাং এই একটা অজুহাত আছে।

'ঋতু আছে?'

'কে বলছ?'

'আমি মিঠু।'

'মিঠু? সে কী? ঋতু তো তোমাদের বাড়িতেই!'

'এখনও ফেরেনি?' খুব শান্ত গলায় মিঠু বলল। যদিও তার কান ভীষণ গরম, 'একটা দরকার ছিল।' সে ফোন রেখে দিল। ঋতুটা ভেবেছে কী? এগারোটা বেজে গেল। এখনও বেপাত্তা।

সাড়ে বারোটার পর ঋতু ফোন করল।

'আমি ঋতু বলছি। মিঠু তোর ব্যাপার কী? ফট করে বাড়িতে ফোন করে আমায় চেয়েছিস। জেরায় জেরায় অস্থির হয়ে যাচ্ছি। আমি তো এসেই বলেছি মিঠুদের বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।'

মিঠু শুনল কিছুক্ষণ। ঋতু খুব উত্তেজিত, বোঝাই যাচ্ছে। সে গম্ভীর ভাবে বলল, 'দরকার ছিল। ভেঙ্কটের বাড়ির পার্টিটা ওই দিন হচ্ছে না। ওর টাইফয়েড।'

'লেট ভেঙ্কট গো টু হেল। বাজে ব্যাপার সব। তুই কেন এই নিয়ে ফোন করতে গেলি?'

'আমাদের বন্ধুদের একজনের সিরিয়াস অসুখ, এটাকে বাজে মনে করিনি প্রথম কথা,

দ্বিতীয় কথা, তুমি তো আমার বাড়ি ছিলেও না, খেয়েও যাওনি, খাবার কথাও ছিল না।'

'হোয়াট ডু ইউ মীন?'

'ওনলি দিস যে তুমি সারা রাত্তির বাইরে কাটিয়ে দুপুরে বারোটায় বাড়ি ফিরবে আর আমি তোমার অ্যালিবাই খাড়া করব বসে বসে— এমন কোনও বোঝাপড়া আমাদের মধ্যে হয়নি। খোলাখুলি কথাটা হলে তখনই আমার আপত্তি জানিয়ে দিতাম। লজ্জা হওয়া উচিত তোমার।'

'কী বললি? লজ্জা? লজ্জা হওয়া উচিত? কেন? আই লাভ পার্থপ্রতিম। হী লাভস মী। তোর কি হিংসে হচ্ছে?'

ঋতুর সোজাসুজি স্বীকারোক্তিটা মিঠুর কানের কাছে একটা বোমার মতো ফেটে গিয়েছিল। সে অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে বলল— 'হিংসে? কিসের জন্যে?'

'জানিস না? একটা এ ক্লাস ট্যালেন্টেড লোকের কাছ থেকে মনোযোগ না পেলে হিংসে হয়? নিজের অ্যাক্টিং-এর চেয়ে অন্যের অ্যাক্টিং বেটার হলেও হিংসে হয়। জানতিস না বুঝি? জেনে রাখ' ঋতুর গলা হিস হিস করছে।

'তুইও জেনে রাখ', মিঠু এখন চেঁচাচ্ছে, 'বাবার বয়সী একটা লোকের কাছ থেকে তোর পদ্ধতিতে মনোযোগ আদায় করার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। তোকে মনে করিয়ে দিচ্ছি ঋতু। তুই নিকির ভূমিকায় অভিনয় করছিস। অভিনয়। ওটা অভিনয়। আর কত ভালো অভিনয় তুই করছিস সে নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। আমি তোদের ওই নোংরা রিহার্স্যাল-রুমে আর যাচ্ছি না, যাচ্ছি না।'

'অত ঝগড়া করছিস কার সঙ্গে?' মা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে মিঠু দেখল মায়ের পাশে পার্থপ্রতিম। সে তাঁকে উপেক্ষা করে মায়ের দিকে তাকাল, বলল, 'ঋতুর সঙ্গে।' তার পর পার্থপ্রতিমের দিকে ফিরে, মুখের দিকে না চেয়ে বলল, 'শেষ কথাগুলো নিশ্চয়ই শুনেছ। আমি নাটক করছি না।'

'সে কী? এখন এই শেষ মুহূর্তে? মিঠু বলছিস কী? অলরেডি তোর কাদম্বিনী খুব সুখ্যাতি পেয়েছে। শোন প্লিজ।' পার্থপ্রতিম এগিয়ে আসছেন। মানুষটা বিরাট। মিঠু তাঁর কাঁধ পর্যন্তও পৌঁছয় না। মানুষটার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ বরাবর ছিল। মিঠু তাঁকে কাকু বলে জানে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই নামটা ধরতে হয়। পুরো নাম। উনি বলেন আমার পরিচয় আমি পার্থপ্রতিম, এই নাম ধরেই আমায় ডাকতে হবে। মিঠু পার্থপ্রতিমের হাতটা তার কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে দিল, বলল, 'তুমি আমাদের বাড়ি আর আসবে না।' বলতে বলতে তার কান্না পেয়ে গেল। কারণ ছেলেবেলায় যে সদাহাস্যময়, রহস্যে-ভরা, মুঠোয় চকোলেট, পকেটে-ছবি মানুষটির সঙ্গে তার পরিচয় সেই মানুষটাই এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাঁর অ-্য মুখ সে দেখেছে। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালোবাসার সেই মূর্তিটা এখন তার সামনে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে। তার চেনা পার্থপ্রতিম একটা কিংবদন্তী। একটা মিথ্যেকে সে ভালোবেসেছিল।

কান্নাটাকে প্রাণপণে গিলে নিয়ে মিঠু সিঁড়ির কাছে দৌড়ে গেল। চটি পায়ে গলালো। হলুদ দোপাট্টা পেছন দিকে উড়ছে, সে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সদর দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেবার শব্দ হল।

মুখের ওপর কালো ছায়া, পার্থপ্রতিম আস্তে আস্তে বললেন, 'রাধা, তুইও কি এবার আমায় তাড়িয়ে দিবি? তোর মেয়ের মতো।'

অনুরাধা বললেন, 'তুমি তো ওকে বাধ্য করলে পার্থপ্রতিম। মিঠুকে আমি এত রেগে

যেতে, এত বিচলিত হতে কক্ষণো দেখিনি। বুঝতেই পারছ এই জন্যেই তোমায় ডেকেছিলুম। পার্থ...ঋতু আমার মেয়ের বন্ধু...আমি...' অনুরাধা আর কিছুই বলতে পারলেন না। লবণের স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

'তুই তো জানিসই আমি একটা পাগল-ছাগল, বা শয়তান। শয়তানও বলতে পারিস। জানিস তো আমি ভণ্ডামিতে বিশ্বাস করি না। সংযম-টংযম মানি না। আমার যখন যা ইচ্ছে হয় করি। মানে যা ভালো লাগে। কারুর ওপর কিছু আমি ইমপোজও করি না। কিন্তু রাধা এগুলো বোধ হয় আসল আমি নয়। কাজটা, আমার কাজটাই আসল। সেখানে কোনও অসংযম তোরা দেখতে পাবি না। আহ্ "কল্লোলিনীটা" কী ভালোবাসা দিয়ে করেছিলুম রে। মিঠুকে দিয়ে...ওহ্', পার্থপ্রতিম মাথাটা নাড়তে লাগলেন যন্ত্রণায়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন পার্থপ্রতিম, কয়েক ধাপ পেছনে অনুরাধা।

'আচ্ছা এত মেয়ে, সব বয়সের, আমার কাছে এরকম পতঙ্গের মতন ছুটে আসে কেন বল তো! কী আছে আমার! ওই মেয়েটি ঋতুপর্ণা—এ লাভলি অ্যানিমল, কয়েকটা স্কেচ যা নিয়েছি না! ননকনফর্মিস্ট, কিন্তু কী সাপল বডি!'

অনুরাধা বললেন, 'এসব কথা আমি সইতে পারছি না পার্থ, আমার গায়ে জ্বালা ধরছে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে পার্থপ্রতিম বললেন, 'গায়ে জ্বালা ধরছে? বাঃ গুড সাইন!'

'না, না,' অনুরাধা বললেন, 'আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না ও আমার মেয়ের বন্ধু, মেয়েব বন্ধু!'

'মানে মেয়েও হতে পারত, এই তো!' পার্থপ্রতিম মৃদু হেসে বললেন।

'উঃ', কানে আঙুল দিলেন অনুরাধা।

'ঠারে-ঠোরে বলার চেয়ে সোজাসুজি বলাই তো ভালো' পার্থপ্রতিম বললেন, 'মিঠু তোর মেয়ে, আমারও তাই মেয়ে। কন্যা। কন্যাটি বড় হয়ে গেছে। খরশান। নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিয়ে কেমন উন্নতগ্রীব রাজহংসীর মতো চলে গেল হলুদ পাখনা দুলিয়ে! এখন বড় হয়ে গেছে, নৈতিক বিচারগুলো করবার মতো বড় বলে মনে করছে নিজেকে। রাধা, ওকে আরো বড় হতে দিস। বাড়টা যেন ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে বন্ধ করে দিস না। আরও বড় হলে, ও আমাকে পুরোপুরি মেনে নিতে না-ই পারুক, অন্তত বুঝতে পারবে। তখন হয়ত তোর মতই এক একটা পাকা চুল ঝিলিক দিচ্ছে মাথায়। তখন যদি দরজাটা খুলে দিয়ে বলে আবার---অনেক দিন আসোনি কাকু, এসো...আহ!'

সদর দরজাটা মাথা একটু নিচু করে পার হলেন পার্থপ্রতিম। দরজাটা যথেষ্ট উঁচুই। কিন্তু তাঁর এরকমই অভ্যাস। কাঠবাদাম গাছটার পাশে একবার দাঁড়ালেন। খুন-খারাপি রঙের পাতাগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখলেন, তারপর রাস্তাটা দ্রুত পার হয়ে একটা বাঁক ফিরে চলে গেলেন জ্বলন্ত রোদের মধ্যে।

২২

স্থির ধারণা যে সে যিশুখ্রীষ্টকে দেখেছিল

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের কাছে একটা গলিতে ঠিকানাটা। মূল রাস্তাটা মোটামুটি চওড়া। কিন্তু আসল ঠিকানাটায় সরু একটা মাটির গলি পেরিয়ে পৌঁছতে হয়। খুঁজে

খুঁজে নাজেহাল রাজেশ্বরী অবশেষে স্থানীয় ছেলেদের শরণাপন্ন হয়ে তবে পেল। বহু কালের পুরনো বাড়ি। নিচু দরজা। প্রথমেই সে হোঁচট খেয়ে পড়ল। দড়াম করে একেবারে। চৌকাঠটা উঁচু। তারপরে মেঝেটা খুব নিচু। কতটা, অন্ধকারে সে ধরতে পারেনি। ছেলেগুলো বাইরে দাঁড়িয়েছিল। বলল--'ইসস্ আপনি পড়ে গেলেন ?' দু চারজন ভেতরে এসে ধরাধরি করে তাকে তুলল। ভাগ্যিস জায়গাটা শুকনো। তাই শাড়ির ধুলো-বালি ঝেড়ে নিতেই রাজেশ্বরী মোটামুটি ভদ্রস্থ হয়ে গেল। তার চিবুক একটু ছড়ে গেছে, জ্বালা করছে। হাঁটুতে বেশ লেগেছে। সে দাঁড়িয়ে হাঁটুটাকে দু-একবার সামনে পেছনে মুড়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছে, একটি ছেলে বলল, 'লেগেছে খুব ? সত্যি, লীলাদি পারেনও বটে, এই একজন ওঁর সঙ্গে যা তো !' এত অন্ধকার আর উঁচু উঁচু সিঁড়ি যে রাজেশ্বরী এই সাহায্য প্রত্যাখ্যান করতে সাহস করল না। ছেলেটি তাব আগে আগে পথ দেখিয়ে উঠে গেল, তারপর সামনের ঘরে ঢুকে গেল। একটু পরে বেরিয়ে এসে বলল, 'যান।'

ভেতরে ঢুকে এই দিনের বেলাতেও বিজলি-বাতি-জ্বলা ঘরে বহু মেয়েকে সে ছুঁচ সুতোর বাণ্ডিল হাতে মাদুরে বসে বড় বড় কাপড় নিয়ে এমব্রয়ডারি করতে দেখল। মেয়েগুলি কেউ-কেউ একটুক্ষণের জন্যে মুখ তুলে দেখল তাকে, তারপর আবার যে যার কাজে মন দিল। এ ঘরটা পেরিয়ে একটা ছোট ঘর। ঘরটা জুড়ে একটা টেবিল। তার ওপর স্তূপীকৃত কাগজপত্র। ওধারে একজন শীর্ণ কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত চেহারার ভদ্রমহিলা। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। আন্দাজে সে বুঝল ইনিই লীলাদি। ব্যাগের ভেতর থেকে সুকান্তদার চিঠিটা বার করে সে ভদ্রমহিলার হাতে দিল।

'কী হল ? অরুচি না অজীর্ণ ?' চিঠিটা পড়ে ভদ্রমহিলা কর্কশ, শ্লেষমিশ্রিত স্বরে বললেন। রাজেশ্বরী চুপ করে চেয়ে আছে দেখে বললেন, 'বুঝতে পারছ না ? বলছি পলিটিক্স অমন রসালো আঁটি, কত বক্তৃতা, মেলা-মেলাদ, কত লড়াই, মিছিল, স্লোগান--সব অরুচি ধরে গেল ?'

রাজেশ্বরী এত হতবাক হয়ে গেছে যে কিছুই তার মুখে আসছে না।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'হবে না, পারবে না।'

'কী পারব না ? কেন ?' রাজেশ্বরী এতক্ষণে বলল।

'শাড়িটার কত দাম ? যেটা পরে আছ ?'

'দাম ?' বিমূঢ় হয়ে চেয়ে আছে রাজেশ্বরী।

'শ তিনেক তো হবেই। বাপের কিনে-দেওয়া দামী শাড়ি পরে এ ধরনের সোশ্যাল ওয়ার্ক হয় না। আমরা শখের সোশ্যাল ওয়ার্ক করি না। দুঃস্থ মানুষ নিয়ে আমাদের কারবার। ও ঘরে ওই মেয়েগুলো কাজ করছে, দেখেছ ? সব শ্যামপুকুর-বেলগেছের বস্তির মেয়ে। সারা দিন বাড়ি-বাড়ি হাড়ভাঙা খাটনি খাটে, আর রাত্তিরবেলায় ঘরের মানুষের হাতে চোরের ঠ্যাঙানি খায়। বেশির ভাগেরই আবার পুরুষটি ভেগেছে। এন্ডি-গেন্ডি ছেলেপুলে। ছেলেপুলেদের পড়াতে পারবে বলে সারা সকাল খাটনির পর দুপুরবেলায় এখানে এসে সেলাই করে। এইখানে এদের অক্ষরপরিচয়, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, জন্মনিয়ন্ত্রণ এসব শেখাতে পারবে ? এখনই তো গলগল করে ঘামছ দেখছি !'

রাজেশ্বরী খুব বিরক্ত স্বরে বলল—'আপনি ওরকম করে বলছেন কেন ? ঘামছি, সেটা আমার দোষ ? বাবার কিনে-দেওয়া দামী শাড়ি পরাটা না হয় দোষের হল। যারা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল, তারা যদি এদের সাহায্য করতে চায় তো লাভটা তো এদেরই !'

'তাই নাকি ? এদেরই লাভ ? তোমাদের লাভ নেই বলছ ? চাকরি, নেতাগিরি এসবের সুবিধে হবে না বুঝি ! এদের লাভ ! বটে ! এরা যত উচ্ছন্নে যায় তোমাদের তত ছিরি খোলে তা জানো ? কাজের লোকের বিয়ে-থা হলে শকুনের মতো বসে থাকো না ? কবে বরে নেবে না, গর্তের ইঁদুর আবার গর্তে ফিরে আসবে ? এই সেলাই-ঘর খুলেছি বলে এখানকার লোকেদের একটু দাসী-প্রবলেম হয়েছে। আমাকে তার জন্যে যা-নয়-তাই অপমান করে, তা জানো ?'

এবার রাজেশ্বরীর হাসি পেল। সে বলল, 'আমি তো করছি না ! আমাকে অত বকছেন কেন ? তা ছাড়া আমার কিন্তু একটু গ্রামের দিকে কাজ করবার ইচ্ছে।'

'তাই বলো ! ঠিকই ধরেছি ! অ্যাডভেঞ্চার ! জনসেবা-জনসেবা খেলা খেলতে সাধ গেছে। রোম্যান্স ! গ্রাম কাকে বলে জানো ? গাঁ ? রাতে আলো জ্বলে না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সাতটার মধ্যে সব সকালের জল দেওয়া ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে। কেরাচিনি নেই যে আলো জ্বলবে। পেঁচা ডাকবে, শেয়াল ডাকবে। বাসি পান্তা দিয়ে ব্রেকফাস্ট। আমানি খেয়েছ ? ভাত পচা জল ! টকটক ! সবে ফার্মেন্টেশন শুরু হয়েছে। মাঠে-ঘাটে বাহ্যে-পেচ্ছাপ যেতে হবে, বিছে-সাপ-হুকওয়ার্ম সবই ধরতে পারে ! গ্রাম !!' ভদ্রমহিলা অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের সঙ্গে বললেন। 'আগে অর্বাচীন প্রোলেটারিয়েটের মধ্যে কাজ করো, দেখো পার কি না, তবে গাঁয়ের কথা ভেবো। আর এটুকু কষ্টও যদি অসহ্য হয়, তো এসো গিয়ে।' ভদ্রমহিলা কিছুর একটা হিসেব করছিলেন, সেদিকেই চোখ ফেরালেন।

রাজেশ্বরী বলল, 'আমি আবার আসব। আজ চলি।' বলবার ইচ্ছে হয়েছিল, সেদিন সস্তার শাড়ি পরে আসব। ভুল হবে না। কিন্তু বলল না। লীলাদির মাথার মধ্যে একটু গণ্ডগোল আছে—বোঝাই যাচ্ছে। সে বেরিয়ে এলো।

সবাই সেলাই করছে। সে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একজনের সামনে উবু হয়ে বসে বলল, 'কী এমব্রয়ডারি করছেন আপনারা ?' জবাবে মেয়েটি, এবং আশেপাশে আরও কয়েকজন খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে গেল। ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে রাজেশ্বরী বলল, 'হাসছেন কেন ? কী হল ? বাঃ কী জিনিস করছেন জিজ্ঞেস করছি...।' হাসি বেড়ে গেল। একজন বয়স্ক মহিলা ওরই মধ্যে হাসি চেপে বলল, 'কাঁতা ইস্টিচ করছি গো, পাঞ্জাবি, জামা, কামিজ, গায়ে-দেবার চাদর স-ব কাঁতা ইস্টিচ। এখন যে তোমাদের খুব ফেশন গো দিদি !'

'দেখি কেমন ?' খানিকটা দেখে সে বলল, 'বাঃ খুব সুন্দর রং মিলিয়েছেন তো ? হাসছিলেন কেন ?' আবার হাসির হুল্লোড়। রাজেশ্বরী বুঝে গেল যে কারণেই হোক সে যেমন ভেতরের ওই লীলাদি নামক ভদ্রমহিলার কাছে রাগের জিনিস, তেমনি এদের কাছে হাসির খোরাক।

সে উঠে দাঁড়াল। এবার বেরিয়ে আসবে। এমন সময় একজন জিজ্ঞেস করল, 'দিদিমণির বাড়ি কোথায় ?' সে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ভবানীপুর।' একজন বলল, 'সেটা কোথায় ?' আরেকজন জবাব দিল, 'মায়ের থানের কাছে রে !' তখন আরেক জন বলল, 'তোমার খুব ভাগ্যি দিদিমণি, রোজ মায়ের দর্শন পাও, পুজো দিতে পার', 'কত ভাগ্যি করলে তবে মায়ের থানের কাছে বাড়ি হয় !' আরেকজন মন্তব্য করলে। একটি অল্পবয়সী বউ এই সময়ে ফিক করে হেসে বললে, 'রাজপুত্তুরের মতো বর হবে দিদিমণির।' তার পাশের জন বলে উঠল, 'কী একটা যেন কথা বললি, দিদিমণি জগদ্ধাত্রীর মতো, দিদিমণির হবে না তো কি...' তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বয়স্ক একজন বলল, 'আবার এসো গো

দিদিমণি,' অল্পবয়সী বউটি বলল, 'ছেলে কোলে।' জবাবে একজন বলল, 'ছেলেও হবে রামের মতো এত খানিক, ওই যে টি.বির রাম, গোবিল না কি ?' অল্পবয়সী বউটি দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে বলল, 'ছেলেই হবে, রামের মতো হবে, এতো কথা কী করে বুঝলে গো মাসি ?' মাসি বলল, 'পাছার গড়ন দেখলেই বলতে পারি।'

এই কথাগুলো কানে নিয়ে রাজেশ্বরী বেরিয়ে এলো। ওরা কি সবাই মিলে তার পেছনে লেগেছিল না কি ? যাকে বলে আওয়াজ দেওয়া ! বর ! ছেলে ! পাছার গড়ন ! উঃ ! কী পাল্লাতেই পড়েছিল ! লীলাদিদিমণি তো চশমার ফাঁক দিয়ে যা বললেন তার সোজাসুজি মানে দাঁড়ায়, এটা কি নাট্যশালা ? নাট্যশালা না কি ? রাজেশ্বীরর থেকে নরম ধাতের কেউ হলে হয়তো কেঁদে ফেলত, নয় ঝগড়া করে আসত। সুকান্তদা কি তাকে দমাবার জন্যেই ইচ্ছে করে এরকম জায়গায়, এরকম লোকের কাছে পাঠিয়েছে ? তা যদি হয়, সুকান্তদার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

সে একটা ট্রাম ধরল। ভেঙ্কট বেচারির টাইফয়েড। অতদিনের আশার গেট-টুগেদারটা ওর আবার পিছিয়ে গেল। যতই ওর ফাজলামি অপছন্দ করুক—রাজেশ্বরীর মনে হল এত কাছে এসে ওকে না দেখে ফিরে যাওয়াটা খুব খারাপ হবে। এ ঠিকানাটা খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধে হল না। দরজা তো নয়। দেউড়ি যাকে বলে। খোলাই। সে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল। একটু প্যাসেজ পার হয়েই চৌকো উঠোন। প্রচুর ফুলের টব। মাঝখানে একটা বাঁধানো পুকুরে রঙিন মাছ। রাজেশ্বরী ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কোথাও নেই। অথচ সব খোলা। কী করবে ? 'ভেঙ্কট ভেঙ্কট' করে ডাকাটাও কেমন অশোভন। সে তো এই প্রথম এলো ! বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর রাজেশ্বরী বাঁদিকের চওড়া সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে লাগল। উঠে সে বারান্দার এক ধারে দাঁড়িয়ে রইল। এখানেও কেউ কোথাও নেই। খুব দূর থেকে যেন লোহাকাটার আওয়াজ আসছে। ধুপ ধুপ করে কাপড় কাচছে কেউ। তার হাত-ঘড়িতে দুপুর আড়াইটে।

হঠাৎ রাজেশ্বরীর মনে হল এই জায়গাটা সে চেনে। আগেও এসেছে এখানে। ঠিক এইরকম পরিস্থিতি আগেও হয়েছে। সে যেন একটা খুব গোলমেলে জায়গায় গিয়েছিল, সেখানে কে তাকে খুব বকে, কারা খুব হাসি-ঠাট্টা করে, তারপর ট্রামে চড়ে সে একটা পুরনো বনেদী বাড়ির চকচকে লাল সিমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এমনি একটা রারান্দার ওপরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল।

এই সময়ে ডান পাশের ঘর থেকে গৌতম বেরিয়ে এলো। বেরিয়েই সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। 'রাজেশ্বরী ?'

রাজেশ্বরী বলল, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। কি করব বুঝতে পারছিলাম না।'

'তাই নাকি ? ঘেঁটুকে দেখতে এসেছিস ?'

'ন্যাচার‍্যালি। ঘেঁটু বুঝি ভেঙ্কটের ডাক নাম ?' রাজশ্বরী হাসল, 'যাক একটা ভদ্র নাম তা হলে ওর আছে !'

চকচকে পালিশের কাজ করা দরজা। গৌতম বলল, 'আয়। ঘেঁটু যা খুশি হবে না !'

'আছে কেমন ?'

'একেবারে আসল জিনিস হয়েছিল তো ! দুর্বল খুব। জ্বর নেই এখন।'

'জেগে আছে তো !'

'একেবারে প্যাঁট প্যাঁট করে, ঘুম বেশি হয় না তো এ রোগে।'

রাজেশ্বরীর গলা শুনতে পেয়েছিল ভেঙ্কটেশ। দু তিনটে বালিশ পিঠে একটা দারুণ সূক্ষ্ম কারুকাজকরা পালংকে ঠেস দিয়ে আধ-বসা হয়ে ছিল।

পাশে টেবিলে ফলের টুকরি। একটা মিক্সি। হীটার। সন্দেশের বাক্স। তার সামনে ভেলভেটের গদী-দেওয়া চুড়ো-অলা চেয়ার। রাজেশ্বরী চেয়ারে বসলে ভেঙ্কট এমন একটা হাসি হাসল যে কিছুক্ষণ আগেকার অভিজ্ঞতাটা রাজেশ্বরী একেবারে ভুলে গেল। সে যে অত্যন্ত বাঞ্ছিত, প্রায় অপ্রত্যাশিত, সম্মানিত একজন রাজকীয় অতিথি এটাই ভেঙ্কটেশের হাব-ভাব থেকে ফুটে বেরোচ্ছিল।

গৌতম বলল, 'ভাগ্যিস ঘেঁটু, আজই তোর দাড়ি গোঁফ ট্রিম করে দিলুম !'

ভেঙ্কট ক্ষীণস্বরে বলল, 'ট্রিম করলেই বা কী ! না করলেই বা কী ! শালগ্রামের শোয়া-বসা !'

গৌতম খুব খুশি-খুশি মুখে বলল, 'রাজেশ্বরী তুই কিন্তু রিয়্যালি। মিঠু উজ্জয়িনী ফোন করে খবর নিয়েছে, পুলক এসেছে একবার, কিন্তু তুই একেবারে সোজা এভাবে এসে পড়বি—আমরা...'

ভেঙ্কট কথা কেটে বলল, 'কখন বেরিয়েছ ?'

ঘড়ি দেখে রাজেশ্বরী বলল, 'সাড়ে এগারোটা হবে।'

ভেঙ্কট ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এই গৌতম প্লিজ, রাজেশ্বরীকে কিছু খাওয়া। ভালো করে খাওয়া। ননীর রাবড়ি আন, নদীয়া সুইটস থেকে ভালো...'

'অমন করছিস কেন ?' গৌতম বলল, 'এই তো টেবিলে একগাদা ফল মিষ্টি রয়েছে আমি দিচ্ছি।'

'না না, ওসব রোগের ঘরের জিনিস। ওসব দিসনি। যা না বাবা একবার ননীর দোকানে।'

রাজেশ্বরী বলল, 'এই রোদে সত্যি ওকে পাঠাচ্ছিস কেন ! আর তোর কি ছোঁয়াচে অসুখ হয়েছে যে ওরকম করছিস ! আমি এইখান থেকেই ঠিক খেয়ে নেব। কিছু হবে না।'

গৌতম বলল, 'মুসাম্বির রস করে দিচ্ছি তোকে রাজেশ্বরী, বরফ দিয়ে। দাঁড়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মস্ত এক প্লেট ফল আর মিষ্টি রাজেশ্বরীর হাতে এনে দিল। ফলের রসের জন্য বরফ আনতে অন্দরের দিকে গেল। সে ফিরতে রাজেশ্বরী বলল, 'আমার কিন্তু সত্যিই খুব খিদে পেয়েছে রে, খাচ্ছি কিন্তু সব। গৌতম তুই খাবি না ?'

গৌতম ছুরি দিয়ে মুসাম্বি ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, 'আরে আমি তো একটু আগেই খেলুম !'

ভেঙ্কট বলল, 'ও তো দু হাতে চালাচ্ছে ! বাড়ি থেকে এক দফা খেয়ে আসছে, এখানে আমার মা আহা বাবা কত সেবা করছ, খাও বলে একগাদা খাওয়াচ্ছে। এদিকে আমিও একদম একলা খেতে পারি না। রুগীর ফল সন্দেশ এসবও বেমালুম সাঁটিয়ে যাচ্ছে। কি রকম মোটা হয়ে গেছে দেখছ না ?'

সত্যিই গৌতমের বেশ চকচকে চেহারা হয়েছে। সে বলল, 'বাব্বাঃ, টাইফয়েডের রোগীর ঝামেলা কি কম ! বল রাজেশ্বরী !'

'ঠিক,' রাজেশ্বরী ফলের রসে চুমুক দিতে দিতে বলল।

কিছুক্ষণ পর ভেঙ্কটের মা ও বউদি পরপর এসে রাজেশ্বরীর সঙ্গে আলাপ করে গেলেন। ভেঙ্কট বলল, 'রাজেশ্বরী একটা অনুরোধ করব, রাখবে ?'

'কী ?'

'একটা গান শোনাবে ?'

'এই দুপুরে গান ?'

'প্লিজ।'

রাজেশ্বরীকে কোন কিছুর জন্যেই বেশি সাধ্য-সাধনা করতে হয় না। আধো অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে সে সামান্য একটু সুর ভেঁজে গান ধরে ফেলল, 'পনঘটপে নন্দলালা।'

গৌতম টেবিলের ওপর টুক টুক করে ঠেকা দিচ্ছিল। শেষ হলে বলল, 'সত্যি রাজেশ্বরী, এরকম ফার্স্টক্লাস গাস, কেন যে পলিটিকসে ভিড়লি !' রাজেশ্বর অবাক হয়ে বলল, 'দুটোতে কোনও বিরোধ আছে-বুঝি ? আমি তো ভাবিনি !'

ভেঙ্কট বলল, 'কমিউনিস্টরা তো ভগবান মানে না, ধর্মকে আফিম গাঁজা গুলি বলে, তা তুমি যে এই ভজনটা গাইলে এটা তো ভগবানকে লক্ষ্য করে গাওয়া, এত ভাব-টাব দিয়ে গাইলে কী করে ? ডোন্ট মাইন্ড ! আমি হয়ত বোকার মতো করলুম প্রশ্নটা !'

গৌতম বলল, 'জানিস তো, অসুখটা হয়ে থেকে ভেঙ্কট খুব ভগবান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।'

ভেঙ্কট বললে, 'অন্যায় কিছু করেছি ? মৃত্যুর কাছাকাছি গেলে ভগবানের কথা মনে আসবেই। তুমি যত বড় নাস্তিকই হও।'

'মৃত্যু ? অসুখ করলেই মৃত্যুর কথা ভাবতে হবে না কি ?' রাজেশ্বরী অবাক হয়ে বলল।

গৌতম মৃদুস্বরে বলল, 'ওর একটা সময়ে খুব বাড়াবাড়ি গিয়েছিল রাজেশ্বরী। জ্বর নামছিল না। ম্যানিনজাইটিস হয়ে যায় আর কি ! যাই হোক ফাঁড়াটা কেটে গেছে।'

'আমার কথার জবাব দিলে না !' ভেঙ্কট জিজ্ঞেস করল।

রাজেশ্বরী বলল, 'আমি কি ঠিক কমিউনিস্ট ? এস এফ আইয়ের হয়ে দাঁড়িয়েছি তিন বছর পর পর এই পর্যন্ত। সে-ও তোরাই দাঁড় করালি। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন যা পড়েছি পল সায়েন্সে অনার্স কোর্স পড়তে গিয়ে। পার্টি-মেম্বারও নই। কিছুই না। কেউ আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে নাস্তিক হতে বলেওনি। কিন্তু আমি স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি দিয়েই দেখছি ভগবানে আমি ঠিক বিশ্বাস করি না। যা যুক্তিবুদ্ধির বাইরে, যার কোনও প্রমাণ নেই, কেমন করে তাতে বিশ্বাস করব ?'

'তাহলে ওই সব গান ? গানে ভক্তি আসে কোথা থেকে ?' ভেঙ্কটের মুখটা একটু শুকিয়ে গেছে এখন।

'অ্যাকচুয়ালি যে গানটা গাইলাম— পনঘটপে... ওটাকে কি ঠিক ভগবানের উদ্দেশে গাওয়া বলা যায় ! আমার তো ওটা নির্ভেজাল প্রেমের গান বলেই মনে হচ্ছে। মীরা কৃষ্ণ বলে একজন কল্পনার মানুষকে ভালোবেসেছিলেন, তাঁকে মনে করেই গান বেঁধেছেন। কিন্তু অন্য অনেক ভজন আছে, তাতে সোজাসুজি ঈশ্বর বন্দনা আছে, সে গানও তো আমি গাই। ভালোই লাগে গাইতে। আমি ঠিক এভাবে ভেবে দেখিনি কোনদিন ! সত্যি !'

ভেঙ্কট বলল, 'আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা শুনবে ?'

'বলো না !'

'ঠাট্টা করতে পারবে না কিন্তু !'

'না। ঠাট্টা করব কেন ?'

'আমার তখন খুব বাড়াবাড়ি। হেভি জ্বর। পাঁচ ছাড়িয়ে যাব-যাব। নামতে চাইছে

না। মাথায় ঘাড়ে আইস ব্যাগ নিয়ে মা আর গৌতম সব সময়ে বসে আছে। তখন আ এই গানটা শুনতে পেতুম, ঝিঁঝির ডাকের মতন, তোমার গলায়। বুঁদ হয়ে শুনতুম হঠাৎ একদিন, তখন রাত্তির অনেক। হঠাৎ দেখলুম আলখাল্লা পরা কেউ একজন ঢুক গৌতম চেয়ারে বসে বসে ঘুমোচ্ছে। মা আমার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই লম্বা চু আলখাল্লা পরা মানুষটা... এই দেখো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে... এসে আমার কপালে হা রাখলেন। শীতল হাতটা বরফের মতো নয় কিন্তু। মানুষের ঠাণ্ডা হাতের মতো। স সঙ্গে আমার মাথাটা হালকা হয়ে যেতে লাগল। ঘাম দিতে আরম্ভ করল। ঘুমি পড়লুম। দু দিনের মধ্যে জ্বর একেবারে ছেড়ে গেল। গানটাও আর শুনতে পে না।'

গৌতম হেসে বলল, 'ব্রড স্পেকট্রামের যে অ্যান্টি-বায়োটিকটা তোকে দেও হয়েছিল, লম্বাটে, হাতির দাঁতের রঙের, সবুজ-টুপি-পরা সেই ক্যাপসুলটাই তোর মাথ কাছে দাঁড়িয়েছিল। সেটাকেই দেখেছিস।'

'বললুম যে ঠাট্টা করবি না।' ভেঙ্কট রেগে উঠে বলল।

গৌতম বলল, 'আমাকে তো ঠাট্টা করতে বারণ করিসনি। রাজেশ্বরীকে করেছিস।'

রাজেশ্বরী বলল, 'বেশ, তুই অলৌকিক কিছু দেখেছিস বলে তোর বিশ্বাস। ভে আমার কিন্তু মনে হয় গৌতম যেটা বলল সেটাই কিছুটা সত্যি। সমস্তটাই তো না ব্যাপার।'

ভেঙ্কটের মুখটা একেবারে চুপসে গেল। রাজেশ্বরী তার মুখের দিকে তাকিয়ে ব 'ইস! আমার কথাটা তো ভালো লাগল না। না? যদি সত্যি-সত্যি আমাদের শরীর আর এই জড় পৃথিবীর বাইরে কিছু থাকত, আমরা তাহলে বেঁচে যেতাম, তাই না? সহজ হয়ে যেত জীবনটা। ভেঙ্কট তুই যদি এটা বিশ্বাস করে জোর পাস তাহলে বি কর। কিন্তু যদি তাতে দুর্বল হয়ে যাস, অলৌকিক কিছু ঘটার প্রত্যাশায় অলস হয়ে তাহলে আমি বলব বিশ্বাস করিস না। ওটা ভুল। স্রেফ মাথা গরম হওয়ায় হ্যালুসিনে হয়েছে। ...কিছু মনে করলি? আমি কিন্তু মিথ্যে বলতে পারি না, স্তোক দিতেও প না।'

ভেঙ্কটের ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেছে। গৌতম তাকে ওষুধ খাওয়ালো। সে এ একটা পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। রাজেশ্বরী বলল, 'কী রে, শরীর খা লাগছে না কি?'

'উঁহু, জাস্ট ক্লান্ত লাগছে।'

'ঠিক আছে। তুই রেস্ট কর। আমি এবার চলি।' রাজেশ্বরী তার ব্যাগটা তু নিল। গৌতম দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। রাজেশ্বরী কিছুতেই তাকে বাস রাস্তায় আ দিল না।

বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ রাজেশ্বরীর মনে সকালবেলাকার ঘটনাগুলো তীব্রভাবে ফিরে এলো। সেই মেয়েগুলোর হাসি, মন্তব্য। হঠাৎ সে বুঝতে পারল তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করেনি। আসলে তাকে দেখে ওদের যে স আশা-আকাঙ্ক্ষা সেইগুলোই ওরা প্রকাশ করেছিল। রাজপুত্তুরের মতো বর, টিভির রা মতো 'এতখানিক' ছেলে, কালীমন্দিরে পুজো, মানত। বিবাহ, প্রজনন, সাংসা সুখ-শান্তি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান —এই নিয়েই তো ওদের জগৎ! সারা সকাল প গার্হস্থ্যে খাটুনির পর, দুপুরবেলার অবসরের ফোকরে, রাত প্রহারের নিত্য-নৈমি

আশংকা বুকে নিয়ে ধনীর পিন্ধনের জন্য 'কাঁতা ইস্টিচ'।

রাজেশ্বরী চলে গেলে ভেঙ্কট চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে রইল। ক্লান্তিতে ঘুম আসছে। কেমন একটা ঘোর। তার অভিজ্ঞতার পুরোটা তো সে রাজেশ্বরীকে শোনায়নি। জ্বরের ঘোরে সে রাজেশ্বরীকে একটা উজ্জ্বল কমলা রঙের শাড়ি পরে তার কাছে বসে 'পনঘটপে নন্দলাল' গানটা শোনাতে দেখেছে। ঠিক সেই জিনিসটাই কী করে ঘটল ! রাজেশ্বরী ঠিক সেই স্বপ্নের মতো, তার সামনে বসে ওই গানটাই গাইল, উজ্জ্বল কমলা না হলেও, ওই জাতীয় একটা রঙই ছিল রাজেশ্বরীর শাড়িতে। মাথার মধ্যে অদূর ভবিষ্যতের একটা ছবি সে দেখতে পেল কেমন করে ? আর, আলখাল্লা-পরা, লম্বা চুল মানুষটি ? ভেঙ্কটের স্থির ধারণা সে যিশুখ্রীষ্টকে দেখেছিল। এ সব কিসের ইঙ্গিত ? দুর্বল মাথায় সেই চিন্তা করতে করতেই ভর বিকেলে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

২৩

শূন্যে ভাসে—একলা।

বেরোল তো বেরোল ঠিক পুজোর আগেটায় রেজাল্ট বেরোল। শরতের কাশফুল তখন সারা আকাশময়। যদিও রোদের তেজ বিন্দুমাত্র কমেনি। 'গৌতম ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে', কে যেন চেঁচিয়ে বলল। পল সায়েন্সে একমাত্র গৌতম। তন্ময়ের এগারো নম্বর কম। ইস্‌স্‌ ! অণুকা ভালোই করেছে, যদিও যা বাজার তাতে এম-এ'র সিট পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। উজ্জয়িনী মিঠু দুজনেই ভালো সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে, কিন্তু ওদের আশানুরূপ হয়নি রেজাল্ট, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ইমন আর বিষ্ণুপ্রিয়া টায়েটায়ে অনার্স। ভেঙ্কট আর ঋতু পায়নি।

বাইরে বেরিয়ে ভেঙ্কট বলল, 'চল, আজই চল আমার বাড়ি সেলিব্রেট করব।' ইমন ঋতু আর বিষ্ণুপ্রিয়া আসেইনি। গৌতম বলল, 'ধ্যাৎ, কী যে বলিস, সেলিব্রেট করবার আছেটা কী !'

ভেঙ্কট বলল, 'বলিস কি রে ? তুই ফাস্টো কেলাস পেলি, আমরা সেলিব্রেট করব না ? আমার কথা ভেবে মন খারাপ করিসনি। আরে আমি কি পড়াশোনার লাইনের লোক, যে পাশ করব ? গ্র্যাজুয়েট নয়, একথা তো আর কেউ বলতে পারবে না।'

কিন্তু ভেঙ্কট আর ঋতুর জন্য সবারই মন খারাপ। কেউ রাজি হতে চায় না। 'রাজেশ্বরী প্লিজ এদের বোঝাও।' ভেঙ্কট রাজেশ্বরীকেই ধরল। তন্ময় চুপিচুপি পেছন দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল, ভেঙ্কট তাকে ক্যাঁক করে ধরল। তার রকম-সকম দেখে শেষ পর্যন্ত তন্ময় হেসে ফেলল।

'হেসেছে, হেসেছে', ভেঙ্কট হাততালি দিয়ে উঠল। মিঠু আস্তে আস্তে তন্ময়ের একপাশে গিয়ে দাঁড়াল, অন্য পাশে উজ্জয়িনী এসে দাঁড়াচ্ছে। ওদের মন খারাপ তন্ময়ের জন্যেও। তন্ময় জানে। বুঝতে পারছে। হঠাৎ তার মনে হল, এই ঘটনাটা জীবনে আর কখনও ঘটবে না। সে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি বলে তার দুজন বন্ধু মলিন এবং উৎকণ্ঠিত মুখে দু পাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরে আছে, মা বাবা ভাই বোন নয়। বন্ধু। বান্ধবী। এই উৎকণ্ঠার ভীষণ দাম। সে চশমার মধ্যে থেকে গাঢ় চোখে সবার দিকে চাইল, বলল,

'পালাচ্ছি না, মায়ের কলেজে একটা ফোন... ।'

'সকলকেই তো ফোন করতে হবে, আমার বাড়ি গিয়ে করিস', ভেঙ্কট বিধান দিল। তারপর গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই ওদের নিয়ে এগিয়ে যা। এই নে আমার ঘরের চাবি। আমি একটু পরে আসছি।' সে ঝড়ের বেগে চলে গেল।

গৌতমের সঙ্গে ট্রামে চড়ে ওরা উত্তর অভিমুখে চলল। মিঠু গৌতমের পাশে বসেছিল। বলল, 'দুপুরের কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটটা কী সুন্দর! ঠিক যেন একটু সরু, আর একটু পুরনো রাসবিহারী, পুরনো বলেই কেমন ইতিহাস-ইতিহাস গন্ধ। দেখ গৌতম, এই রাস্তা দিয়ে সুভাষ বোস পড়তে এসেছেন স্কটিশ চার্চে। হেঁটে গেছেন নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে কতবার মাড়াতে হয়েছে এই রাস্তা। ব্রাহ্মসমাজের বাড়িটা দেখ!

গৌতম বলল, 'সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারও অনেক দিনের দোকান। আমাদের স্কটিশ চার্চ স্কুল কত পুরনো। এই কলকাতায় সুকুমার সেন থাকতেন, সত্যেন বোস থাকতেন, সুধীন দত্তর আদি বাড়ি এই দিকে। কতজনের নাম করব। কত ভালো ভালো ছেলে বেরিয়েছে এখানকার স্কুল-কলেজ থেকে।

'তুইও একটা ভালো ছেলে বেরোলি', মিঠু বলল।

'ধুস', গৌতম লজ্জা পেয়ে বলে উঠল, 'ফ্লুক, আমারটা। পাওয়া উচিত ছিল তন্ময়ের।'

উজ্জয়িনী সামনের সিটে ছিল, পেছন ফিরে বলল, 'কী ফ্লুক রে?'

মিঠু বলল, 'ও বলছে ওর ফার্স্ট ক্লাস পাওয়াটা ফ্লুক, তন্ময়েরই পাওয়া উচিত ছিল।'

'কেন?' তন্ময় আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি পার্ট ওয়ানে ফিফটিএইট পার্সেন্ট রেখেছিলে মেকাপ করেও তোমার সাত নম্বর বেশি আছে। গৌতম, তোমার তো খুব ব্যালান্সড রেজাল্ট। আমার কথা বাদ দাও।'

'তোর কথা কী হিসেবে বাদ দেব?' মিঠু পিছন ফিরে বলল, 'তোর তো একশবার পাওয়া উচিত ছিল।'

'দূর আমার শেষের দিকে ইনট্রেস্ট লাগছিল না। এখন মনে হচ্ছে পল সায়েন্স না নিলেই হত।'

'তবে কী নিতিস?'

'বাংলা।'

'বাংলা? নিয়ে কী করতিস?' অণুকা বলল।

রাজেশ্বরী বলল, 'বাংলা সাহিত্য পড় না, অসুবিধে তো কিছু নেই! চেষ্টা করলে ওটা আমরা নিজেরাও পড়ে নিতে পারি, নয়?'

'অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার একটা আলাদা দাম আছে', তন্ময় বলল।

'তা অবশ্য।'

ভেঙ্কটের বসবার ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিতেই একদিকে ম্যাডোনার, আরেক দিকে অমিতাভ বচ্চনের পোস্টার দেখে উজ্জয়িনী বলল, 'যার পোস্টার থাকা উচিত ছিল, তার কিন্তু নেই।'

'কার?' মিঠু বলল।

'কার আবার? চার্লি চ্যাপলিনের? পড়ে যেতে-যেতে সামলে যাবার একটা কায়দা দেখায় ভেঙ্কট, মনে পড়ছে?'

'প্রত্যেকটা ফার্নিচার কিন্তু অ্যান্টিক দেখেছিস উজ্জয়িনী', মিঠু অবাক হয়ে দেখতে দেখতে বলছিল।

গৌতম বলল, 'বোধ হয় ওর ঠাকুর্দাদেরও বাবার আমলের জিনিস। সব গুদাম হয়ে পড়েছিল। ঘেঁটু এসব সরিয়ে, পালিশ করিয়ে এমন করেছে।' উঁচু সিলিংটার দিকে তাকিয়ে অণুকা বলল, 'দেখ, এত উঁচু ঘরে থাকে বলেই বোধ হয় ভেঙ্কটের মনটা ওরকম উদার। এনভায়রনমেন্টের একটা প্রভাব আছে তো মানুষের ওপর।'

রাজেশ্বরী বলল, 'তাহলে সেকালের সব রাজা-জমিদাররা সবাই উদার হতেন, সবাই কি তাই?'

মিঠু বলল, 'তবু বোধ হয় মানুষগুলো বড় মাপের ছিল, বল তন্ময়!'

তন্ময় বলল, 'কী জানি!'

'তুই মানছিস না?'

তন্ময় বলল, 'একটু বেশি সরলীকরণ হয়ে গেল না? উঁচু ঘর, উঁচু মন। অতটা সহজ বোধ হয় নয়।'

গৌতম মিক্সিতে লস্যি করছিল। ভ্যানিলা সিরাপ দিয়ে, বরফের কুচি সমেত সে পরিবশেন করল সবাইকে।

'ঠিক যেন রেস্তোরাঁ দেখ,' মিঠু খুশির হাসি হেসে বলল, 'নেক্সট আইটেম কী?'

গৌতম তখন দেয়াল আলমারি খুলে দেখাল তার মধ্যে ভেঙ্কটের কত কি গোছানো আছে। দেখেশুনে উজ্জয়িনী বলল, 'ভেঙ্কটটা তো একটা রীতিমতো গিন্নি দেখছি।'

'গিন্নি গিন্নি ঘেঁটু-গিন্নি ভালো নাম বার করা গেছে', অণুকা হাততালি দিয়ে চেঁচাল। তারপরেই জিভ কাটল, 'ইস কেউ শুনতে পেলে কী মনে করবে?'

'কেউ শুনতে পাবে না', গৌতম হেসে বলল, 'কুড়ি ইঞ্চি গাঁথানির দেয়াল ভাই। এ দিকটাতে ওর এক দাদু ছাড়া কেউ থাকেন না। তিনিও আবার কানে খাটো। ঘেঁটুর এটা স্যাংকচুয়ারি।'

'তুইও কিন্তু কম গিন্নি নয়', মিঠু মন্তব্য করল, 'লস্যিটা দারুণ বানিয়েছিস।'

'ঘেঁটুর সঙ্গে থেকে থেকে শিখতে হয়েছে সব', গৌতম স্মিতমুখে বলল। রাজেশ্বরীর মনে পড়ে গেল, সে বলল, 'তোরা জানিস ভেঙ্কটের এবার সাঙ্ঘাতিক বিশ্রী টাইপের টাইফয়েড হয়েছিল, গৌতম ওকে দিবারাত্র সেবা করেছে।'

গৌতম লজ্জা পেয়ে বলল, 'ধুস্। কী যে বলিস!'

হঠাৎ মিঠু তার শরবতের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে এসে বলল, 'দেখ রাজ, গৌতমের, ভেঙ্কটের, তোরও কতগুলো দিক। তোরা কেউ জীবনটাকে একটা সরলরেখা করে ফেলিসনি। কিউবের মতো তোদের জীবন, কতগুলো পিঠ! এটা আমাকে, কী বলব ম্রিয়মান... না-না মুহ্যমান করে দেয়।' মিঠুর চোখ একটু চকচক করছে। কেন না তার ইদানীং প্রায়ই মনে হচ্ছে জীবন যেন বন্ধ দরজা, সে বাইরে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত সেই দরজা খোলবার চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু তার কব্জিতে যথেষ্ট জোর নেই।

রাজেশ্বরী বলল, 'মিঠু আমি মোটেই মানতে পারছি না যে তুই, তোরা মালটি-ডাইমেনশ্যন্যাল নয়। কিন্তু তুই একটা খুব সত্যি কথা বললি এই উপলক্ষ্যে। এই যে জন্মালুম, প্রকৃতির নিয়মে বড় হলাম, গতানুগতিকভাবে স্কুল, কলেজ, খেলাধুলো করে ঠিক আর পাঁচজনের মতো চাকরি, বিয়ে, সংসার তারপর মৃত্যু, এই সরলরেখার জীবন, এটা কিন্তু আমাকে আনন্দ দিতে পারে না। তোদের কথা জানি না। আমার, ব্যাপারটা

ভীষণই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, তাই দেখ খুঁজে বেড়াই, খুঁজে বেড়াই, অনেক সময়ে খ্যাপার মতন... ।'

'তুই কি সেজন্যেই পলিটিক্স করিস ?' উজ্জয়িনী জিজ্ঞেস করল। এই মুহূর্তে তার মনে পড়ে যাচ্ছিল তার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের ভারী পর্দাটা টুক করে যখন সরে গিয়েছিল একটু, তখন সে কী ভয়ানক শূন্যতা দেখেছিল তার পেছনে।'

'রাজনীতি ঠিক করি না', রাজেশ্বরী বলছিল, পাকে-চক্রে কিভাবে জড়িয়ে গেলাম, তুইই তো তার সাক্ষী আছিস। কিন্তু রাজনীতির সুবাদে অনেক রকম মানুষের সংস্পর্শে আসি. এটা আমাকে খুব...কী বলব জীবন্ত করে তোলে।'

'তুই কি গানটা ছেড়ে দিচ্ছিস ?' গৌতম ধীরে বলল।

'না তো। তবে আজকাল একটু কম রেওয়াজ করি।'

'আমার কথা যদি শুনিস রাজেশ্বরী। আমি অবশ্য সামান্য মানুষ, গানটা ছাড়িস না। আমি তবলা বাজাতুম, ভালোই শিখেছিলুম, বন্ধ হয়ে যাবার পর আমার ভেতরে খানিকটা জায়গা কি রকম অসাড় হয়ে গেছে, সত্যি বলছি।'

'তুই তো খুব ভালো বাজাস, উজ্জয়িনীদের বাড়ি শুনেছিলাম,' মিঠু বলল, 'ছাড়লি কেন ?'

গৌতম বলল, 'মিঠু আমাদের মতো ছেলেরা যে কেন কিছু ধরে, আর কেন কিছু ছাড়ে তোরা ঠিক বুঝতে পারবি না। ডোন্ট মাইন্ড। প্র্যাকটিস করব তার জায়গা কই ? যেখানে বাবা খাতা দেখছেন, সেখানেই দিদি পড়ছে, মা বারবার আসছে যাচ্ছে, ছোট ভাইপোটা দুমদাম বন্দুক ফাটাচ্ছে। সকালে বাজার করে এলুম, একটু পরেই মা বলবে 'এইয্যা একশ গ্রাম পোস্ত আনতে বলতে ভুলে গেছি, যা না রে একটু !' বউদি বলবে 'বেরোচ্ছই যখন লাইব্রেরির বই দুটো ফেরত দিয়ে দিও প্লিজ। কী আনবে এই যে লিখে দিয়েছি।' এই চলল, যতক্ষণ বাড়ি থাকব। দেখ, তোরা মেয়েরা অনেক কাজ করিস তোরা অবশ্য করিস কি না জানি না, কিন্তু আমাদের মতো ছেলেরাও অজস্র কাজ করে নিছক ফরমাশ। বলব—আনঅরগ্যানাইজড় লেবার। তার মধ্যে কোনও স্যাটিসফ্যাকশন নেই।' গৌতম চুপ করতে সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর মিঠু বলল 'সত্যি তোকে অভিনন্দন জানাচ্ছি রে গৌতম। সিনসিয়ারলি বলছি। তুই এতসবের মধ্যে ভেঙ্কটের সেবা করেছিস দিনরাত্তির। তা সত্ত্বেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিস। সত্যি তুই একটা... ।'

গৌতম খুব জোরে বলে উঠল, 'ধুস্।' তারপর বলল, 'শোন বাড়িতে খবরটা দেওয়া দরকার। তোরা আড্ডা জমা। আমি চট করে ঘুরে আসছি।'

গৌতম আর দাঁড়াল না। ধাঁ করে বেরিয়ে গেল।

তন্ময় হঠাৎ শিরদাঁড়া সোজা করে বসল, বলল, 'তোমরা একটা কবিতা শুনবে ?'

উজ্জয়িনী বলল, 'শিওর। তুই তো ভীষণ ভালো আবৃত্তি করিস।'

তন্ময় বলল 'এটা একটা তাৎক্ষণিক কবিতা।' তার পরে গলা অন্যরকম করে বলে উঠল—

চড়ুই তিতির খুঁটে খুঁটে বাঁচে,
শালিখ নাচে উঠোনে, কার্নিশে।
ঘুঘুর মন-খারাপ ছড়িয়ে যায়
ঈশান থেকে নৈঋত

দুপুর বিকেল সন্ধে।

টিয়ারা ঝাঁক বাঁধে।
বক মালা গাঁথে।
চিল ছোঁ মারে হাড় কাঁপানো হ্রেষা রবে মাত্র একবার।
সূর্যের কাছাকাছি উড়ে যায়।
শূন্যে ভাসে।
সারাবেলা
একলা ॥

রাজেশ্বরী বলল, 'কবিতাটা বুঝতে পারলুম বলে ভালো লাগছে। আমি তোর আবৃত্তির রন দেখেই বুঝতে পারতাম তুই লিখিস।'

একটু আগে নিচে একটা ট্যাক্সির মিটার নামানোর টিং টিং শব্দ হয়েছিল, কেউ অত খয়াল করেনি। এখন ঝড়ের মতো হাতে একগাদা প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢুকল ভেঙ্কট। ার পেছনে আরও প্যাকেট হাতে কিমাশ্চর্যম! ইমন! ইমনের পরনে টেনিস স্কার্ট। াকে এখন ষোল আনা খেলোয়াড় লাগছে।

দু তিনজন আগে পরে বলে উঠল, 'কী ব্যাপারে? এসব কী? ইমন কোত্থেকে?'

ইমন বলল, 'তোমরা সকলে আমার কথা ভুলে গিয়েছিলে, ভেঙ্কট মনে রেখেছে, আমি তা জাস্ট কিছুক্ষণ আগে পৌঁছেছি, কাল জামসেদপুরে টুর্নামেন্ট ছিল। রেজাল্ট দেখে সাজা বাড়ি ফিরে যেতুম, ভেঙ্কট কলেজের গেট থেকে ধরে এনেছে।'

ভেঙ্কট বলল, 'গৌতম কোথায় গেল? আচ্ছা তো! তোরা আমাকে বাদ দিয়েই ্যারাইটি প্রোগ্রাম আরম্ভ করে দিয়েছিস?'

মিঠু বলল, 'গৌতম এখুনি এসে পড়বে, বাড়িতে খবর দিতে গেছে, আমাদের সবাইকে াস্যি খাওয়ালো।'

'আর আমরা? আমরা খাব না?' ভেঙ্কট সবার দিকে তাকিয়ে বলল।

উজ্জয়িনী আর রাজেশ্বরী একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল, 'দাঁড়া, করে দিচ্ছি।'

'বাঃ তোরা কি করে জানবি, কোথায় কি আছে? দাঁড়া', ভেঙ্কট বেরিয়ে গেল। একটু ারে ঠাণ্ডা এক ভাঁড় দই এনে টেবিলে রেখে বলল, 'কর, কে করবি!' তার মুখ উজ্জ্বল। নজের ঘরেই যেন সে আজ বিশেষ অতিথি।

গৌতম এসে পড়েছে। ভেঙ্কট প্যাকেটগুলো খুলছে একের পর এক, খাবারের গন্ধ ড়িয়ে যাচ্ছে ঘরময়।

মিঠু বলল, 'তুই করেছিস কি ঘেঁটু? এই অ্যাতো? আমরা তোকে হেলপ করব তো!'

'অফ কোর্স, ভেঙ্কটেশ পাল আর নড়ছে না' ভেঙ্কট নিজের চেয়ারে বসে মৃদুমৃদু পা াচাতে নাচাতে বলল।

'তোর নতুন নাম কী হয়েছে জানিস তো? গিন্নি', অণুকা বলল।

ভেঙ্কট বলল, 'অরিজিন্যাল কিছু হল না যে!'

'আমরা অরিজিন্যাল নই, ছোটখাটো, বড় কিছু না, ধর তিতির, চড়ুই, শালিখ এইসব, না র তন্ময়?' খাবার সাজাতে সাজাতে উজ্জয়িনী বলল।

তন্ময় বলল, 'কে জানে, কে যে কী অত সহজে, এত তাড়াতাড়ি কি আর বোঝা যায়!'

ভেঙ্কট বলল, 'ইমনের একটা ভালো খবর আছে। ইমন বল্।'

ইমন হাসি মুখে বলল, 'আমি একটা খুব ভালো চাকরি পেয়েছি বম্বেতে। পাবলিক রিলেশনস্-এর। সাড়ে চার হাজার মাইনে, প্লাস পার্কস। কোয়ার্টার্স পাবো।'

'উরিবাস সাবাশ্।' অণুকা বলল।

'কংগ্র্যাট্‌স্'। অনেকেই হাত বাড়িয়ে দিল। মিঠু খালি ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, 'তুই তা হলে বম্বে চলে যাবি? আর পড়বি না?'

ইমন বলল, 'যা মার্কস এসেছে তাতে কোনও য়ুনিভার্সিটি আমাকে এনট্রি দেবে মিঠু? তা ছাড়া পড়ে আর কী হবে? এবার মন দিয়ে চাকরি করতে হবে, খেলতে হবে। পড়াশোনার আর সময় পাব না।'

মিঠু বলল, 'মাসিমাকে, কল্যাণকে নিয়ে যাবি তো?'

'নিশ্চয়ই! সেটাই তো আসল কথা। একসঙ্গে থাকতে পারব আমরা। কল্যাণ খুব ভালো চিকিৎসার সুযোগ পাবে। ভেঙ্কটের কাছে ঠিকানা পাঠিয়ে দেব। তোমরা যাবে আমার কাছে। যখন ইচ্ছে।'

মিঠু বিষণ্ণ মুখে বলল, 'যাঃ। এবার খেলা ভাঙার খেলা। কে কোথায় ছিটকে যাব এখন খুব দুঃখ হচ্ছে ভেবে আগে কেন তোদের সঙ্গে আরও আরও বেশি করে মিশিনি মনে আছে সেই প্রথম দিন ভেঙ্কট বলেছিল, "খবর্দার গ্রুপ করে থাকতে পারবে না..."

ভেঙ্কট চকোলেট ক্রিম ভরা পেস্ট্রি মিঠুর মুখের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'শর্মা যা বলে ঠিক বলে বাবা, হাজার হোক প্রেসিডেন্ট তো!'

গৌতম বলল, 'সত্যিই, আমাদের লাস্ট চ্যাপ্টারটা হেভি জমলো।'

'তোদের এখনও অনেক চ্যাপ্টার বাকি রে গৌতম, লাস্ট চ্যাপ্টার হল আমার ছাত্র-জীবন হয়ে গেল। সমা-প্তি।'

মিঠু বলল, 'মন খারাপ করে দিচ্ছিস কেন রে ঘেঁটু!'

'নো, নো, নো। মন খারাপ-টারাপ নয়। আমি কিন্তু খুব শিগগিরই জীবনযুদ্ধে নেমে পড়ছি। দমদমের দিকে একটা ফাসক্লাস মাল্টি-স্টোরিড করছি, প্রোমোটার, বুঝলি প্রোমোটার। ওই যে ইমন বলল আর পড়ে কী হবে? লাখ কথার এক কথা জীবনযুদ্ধকে বেশিদিন ঠেকিয়ে রেখে লাভ কী! বল! তোরা ভুলে যাবি ভেঙ্কটেশ পা- বলে একজন কেউ ছিল—এটাই!'

গৌতম বলল, 'হেভি সেন্টু দিচ্ছিস। এই, তোরা কেউ ভেঙ্কট দা গ্রেটকে ভুলে যাবি!' সবাই হাসতে হাসতে বলল, 'ওরে বাবা। সম্ভব সেটা!'

ভেঙ্কট দু হাত তুলে ওদের আশীর্বাদ করল, 'ফ্রেন্ডস মে কাম, অ্যান্ড ফ্রেন্ডস মে গো বাট ভেঙ্কট উইল বী দেয়ার ফর এভার। যাক তোদের কার কী প্ল্যান এখন বল তন্ময়!'

তন্ময় হঠাৎ বলল, 'মিঠু, পার্থপ্রতিম তো তোদের রিলেটিভ। ওঁর ঠিকানাটা আমা- দিতে পারিস?'

মিঠুর মুখটা মুহূর্তে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সে মৃদু স্বরে বলল, 'কেন?'

তন্ময় সোজাসুজি এ কথার জবাব না দিয়ে অন্যদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোরা কে- পার্থপ্রতিমের "কল্লোলিনী উনিশশ" দেখেছিস?'

উজ্জয়িনী বলল, 'খুব নাম করেছে। মিঠু কাদম্বিনীর রোল-এ ছিল। শেষ পর্য- করলি না কেন রে?'

'মিঠু যেগুলোতে করেছিল কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের সেই প্রথম শো সেটাই আমি দেখে-

মিঠু কংগ্র্যাচুলেশন্‌স্ !' তন্ময় হাত বাড়িয়ে মিঠুর হাত ধরতে গেল। মিঠু লাজুক, নিবে যাওয়া স্বরে বলল, 'থাচ্ছি যে !'

তন্ময় বলল, 'তোরা দেখলে বুঝতিস কী অসাধারণ করেছে মিঠু। ঋতুও করেছে। কিন্তু ঋতুর বেশির ভাগটাই নাচ, মিঠুকে অনেক এক্সপ্রেশন দিতে হয়েছে। গাইতে হয়েছে। মঞ্চে গান গাওয়া খুব ইজি ব্যাপার নয়। ডাকসাইটে সব শিল্পীদের সঙ্গে করে গেছে, কোথাও বোঝা যায়নি। মিঠু কিছুক্ষণ আগেই বলছিল না তোদের কত দিক আছে, মিঠু নিজেই তো একটা স্পেকট্রাম !'

মিঠু বলল, 'ভালো হবে না বলছি তন্ময় আমার লেগ পুল করলে।'

তন্ময় বলল, 'সে যাই হোক। আমার আজকাল মনে হয় পার্থপ্রতিমের কাছ থেকে কিছু শিখে নিতে না পারলে আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ঠিকানাটা দিস।'

ওই একই ঠিকানা খুঁজতে ঋতুও মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। নাটক চলল একাদিক্রমে দু মাস। প্রতি শনি রবিবার, প্রথমে অ্যাকাডেমিতে, পরে রবীন্দ্রসদনে। ওরা সবাই জানত, কলকাতার পালা শেষ করে এবার যেতে হবে টাউনে। সম্ভব হলে গ্রামে। গ্রামে গিয়ে পার্থপ্রতিম নাটকটার ফর্ম বদলে দেবেন। অনেকটা যাত্রার মতো হবে সেটা, এটাও সে কানাঘুষোয় শুনছিল। এই সময়টায় পার্থপ্রতিম যেন স্বেচ্ছাচারী সম্রাট। কোথাও সামান্য বিচ্যুতি হলে তিনি বাঘের মতো গর্জন করে ওঠেন। কাদম্বিনীর ভূমিকায় একটি অভিজ্ঞ মেয়ে এসেছে। কিন্তু তার কাজ তাঁর আদৌ পছন্দ হয়নি। সেই আক্ষেপ অন্য উপলক্ষ্য করে বেরিয়ে আসছে। শহরের শেষ শোগুলোতে লোক উপছে পড়ছে। যত আনন্দ, তত টেনশন। ঋতু প্রতিদিন বাড়ি ফেরে যেন মদ খেয়ে টলতে টলতে। যত গর্ব, তত আনন্দ, তত ক্লান্তি। কিন্তু পার্থপ্রতিমের দেখা মেলে না শোয়ের পর। অতএব, শেষ শো হয়ে গেলে সে আশা করল এবার পার্থপ্রতিম আবার স্ব-মেজাজে ফিরে আসবেন। দুদিন সে অপেক্ষা করল। পার্থপ্রতিম ফোন করুন। পরের প্রোগ্রাম জানান। কিন্তু ফোন বাজল না। ঋতু অগত্যা গলফ গ্রীনে গেল। গলফ গ্রীনের এই ফ্ল্যাট পার্থপ্রতিমের কোন আমেরিকা না কানাডাপ্রবাসী বন্ধুর। কলকাতায় এলে এখানেই থাকেন তিনি। দোতলায় উঠে সে সবিস্ময়ে দেখল তালাবন্ধ। সকাল আটটার সময়ে ঘর ছেড়ে বেরোবার লোক নন পার্থপ্রতিম। বিশেষত এই কমাস ওইরকম ভূতের খাটুনির পর। কাউকে জিজ্ঞেস করতে তার সম্মানে বাধছে। অবশেষে, সে আলোক সম্পাতের মৃগেনদার কাছে গেল। মৃগেনদা বললেন, 'পার্থপ্রতিম ? সে কোথায় এখন কে বলবে ? পার্মানেন্ড অ্যাড্রেস তো দিল্লি—কমলানগর। কিন্তু সেখানে কি এখন ও যাবে ? এখন ও কোথাও কোনও গর্তে লুকিয়ে বসে আছে। গুহায় আদি মানবের মতো। এক একটা কাজ শেষ হলে ও ওইরকমই করে।' মৃগেনদার কাছ থেকে দিল্লির ঠিকানাটা জোগাড় করে একটা দুঃসাহসিক কাজ করল ঋতু।

দিল্লিগামী ভেস্টিবিউলের টিকিট কাটল। বাবা-মাকে বলল, 'কদিনের জন্যে উজ্জয়িনীদের বাড়ি থাকতে যাচ্ছি।'

তার খামখেয়ালিপনায় এখন তার বাবা মা অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। উপরন্তু তার মেজাজকে তাঁরা যমের মতো ভয় করেন। সম্প্রতি আবার নাটকে তার খুব নাম হয়েছে। অর্থাৎ সে খানিকটা তাঁদের গর্বেরও পাত্র। ঋতু যেন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকিয়ে বলতে চায়, 'ওকে, সি হোয়াট আই ক্যান ডু।' আজ উজ্জয়িনীর বাড়ি যাবার কথা শুনে মীনাক্ষী, বললেন, 'উজ্জয়িনীর বাড়ি আবার থাকতে যাবার কী আছে ?

এত কাছে ! ঘুরে এলেই পারিস। রাতে বাড়ি না থাকলে বড্ড খালি খালি লাগে।'

ঋতু বলল, 'মেয়ে রাতে বাড়ি না ফিরলে দুর্নামের ভয়, না কি ?'

অজিত দাশ বেকার মতো বলে ফেললেন, 'সেটাও একটা কথা বই কি ? কত রাত বাড়ি ফিরিস না বল তো, খালি মিঠু-মিঠু। এখন আবার উজ্জয়িনী ধরেছিস ! কই ওরা তো তোর বাড়ি থাকতে আসে না !'

'তবেই বোঝ কি রকম একটা গুমোট আবহাওয়া করে রেখেছ ! কারোর ভালো লাগে না।'

'গুমোট আবহাওয়া ! কারুর ভালো লাগে না !' দাশ সাহেব আর তাঁর স্ত্রী মর্মান্তিক আহত হলেন।

'এনি ওয়ে, মিডল-ক্লাস মেন্টালিটি দিয়ে আমার বিচার করবে না। আই ডোন্ট বিলঙ হিয়ার !'

'ঋতু !' চাপা আর্তনাদ করলেন মীনাক্ষী।

'বাবা আমাকে শ পাঁচেক টাকা দিতে পারবে ?'

'শ পাঁচেক ? হঠাৎ ? কী করবি ?'

'কৈফিয়ত দিতে পারব না, দিতে হলে দাও।' আসলে ঋতুর হাতখরচ, উপহার ইত্যাদি বাবদ ব্যাঙ্কে যা জমেছে তা সব মিলিয়ে বারো তেরো হাজার হবে। সম্প্রতি নাটকের সুবাদেও কিছু পেয়েছে। কিন্তু কত দিন দিল্লি থাকতে হবে, পার্থপ্রতিমকে সেখানে না পেলে, অন্য কোথাও যেতে হবে কি না এগুলো তো তার জানা নেই। তাই যতদূর সম্ভব তৈরি হয়েই যেতে চায়। পাঁচশটা কোনও টাকাই নয়। পাঁচ হাজারের জায়গায় পাঁচশ বলেছে সে। সেটা বলে ফেললে বাবা-মার মনে কৌতূহল জেগে উঠতে পারে ! তাইই কমিয়ে বলেছে।

ভেস্টিবিউল পৌঁছল দুপুরে। একটা ট্যাক্সির শরণাপন্ন হল ঋতু। ঠিকানাটা ড্রাইভারকে দিয়ে জিজ্ঞেস করল পৌঁছে দিতে পারবে কি না। মাথায় পাগড়ি শিখ ড্রাইভার কলকাতার রাস্তায় স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধির মতো, তাই সে নিশ্চিন্তে হেলান দিয়ে বসল। মাঝে মাঝে চোখ খুলে ভালো করে রাস্তা দেখে। আবার চোখ বুজিয়ে ফেলে। হঠাৎ তার খেয়াল হল একই রাস্তা সে যেন দুবার দেখল, একই ধরনের দোকান পাটের বিন্যাস, এবং ঘড়িতে একঘণ্টা পার হয়ে গেছে। যে জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছে, তার নাম কালকাজী। ঋতু বুঝতে পারল সে বিপদে পড়েছে, সে তড়িঘড়ি বলল, 'থোড়া রুখিয়ে তো জী, উও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হ্যায় না, উধার।' সর্দারজী ট্যাক্সি থামাতে সে চটপট করে তার ওভারনাইট ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়ল। মিটার দেড়শ ছাড়িয়ে গেছে। সে খুব খানিকটা চোটপাট করে টাকাটি মিটিয়ে দিয়ে দোকানে ঢুকল। কাচের পাল্লার ওদিকে ক্যাশ কাউন্টারে এক বিশালাকৃতি পাঞ্জাবি মহিলা তার লক্ষ্য। ঋতু আগে বাবার সঙ্গে একবার দিল্লি এসেছে। কিন্তু সে ছিল ঝটিকা-ভ্রমণ। দিল্লি-রাজস্থান। সে বুঝতে পারল ওভাবে বেড়াতে এসে দিল্লির মত এত বড় শহর চেনার কোনও আশাই নেই। নেহাৎ দিনের বেলা তাই। মহিলাটির কাছে গিয়ে ঠিকানাটা দিয়ে সে সাহায্য প্রার্থনা করল। ট্যাক্সি-বিপর্যয়ের কথাটাও ইতস্তত করে বলেই ফেলল।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ইয়ে তো পুরানী দিল্লি হ্যায়। ট্যাক্সি ছাড়া যেতে মুশকিল। উও লোগ বহুত বদমাশ আছে। অনজান প্যাসেঞ্জার মিলনে সে অ্যায়সা হী করতে হ্যায়। আচ্ছা এক কাম করো। এখানে বসে যাও, খাও, আরাম করো। আমার হাজব্যান্ড

কাউন্টারে আসলে, আমি খুদ তোমাকে নিয়ে যাব।'

অভাবনীয় এই সাহায্যে ঋতু তৎক্ষণাৎ রাজি। কিছুক্ষণ পর মহিলা আড় চোখে চেয়ে বললেন, 'ঘর সে ভাগনেওয়ালী তো নহী !'

ঋতু কাউন্টারে মাথা রেখে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, বলল, 'হোয়াট ননসেন্স।'

'তো অকেলী কিঁউ ? কিস্‌কা পতা লগানে আয়ী হো বাবা, বয় ফ্রেন্ড ?' মহিলা কৌতূহলী, কূট চোখে চাইলেন।

'মে বি।' ঋতু সংক্ষেপে বলল।

আর একটু পরে ভদ্রমহিলা, অর্থাৎ মিসেস অরোরার নির্দেশে দুটো থালী এলো। খাওয়া-দাওয়া করে ঋতু টাকা বার করে মিটিয়ে দিল দামটা। মিসেস অরোরা তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে টাকাটা নিলেন। ভেতরের দিকে একটা রেস্টরুম ছিল সেখানে একটা পরিষ্কার ডিভান পেয়ে ঋতু খুব খানিকটা ঘুমিয়ে নিল। উত্তেজনায়, এবং সারা রাস্তা বসে বসে তার ঘুম হয়নি গতরাতে।

মিসেস অরোরা যখন তাকে ডাকলেন, ঋতু দেখল বিকেল ছটার কাছাকাছি। কাউন্টারে পাকা দাড়িঅলা হাজব্যান্ডকে কিছু বলে মিসেস অরোরা ঋতুকে নিয়ে একটা নীল মারুতি-ভ্যানে উঠলেন। ঋতু তার উড়ন্ত চুল ঠিক করতে করতে বলল, 'ট্যাক্সি-ফেয়ারের হিসেবে তুমি টাকাটা নিয়ে নেবে কিন্তু। ইউ মাস্ট।' মিসেস অরোরা স্টিয়ারিং-এ চোখ রেখে বললেন, 'অফ কোর্স।' গীয়ার বদলালেন তিনি।

এইভাবে মিসেস অরোরার সহায়তায় সে যখন কমলানগরের বাড়িটায় এসে পৌঁছল তখন সাতটার কাছাকাছি। যদিও চারদিকে ফটফট করছে আলো। বাড়িটা উত্তর কলকাতার পুরনো বাড়ির মতো। সদর দরজায় সবুজ-হলুদ চৌখুপী-চৌখুপী নকশা। মিসেস অরোরাকে ধন্যবাদ এবং পঞ্চাশ টাকার একটা নোট দিয়ে ঋতু দরজাটার সামনে এসে দেখল, কোনও বেল নেই। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। সামনে দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে। আধো-অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে সে একটা বন্ধ দরজার গায়ে পেতলের ফলকে পার্থপ্রতিমের নাম জ্বলজ্বল করছে দেখতে পেল।

সে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে তার বুক দুরদুর করছে, হাত ঘামছে। কে জানে হয়ত পার্থপ্রতিমকে এখানে পাওয়া যাবে না, সে ক্ষেত্রে সে কোথায় যাবে, তা-ও ভাবেনি। বেলটা বাজাতে না বাজাতেই দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। সামনে একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। খুব সম্ভব পাঞ্জাবি, ওইরকম লম্বা দোহারা, নিটোল চেহারা, হাতে আ-বাঁধা বেণী। বোধ হয় চুল বাঁধতে বাঁধতে দরজা খুলে দিয়েছেন। খুব গম্ভীর। কিন্তু অদ্ভুত একটা লাবণ্য ভদ্রমহিলার চেহারায়। এত ব্যক্তিত্ব যে ঋতু প্রথমটায় কথা কইতে পারেনি, যেন তার কলেজের প্রোফেসর। কিছুক্ষণ পর সে বলল, 'পার্থপ্রতিমজী হ্যাঁয় ?

'তুমি কে ?' বাংলায় প্রতি-প্রশ্ন করলেন ভদ্রমহিলা।

এতক্ষণে ঋতু তার ঝাঁঝাল ব্যক্তিত্ব ফিরে পেয়েছে আবার।

'আমি কে সেটা আনইমপর্ট্যান্ট। উনি যদি থাকেন তো দয়া করে ডেকে দিন।'

'আনইমপর্ট্যান্ট কি না সেটা আমি বুঝব।' ভদ্রমহিলা গম্ভীর মুখে বললেন।

'আমি...আমার নাম ঋতুপর্ণা দাশ—ওঁর ট্রুপে আছি।'

'কোন ট্রুপে ?

'কোন ট্রুপে ?' ঋতু একটু থমকালো। 'কল্লোলিনী উনিশশ' বলে একটা নাটক হয়েছিল কলকাতায়, তাইতে ছিলাম', অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বলল।

'এখানকার ঠিকানা পেলে কী করে ?'

'মৃগেনদা দিয়েছেন।'

'মৃগেনদা !' ভদ্রমহিলা যেন স্মৃতি হাতড়াচ্ছেন, 'মৃগেন বিশ্বাস ? কার সঙ্গে এসেছ ? কোথায় উঠেছ ?' এখনও ঋতু দরজার বাইরে। কপাটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রমহিলা।

'কোথাও উঠিনি, একা এসেছি।' সে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলল। গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্ব দেখে বেশিক্ষণ ঘাবড়াবার মেয়ে সে নয়। পার্থপ্রতিমকে তার চাই-ই চাই।

ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন, 'এত রেকলেস ?' আত্মগত বললেন।

ঋতু রূঢ়ভাবে বলল, 'উনি আছেন কি না, কোথায়, সেটা বলবেন তো !

'উনি আছেন। কিন্তু দেখা করা যাবে না।'

'আপনার কথায় নাকি ? এত দূর থেকে আমি ফিরে যাবার জন্যে আসিনি।'

ঋতু দু পা এগোলো।

—ভদ্রমহিলা এবার কড়া গলায় বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ ! যাবে না। যাবে না।' তিনি দু হাতে ভেতর দিকের আরেকটা দরজা আগলে দাঁড়ালেন।

'আমি যাবই। আপনি বারণ করবার কে ? মিসেস নাকি ?'

'যদি তাই হই। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে যদিও আমি বাধ্য নই।'

'বাজে কথা বলছেন। ওঁর কোনও স্ত্রী আছেন বলে আমরা শুনিনি।' ঋতু জোর করে ভদ্রমহিলার হাত ঠেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকতে গেল।

'কেন যেতে চাইছ ? কী দরকার সেটা বলো আগে।' উনি কেমন উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন।

'বিকজ আই চুজ টু', ঋতু রুক্ষভাবে বলে, আচমকা ওঁর হাত সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল, প্যাসেজ দিয়ে সে প্রায় দৌড়চ্ছে। তার কাঁধে ওভারনাইট ব্যাগ। পরনে স্কার্ট ব্লাউস। 'পার্থপ্রতিম ! পার্থপ্রতিম ! হোয়্যার আর ইউ ?'

ভেতরের দিকের একটা ঘর থেকে হঠাৎ সাড়া এলো, 'কে ?' পার্থপ্রতিমের গলা গম্ভীরই, কিন্তু আজ যেন জলদগম্ভীর। ঋতু স্বর লক্ষ্য করে ডান দিকের একটা ঘরের ভেজানো কপাট খুলে ফেলল। 'পার্থপ্রতিম !' সে আকুল গলায় ডাকছে। ঘরের ভেতর একটা শ্বাসরোধী গন্ধ। চেক-চেক লুঙ্গি পরে বিশাল চেহারার পার্থপ্রতিম একটা চেয়ারের ওপর বসে আছেন। দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে। ঘরময় সিগারেটের টুকরো ছড়ানো, সেইসঙ্গে খাবারের টুকরো— পাঁউরুটি, ভাত, মাংসের হাড়। পার্থপ্রতিম সোজা ঋতুর দিকে চেয়ে আছেন, চোখ দুটো রক্তাভ, ভেতরে মণি দুটো হঠাৎ কেমন জ্বলে উঠল, তিনি টেবিলের ওপর থেকে একটা টাইমপিস তুলে নিয়ে প্রাণপণে ঋতুর দিকে ছুঁড়ে মারলেন। ঋতুর পেছন থেকে দুটো বাদামি হাত ছিটকে এলো সামনের দিকে, টাইমপিসটা হাতের পাতায় লেগে ঝনঝন শব্দ করে মেঝেয় পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হাত দুটো সজোরে ঋতুকে পেছনে টেনে এনে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল।

ঋতু ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। মহিলার হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে। ঋতু সেই দিকে তাকিয়ে স্থাণু হয়ে আছে। মহিলা কাটা আঙুলটা মুখের মধ্যে পুরে চুষে নিলেন, তারপর শান্ত চোখে ঋতুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিষেধ করেছিলাম, শুনলে না। এখন ওঁকে বিরক্ত করতে নেই। ডিপ্রেশন চলছে। ডিপ্রেশন বোঝো ?'

ঋতু পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা বললেন, 'এখন কী করবে ? তুমি তো

কিছুই ঠিক করে আসোনি !'

ঋতুর মাথাটা ফাঁকা। গলা শুকিয়ে গেছে। সে কোনমতে মাথাটা নাড়ল শুধু।

'তা হলে এক কাজ করো। রিটার্ন টিকেট করে এসেছ তো ?'

'না।'

'না ? চমৎকার ; তুমি কি ভেবেছিলে বাকি জীবনটা এই কমলানগরেই...বাঃ, তা দেখো। থাকতে পারবে ?' গলায় শ্লেষ। কিন্তু ওঁর মুখটা বিষণ্ণ।

ঋতুর চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল পড়ছে এবার। সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'আপনি ওঁকে নিয়ে এইভাবে থাকেন। ভয় করে না ?'

'ভয় ?' উনি হাসলেন, 'ভয় করলে চলবে ? এটা সাময়িক। কেটে যাবে। তারপর আবার উনি ঝড়ের মতো কাজ করবেন, বিদেশ যাবেন, নাটক করবেন। ছবি আঁকবেন যত দিন না...'

'যত দিন না !' ঋতু আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল।

'যত দিন না। এইভাবে, এখানে ফিরে আসতে হয়।'

'উনি কতদিন এ রকম ? বিয়ের আগে থেকেই ?'

'বিয়ে ? ও আমার কথা বলছ। হ্যাঁ, ধরো আগে থেকেই...।'

'তা হলে তো...তা হলে তো অনায়াসেই আপনি ডিভোর্স নিতে পারেন।'

ভদ্রমহিলা এবার হাসলেন, বললেন, 'তাই তো, ঠিক বলেছ তো ! ভারি সাহসী আর হিসেবী মেয়ে তো তুমি ?' এবার ওঁর গলা পাল্টে গেল। বললেন, 'শোনো ঋতুপর্ণা। আমার সঙ্গে ওঁর কোনরকম বিয়েই হয়নি। আমি যে কোনও দিন, যে কোনও মুহূর্তে ওঁকে ফেলে চলে যেতে পারি।'

'তা হলে ?'

'তা হলে ? "তুমি" জিজ্ঞেস করছ ?' "তুমি"টার ওপর জোর দিলেন উনি, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'চয়েস। এটা আমার ইচ্ছা।'

ঋতু দরজার দিকে এগোচ্ছিল। উনি বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ ? কোথায় যাবে এই সন্ধেবেলায় ? শোনো, এখানে অনেক ঘর আছে। থাকার কোনও অসুবিধে হবে না। খালি খুব চুপচাপ থাকতে হবে।'

ঋতু কেঁপে উঠল, বলল, 'না, আমি মরে গেলেও এখানে থাকতে পারব না। অন্য কোথাও ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না ?'

'এখন যা অবস্থা দেখছি, বাড়ি ছেড়ে যাওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব নয় ! কাল সকালে দেখব।'

'কী করছ ? অমৃতা !' হঠাৎ ও দিকের ঘর থেকে হুহুঙ্কার ভেসে এলো। ঋতু খোলা সিঁড়ি দিয়ে পড়িমরি করে দৌড়েছে। বাইরে বেরিয়ে অনেকটা উর্ধ্বশ্বাসে হাঁটবার পর তার মনে হল পেছন থেকে কে তাকে ডাকছে। ফিরে দেখল নীল মারুতি ভ্যান। মিসেস অরোরা।

'ইউ ?' ঋতু অবাক হয়ে বলল।

'চলী তো আও পহলে', মিসেস অরোরা পাশের দরজা খুলে দিলেন। সে উঠে বসতে, গাড়িতে স্পিড দিয়ে গলি থেকে বেরোতে বেরোতে উনি খুব সাবধানে বললেন, 'পতা তো ঠিকই লগা, লেকিন লৌট আয়ী কিঁউ ?'

ঋতু মুখ নিচু করে হাতের নখ দেখছে, এখনও তার মুখ রক্তশূন্য।

'লাগতা হ্যায় কি তুম ভর গয়ী হো ? ক্যা হুয়া !'

ঋতু শিউরে উঠে বলল, 'সামবডি ইজ আ লুজ্জি ইন দ্যাট হাউস   আই ডিডন্ট্ নো।'

'সো ইউ ডিডন্ট নো এনিথিং, অ্যান্ড জাস্ট অ্যারাইভ্ড্ ? স্ট্রেঞ্জ

ঋতু কথা বলছে না। মিসেস অরোরা বললেন, 'ডু ইউ রিয়ালাইজ দ্যাট আই টু ক্যান বী আ ভেরি ব্যাড উওম্যান ! কুছ হুলিগান লোগ আভি আ জায়েঙ্গে তো ! মে বি আয়্যাম গোয়িং টু সেল য়ু টু ফ্লেশ-ট্র্যাফিকার্স ! ষোলা উমর কী এক লড়কী, ইউ জাস্ট লেফ্ট ইয়োর হোম, টু চেজ সামবডি ইন দিস বিগ ব্যাড সিটি ?'

ঋতু বলল, 'আয়্যাম টোয়েন্টি। গোয়িং অন টোয়েন্টিওয়ান।'

মিসেস অরোরা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন, 'তব তো সব ঠিকই হুয়া, না ! কিতনী মাসুম সুরত ! ইউ বেঙ্গলি গার্লস্ আর সো ইয়াং অ্যান্ড ইনোসেন্ট !'

ঋতু জীবনে এই প্রথম বাকশূন্য হয়ে গেল। তার জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হলো না মিসেস অরোরা এবার তাকে নিয়ে কী করবেন। সে জানতো, শুনেছিল রাজধানীর লোকেরা খুব স্বার্থপর, উদাসীন হয়। উনি এখন কোথায় যাচ্ছেন ?

দুটো রাত অরোরাদের বাড়িতে কাটল ঋতুর। ওদের বাড়িতে ছেলেমেয়ে কেউ নেই। সবাই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কর্মরত। দুদিন মিসেস অরোরা দোকানে গেলেন না। তৃতীয় সন্ধ্যায় বহু চেষ্টায় জোগাড় করা টিকিট নিয়ে সে দিল্লি ছাড়ল। মিঃ অরোরা তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে বললেন, 'ও কে, সী ইউ।' মিসেস তর্জনীটা নেড়ে বললেন, 'বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সী ইউ এগেইন। সমঝী ?'

কলকাতা পৌঁছে ট্যাক্সি নিয়ে আগে উজ্জয়িনীদের বাড়ি ছুটল ঋতু। মাসি দরজা খুলে দিলেন। দুটো বাজছে ঘড়িতে।

'আরে ঋতু ? ব্যাগ কাঁধে কোথায় গিয়েছিলে ?'

'উজ্জয়িনী কই ?'

'আজকে তো রেজাল্ট ! জুনি কখন বেরিয়ে গেছে। একটু আগে ফোন করে ছিল ভেঙ্কটের বাড়ি গেছে সবাই মিলে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি ?'

ঋতুর সমস্ত শরীরে মনে হঠাৎ কি রকম একটা তোড় এলো। কিসের যেন বাঁধ ভেঙে গেছে ভেতরে। সামনে মা। একজন মা। এটাই যেন এখন তার পক্ষে অনেক। সে অমিতাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

'কী হয়েছে ?' অমিতা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন,, 'ঋতু কাঁদছ কেন ? শোনো, রেজাল্ট নিয়ে একদম ভাববে না। কত পরীক্ষা আছে এখন ! উন্নতির কত সুযোগ তোমাদের চারপাশে ! ইস্স্ দেখো তো, মুখটা শুকিয়ে গেছে একেবারে।'

অমিতা ঋতুকে জোর করে এনে সোফায় শুইয়ে দিলেন। ঋতুর যেন পায়ে জোর নেই। সে হাঁটতে পারছে না। উজ্জয়িনী যখন প্রায় আটটা নাগাদ প্রচুর আড্ডা মেরে জ্বলজ্বলে মুখে বাড়ি ফিরল তখন ঋতু খাওয়া দাওয়া সেরে একটা পাটভাঙা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে উজ্জয়িনীর বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অমিতা ফিসফিস করে বললেন, 'কী রেজাল্ট হয়েছে রে ওর ? ভীষণ কান্নাকাটি করছে।' উজ্জয়িনী চুপি চুপি বলল, 'অনার্স হয়নি।' 'ইস্স্, জুনি তুই ওর দিকে একটু নজর রাখ। আমি এবার ওর বাড়িতে ফোন করে দিই। নম্বরটা নেই। কত ভাবছেন বল তো ওঁরা !'

এমনি করে আরও কয়েক বছর কাটবে   তারপরে আরও বছর। আরও আরও।

ওদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙিয়ে যাবে। রাজেশ্বরী হয়ত রাজনীতির ক্ষুরধার পথে জনকল্যাণের দিকে এগোতে গিয়ে এম.এ-টা আর শেষ করতে পারবে না। বিষ্ণুপ্রিয়া নিশ্চয়ই তার নতুন তন্ময়ের হাত ধরে ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের প্লেনে উঠে গেছে।

নতুন তন্ময়, যার ডাক নাম তনু। পুরনো তন্ময় কি পার্থপ্রতিম ওরফে কবিতা ওরফে গ্রুপ থিয়েটার ওরফে তার সার্থকতার ঠিকানা খুঁজে পেল? অণুকা তো এখন কম্পুটার-ট্রেনিং নিয়ে রীতিমতো গর্বিত চাকুরে। কাঁধে ব্যাগ, অহংকারী পা ফেলে অফিস যাচ্ছে। ভেঙ্কটের মাল্টি-স্টোরিড সম্পূর্ণ হওয়ার মুখে। শেয়ার বাজারে মন্দা দেখা দেবার আগেই সে বেশ কিছু লাভ করে নিয়েছিল। এইবারে গাড়ি বুক করেছে। তার এতো সমৃদ্ধি দেখেও কিন্তু গৌতমের হেলদোল নেই। সে জাত মাস্টার। মাস গেলে নিশ্চিত মায়ের অভ্যাস তার মজ্জায় মজ্জায়। কলকাতার কলেজে না গেলেও তার চলবে। সে একটু জায়গা নিয়ে, হাত পা মেলে থাকতে চায়, সম্ভব হলে একা। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির স্টপে কে কে যেন নামল? উজ্জয়িনী মিত্র আর মিঠু চৌধুরী না? মিঠু কি তার ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা সেই সুদুর্লভ কাদম্বিনীত্ব একেবারে হারিয়ে ফেলেছে? উজ্জয়িনী কি মনে রেখেছে পর্দার ওপারের সেই ভয়াবহ শূন্যতা যা তাকে একটা খণ্ড সময়ের জন্যে হলেও গতিহীন, গৃহহারাদের সঙ্গে স্বাজাত্য দিয়েছিল? হায় ঋতু। তুমি কেন বিপত্নীক হঠাৎ-বুড়িয়ে-যাওয়া অজিত দাশের মাথার কাছে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে আছ? কেন আর এত ভয়, গ্লানি, অপরাধবোধ! দেয়ালের ছবি থেকে মায়ের হাসি-হাসি মুখ তো সমানেই অভয় দিচ্ছে! ইমন এখন বম্বেয়। তার খেলা, সংসার, চাকরি খুবই দ্রুততালে চলছে নিশ্চয়। বাবুয়াকে সে দাঁড় করাবেই। চাকরিটাও সে মন দিয়ে করছে। স্মিত, সরল অথচ প্রত্যয়ী মুখে ইমন খুব সফল জনসংযোগ করছে। আচ্ছা! সুহাসকে তো প্রায়ই বম্বে আসতে হয়! ও কি ইমনের সঙ্গে তার নরিম্যান পয়েন্টের অফিসে দেখা করে? দুজনে কি হেঁটে যায় কখনও সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে? ইমন সুহাসের বিষয়ে মনস্থির করতে পারল কি না কে জানে! ও তো বেশি কথা বলে না, খালি হাসে। আর হাঁটতে পারে। হাঁটতে ওর ক্লান্তি নেই। শুরু করেছিল সেই চূর্ণী নদীর ধার থেকে। মহকুমা হাসপাতাল, ভাংরা পাড়া, ব্রজবালা ইস্কুল, চট্টেশ্বরী কালী মন্দির পেরিয়ে, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, চৌরঙ্গি নেতাজী ইনডোর হয়ে ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়াম, জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারি পার হয়ে ক্রফোর্ড মার্কেট, ফ্লোরা ফাউন্টেন দিয়ে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ায় এসে পৌঁছল। সামনে আরব সাগর। তারপরে মহাসাগর। জীবন মহাজীবন। সময় কেটে যাবে, আরো সময়। আরো, আরো।
